শ্রী সাই সৎচরিত্র

(SHRI SAI SATCHARITRA)

BENGALI

শ্রী সাই সৎচরিত্র

(শ্রী সাইবাবার বিস্ময়কর জীবনগাথা এবং অমূল্য উপদেশ)

মূল মারাঠী গ্রন্থ লেখক

শ্রী গোবিন্দ রাও রঘুনাথ দাভোলকার (হেমাডপন্ত)

হিন্দী অনুবাদ

শ্রী শিবরাম ঠাকুর

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমতি সুমনা বাগচী (মীরা)

নতুন দিল্লী

প্রকাশক :

মাননীয় শ্রী জে.এম. শাশানে, সভাপতি

শ্রী সাইবাবা সংস্থান, শিরডী
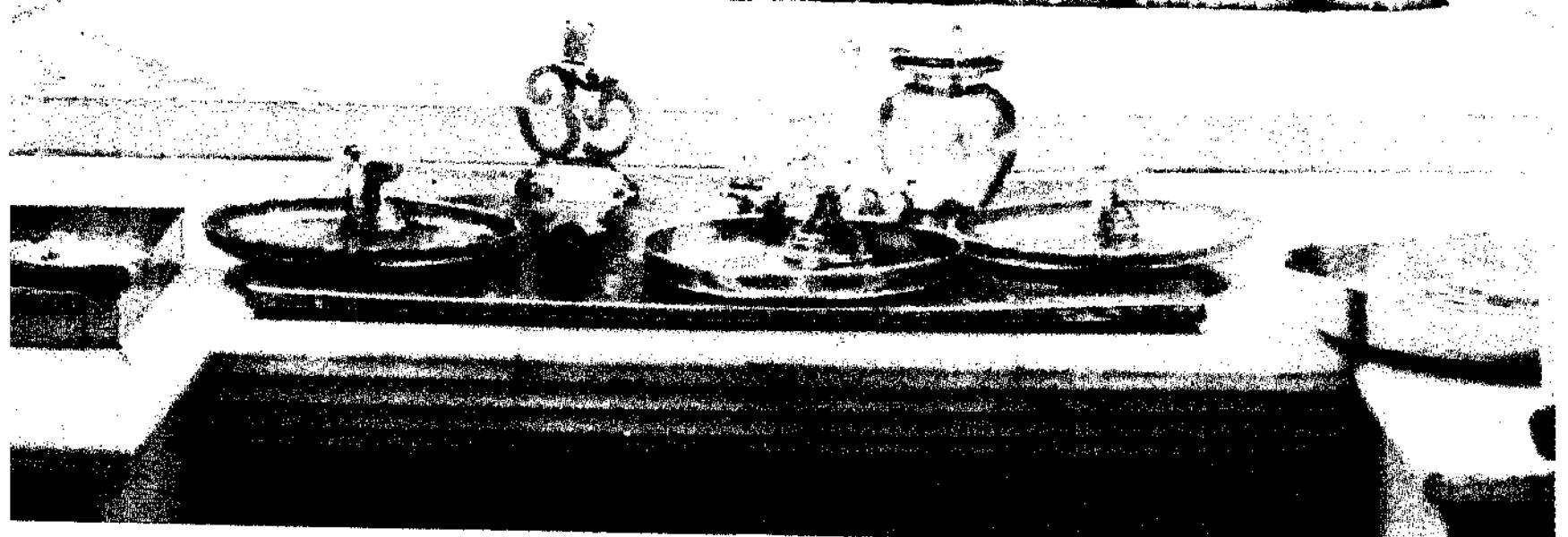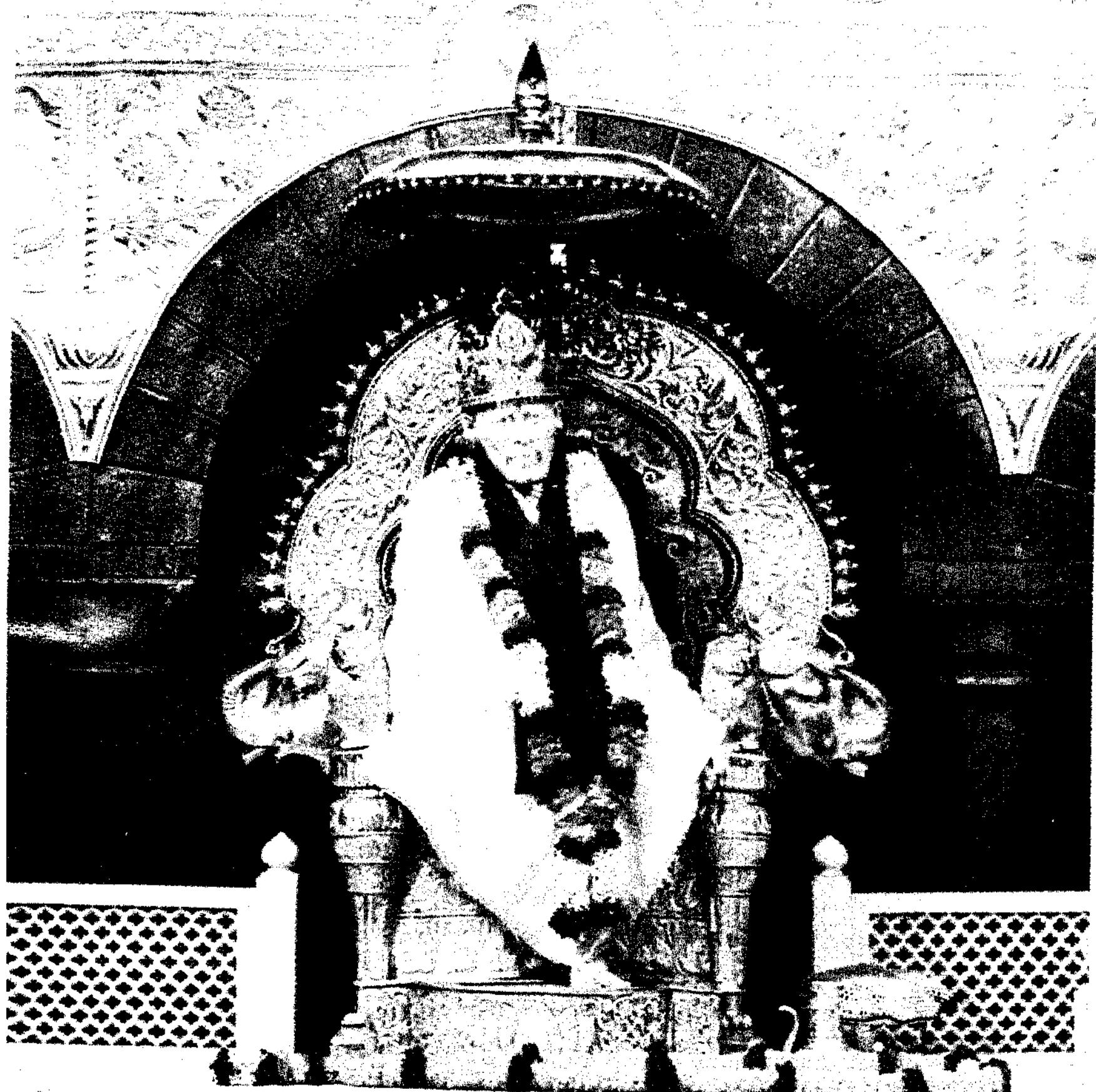
জপনাম-১০৮

ওঁ শ্রীসাইনাথায় নমঃ
.. শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নমঃ
,, শ্রীকৃষ্ণ রাম শিব মারুত্যাদি রূপায় নমঃ
,, শেষ শয়ন নমঃ
,, গোদাবরীতট শ্রীদ্ধিবাসিনে নমঃ
,, ভক্তহৃদয়ালয়ায়ে নমঃ
,, সর্ব্বহৃদনিলয়ায়ে নমঃ
,, ভূতাবাসয়ে নমঃ
,, ভূতভবিষ্যৎ ভাব বর্জ্জিতায় নমঃ
,, কালাতীতায় নমঃ (১০)
,, কালায় নমঃ
,, কালকালায় নমঃ
,, কালদর্পদমনায় নমঃ
,, মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ
,, অমৃতায় নমঃ
,, মৃত্যুভয় অভয়প্রদায় নমঃ
,, জীবধারায় নমঃ
,, সর্ব্বধারায় নমঃ
,, ভক্তগণ সমর্থায় নমঃ
,, ভক্তগণ প্রতিজ্ঞায় নমঃ (২০)
,, অন্নবস্ত্রদাত্রে নমঃ
,, আরোগ্যক্ষেমাদাত্রে নমঃ
,, ধনমঙ্গলদাত্রে নমঃ
,, হৃদি শ্রীদ্ধিদাত্রে নমঃ
,, পুত্র মিত্র কলত্র বন্ধু দাত্রে নমঃ
,, যোগক্ষেমবহায় নমঃ
,, আপদ্বান্ধবায় নমঃ
,, মার্গবান্ধবায় নমঃ
,, ভক্তি মুক্তি প্রদায় নমঃ
,, প্রিয়ায় নমঃ (৩০)
,, প্রীতিবর্দ্ধনায় নমঃ
,, অন্তর্যামিনে নমঃ
,, সচ্চিদানন্দ স্বরূপিনে নমঃ
,, নিত্যানন্দায় নমঃ
,, পরমসুখদায় নমঃ
,, পরমেশ্বরায় নমঃ
,, পরমবন্ধ্মণে নমঃ
,, পরমাত্মাণে নমঃ
,, জ্ঞান স্বরূপিনে নমঃ
,, জগতঃ পিত্রে নমঃ (৪০)
,, ভক্তানাম মাতৃপিতৃপিতামহায় নমঃ
,, ভক্তাভয়প্রদায় নমঃ
,, ভক্তপরাধীনায় নমঃ
,, ভক্তানুগ্রহ কাতরায় নমঃ
,, শরণাগতবৎসলায় নমঃ
,, ভক্তি শক্তি প্রদায় নমঃ
,, জ্ঞান বৈরাগ্যদায় নমঃ
,, প্রেম প্রদায় নমঃ
,, সংশয় দৌর্ব্বল্য পাপকর্ম্ম বাসনা ক্ষয়করায় নমঃ
,, হৃদয় গ্রন্থি ভেদকায় নমঃ (৫০)
,, কর্ম্ম ধ্বংসিনে নমঃ
,, শুদ্ধ সত্যস্থিতায় নমঃ
,, গুণাতীত গুণাপর্ণে নমঃ

„ অনন্ত কল্যাণগুণায় নমঃ
„ অমিত পরাক্রমায় নমঃ
„ জয়িনে নমঃ
„ দুৰ্দ্ধর্ষ ক্ষয়ায় নমঃ
„ অপরাজিতায় নমঃ
„ ত্রিলোকষ্বে অভিধাতৃগতায়ে নমঃ
„ অশোক্যরোহিতায় নমঃ (৬০)
„ সর্ব্বশক্তি মূর্ত্তয়ে নমঃ
„ সুরূপ সুন্দরায় নমঃ
„ সুলোচনায় নমঃ
„ বহুরূপ বিশ্বমূর্ত্তায় নমঃ
„ অরূপাভিব্যক্তায় নমঃ
„ অচিন্তায় নমঃ
„ সূক্ষায় নমঃ
„ সর্ব্বন্তযামিনে নমঃ
„ মনোবাগাতীতায় নমঃ
„ প্রেমমূর্ত্তায় নমঃ (৭০)
„ সুলভ দুর্লভায় নমঃ
„ অসহায় সহায়ায় নমঃ
„ অনাথনাথ দীনবান্ধবায় নমঃ
„ সর্ব্বভারভৃতে নমঃ
„ অকর্ম্মনেক কর্ম্ম সুকর্ম্মনে নমঃ
„ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনেয় নমঃ
„ তীর্থায় নমঃ
„ বাসুদেবায় নমঃ
„ সতাংগতয়ে নমঃ
„ সৎপরায়ণায় নমঃ (৮০)
„ লোকনাথায় নমঃ
„ পাবনহৃদয়ায় নমঃ
„ অমৃতাংশবে নমঃ
„ ভাস্কর প্রভায় নমঃ
„ ব্রহ্মচারী তপশ্চারিয়াদি সুব্রতায়ে নমঃ
„ সত্য ধর্ম্ম পরায়ণায় নমঃ
„ সিদ্ধেশ্বরায় নম ঃ
„ সিদ্ধ সঙ্কল্পায় নমঃ
„ যোগেশ্বরায় নমঃ
„ ভগবতে নমঃ (৯০)
„ ভক্তবৎসলায় নমঃ
„ সৎপুরুষায় নমঃ
„ পুরুয়োত্তমায় নমঃ
„ সত্য তত্ত্ব বোধকায় নমঃ
„ কামাদি ষড়বৈরীধ্বংসিনে নমঃ
„ অভেদানন্দসুভাবপ্রদায়য়ে নমঃ
„ সমসর্ব্বমর্ত্ত স, মতায় নমঃ
„ শ্রীদক্ষিণমূর্ত্তায় নমঃ
„ শ্রীভেঙ্কটেশরমণায় নমঃ
„ অদ্ভুতানন্দচারিয়ায়ে নমঃ (১০০)
„ প্রপন্নাথিহরায় নমঃ
„ সংসার সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়করায় নমঃ
„ সর্ব্ববিধ সর্ব্বোতমুখায় নমঃ
„ সর্ব্বঅন্ত বহিঃস্থিতায় নমঃ
„ সর্ব্বমঙ্গলকরায় নমঃ
„ সর্ব্বভিষ্টাপ্রদায় নমঃ
„ শ্রীসমরস সন্মার্গস্থাপনায় নমঃ
„ শ্রীসমর্থ সৎগুরু সাইনাথায় নমঃ (১০৮)

সমাধি-মন্দির

শ্রী সাই সৎচরিত্র

বিষয় সূচী

শ্রী সাইবাবার ‘সাট্‌কা’ (হাতের লাঠি) ও পাদুকা - (শ্রী সাইবাবা সংস্থান শিরডী)

শ্রী সাই সৎচরিত্র

অধ্যায় - ১

বন্দনা, গম পেষেন - এমন এক সন্ত, গম পেষবার কাহিনী এবং তার তাৎপর্য্য।

পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে শ্রী হেমাডপন্ত এই শ্রী সাইসৎচরিত্রের শুভারম্ভ বন্দনা দ্বারা করেছেন।

১। সর্বপ্রথমে শ্রী গণেশকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন, যিনি সব কাজ নির্বিঘ্নে পুরণ করে তাঁকে যথাযথ রূপে যশস্বী করেছেন এবং এইরূপ মানা হয় যে শ্রী সাইই আমাদের শ্রী গণেশ।

২। তারপর ভগবতী সরস্বতীকে, যাঁর দ্বারা কাব্য রচনার প্রেরণা তিনি পান এবং লোকে বলে শ্রী সাই ও ভগবতী ভিন্ন নন; তিনি নিজেই তাঁর জীবন সঙ্গীত সুরে বেঁধেছেন।

৩। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকে, যাঁরা যথাক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কর্তা রূপে মান্য। লেখকের মতে শ্রী সাই এবং এই ত্রিমূর্তি অভিন্ন। তিনি স্বয়ং গুরু রূপে ভবসাগর পার করিয়ে দেন।

৪। তারপর নিজের কুলদেবতা শ্রী নারায়ণ আদিনাথের বন্দনা করেন, যিনি কিনা কোকণ প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোকন সেই পবিত্রভূমি, যেটি শ্রী পরশুরাম সমুদ্র থেকে বার করে স্থাপিত করেছিলেন। এরপর লেখক নিজের কুলের আদি পুরুষদের প্রণাম জানান।

৫। তারপর শ্রী ভরদ্বাজ মুনিকে, যাঁর গোত্রে তাঁর জন্ম। তারপর সেই ঋষিদের যেমন - যাজ্ঞবল্ক, ভৃগু, পরাশর, নারদ, বেদব্যাস, সনৎকুমার, শুক, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব ইত্যাদি এবং আধুনিক সন্ত যেমন - নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, মুক্তাবাঈ , একনাথ, নামদেব, তুকারাম, নরহরি ইত্যাদিদের নমস্কার করেন।

৬। তারপর তিনি প্রণাম জানান নিজের পিতামহ সদাশিব, পিতা রঘুনাথ এবং মাকে, যিনি ওঁর শৈশবকালেই মারা যান। এরপর নিজের বড় ভাই ও পালনকর্ত্রী কাকীমাকে, প্রণাম করেন।

৭। এরপর পাঠকবৃন্দকে নমস্কার করে অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন একাগ্রচিত্ত হয়ে এই কথামৃত পান করেন।

৮। শেষে শ্রী সচ্চিদানন্দ সদগুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজকে, যিনি কিনা শ্রী দত্তাত্রয়-এর অবতার এবং ওঁর আশ্রয়দাতা। উনিই 'ব্রহ্ম সত্য ও জগত মিথ্যা'-র বোধ করিয়ে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে একই ব্রহ্ম ব্যাপ্ত - এই সত্যের অনুভূতি করান। শ্রী পরাশর, ব্যাস, শাণ্ডিল্য আদির ভক্তির নানান রূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবার গ্রন্থকার মহোদয় নিম্নলিখিত কথা আরম্ভ করেন।

গম পিষবার কাহিনী ঃ-

'১৯১০ সালে আমি একদিন ভোরবেলা শ্রী সাই বাবার দর্শনার্থে মস্‌জিদে যাই। কিন্তু ওখানকার বিচিত্র দৃশ্য দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই। সাই বাবা হাত-মুখ ধুয়ে গম পিষতে বসবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। মেঝের উপর একটা টাটের টুকরো বিছিয়ে, তার উপর যাঁতাকলটা রাখেন। এরপর খানিকটা গম ঢেলে পিষবার ক্রিয়া আরম্ভ করে দেন।'

আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে গম পিষে বাবার কি লাভ হবে? ওঁর তো পরিবার বলতে কিছুই নেই এবং উনি নিজের জীবন নির্বাহ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাই করেন - তাহলে এই গম পেষা কেন? এই ঘটনাটা দেখে সেখানে উপস্থিত বহুলোকের এই একই কথা মনে হচ্ছিল কিন্তু বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে এমন সাহস কেউ জোগাতে পারে না। বাবার এই বিচিত্র লীলার খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই দৃশ্য দেখবার জন্য তক্ষুনি লোকের ভিড় মস্‌জিদের দিকে দৌড়য়।

সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে চারজন নির্ভীক মহিলা ভিড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা বানিয়ে মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়ে গিয়ে এবং বাবাকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর হাত থেকে যাঁতার হাতলটা কেড়ে নিয়ে বাবার লীলার গুণগান করতে করতে গম পেষা আরম্ভ করে দিলো। প্রথমে বাবা একটু রেগে যান, কিন্তু পরে মহিলাদের ভক্তিভাব দেখে শান্ত হয়ে মুচকি-মুচকি হাসেন। এদিকে গম পিষতে-পিষতে মহিলাদের মনে হয় যে 'বাবার তো কোন ঘর-বাড়ি নেই, কোন ছেলে-পিলেও নেই। তিনি স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারাই জীবন যাপন করেন। সুতরাং তাঁর ভোজন ইত্যাদির জন্য আটার কিই বা প্রয়োজন? বাবা তো পরম দয়ালু। হতে পারে যে এই আটা উনি আমাদেরই বিতরণ করে দেবেন।' এই কথা ভাবতে-ভাবতে ও গান গাইতে-গাইতে ওরা সমস্ত গম পিষে ফেলল। এবার যাঁতাটি সরিয়ে ওরা আটার চারটে সমান ভাগ করে নিয়ে নিজের-নিজের ভাগটি উঠিয়ে সেখান থেকে যেতে উদ্যত হয়। এতক্ষণ বাবা শান্ত

হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এইভাবে আটা নিয়ে যেতে দেখে তিনি হঠাৎ রেগে উঠলেন এবং ওদের ভর্ৎসনা করে বলেন- "ওহ্হে, তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ? এটি কার বাপের সম্পত্তি মনে করে নিয়ে যাচ্ছ? এটা কি কোন পাওনাদারের সম্পদ যে, এত সহজে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ? নাও, এখন একটা কাজ করো। এই আটাটা নিয়ে গিয়ে গ্রামের সীমারেখায় বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে এসো।" আমি শিরডীবাসীদের প্রশ্ন করলাম, "বাবা এক্ষুনি যা যা করলেন, তার যথার্থ তাৎপর্য্য কি হতে পারে?" তারা আমায় জানালো যে, সেই গ্রামে বিসুচিকার প্রচন্ড প্রকোপ এবং সেটা দূর করার জন্যই বাবার এই উপচার। "এখুনি আপনি যা কিছু গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখলেন, সেটা গম নয় বরং বিসুচিকা, যেটা পিষে নষ্ট করে দেওয়া হল।"

এই ঘটনার পর সত্যি-সত্যি বিসুচিকার সংক্রমণ প্রশমিত হয়ে গেল এবং গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত ও সুখী হল। বলা বাহুল্য, আমার মন আনন্দে মেতে ওঠে। মনে নানারকম কৌতূহল জাগে। আটা ও বিসুচিকা রোগের পারস্পরিক কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? এর উত্তরের সূত্র কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে? ঘটনাটি বোধগম্য হচ্ছিল না। এই মধুর লীলার অল্প শব্দে মাহাত্ম প্রকাশ না করতে পারলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব না। লীলাটির কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং এইভাবে বাবার জীবন-চরিত্র লেখার প্রেরণা পেলাম। এই কথা তো সবাই জানে যে, এই কাজটি বাবার কৃপা ও আশীর্বাদের ফলস্বরূপই সফলতাপূর্বক সম্পন্ন হয়েছে।

এবার আসি গম পেষার ঘটনাটির তাৎপর্য্যর দিকে। শিরডীবাসীরা এই ঘটনাটির যা অর্থ বুঝল, সেটা প্রায় ঠিকই, কিন্তু এছাড়া আমার মনে হয় এর এক অন্য অর্থও আছে। বাবা শিরড়ীতে ৬০ বছর ছিলেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে উনি এই গম পিষবার কাজটি প্রায় প্রতিদিনই করতেন। গম পিষবার অভিপ্রায় আটা তৈরি না হয়ে বরং নিজের ভক্তদের পাপ, দুর্ভাগ্য, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট বিনাশ করাই ছিল। যাঁতার উপরের পাট হলো ভক্তি, নীচেরটি কর্ম। যাঁতার হাতল (দণ্ড) যেটা ধরে যাঁতা ঘোরাতেন সেটা ছিল জ্ঞান। বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষন মানুষের হৃদয় থেকে প্রবৃত্তি. আসক্তি, ঘৃণা ও অহংকার নির্মূল না হয়ে যায় - যেগুলি নষ্ট হওয়া খুবই দুষ্কর, ততক্ষন জ্ঞান এবং আত্মানুভূতি সম্ভব নয়।

এই ঘটনাটি কবীরের এক তদ্দোনুরূপ ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবীর একটি স্ত্রীকে শষ্যের দানা পিষতে দেখে নিজের গুরু নিপৎনিরঞ্জনকে বলেন - "আমি কাঁদছি কারণ যেভাবে ঐ দানাগুলি যাঁতাতে পিষে যাচ্ছে, ঠিক সেইরকমই আমিও ভবসাগর

রূপী যাঁতায় পিষে যাওয়ার যাতনা অনুভব করছি।"[১] ওঁর গুরু উত্তর দেন- "ঘাবড়িও না, যাঁতার মাঝখানে জ্ঞান রূপী দন্ড আছে। সেটাকেই ভালভাবে ধরে থাকো, যেভাবে তুমি আমায় ধরে থাকতে দেখো। তার থেকে দূরে যেওনা। শুধু কেন্দ্রের দিকেই অগ্রসর হতে থেকো। এইভাবে তুমি নিশ্চিত ভবসাগর রূপী যাঁতা থেকে বেঁচে যাবে।"

।। শ্রী সদগুরু সাই নাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।

১. চলন্ত যাঁতা দেখে দিল কবির কেঁদে,
দুই পাটের মাঝখানে আস্ত থাকে বলো কে?

অধ্যায় - ২

গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য, কার্য্য শুরু করাতে অসামর্থতা ও সাহস, গম্ভীর তর্ক-বিতর্ক, অর্থপূর্ণ উপাধি 'হেমাডপন্ত', গুরুর প্রয়োজন।

গত অধ্যায়ে গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে সেই সব কারণগুলি আলোচনা করেছেন, যার দ্বারা তিনি গ্রন্থ রচনার কার্য্য আরম্ভ করার প্রেরণা পান। এবার তিনি এই গ্রন্থটি পাঠ করার যোগ্য অধিকারী এবং অন্যান্য বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিবেচনা করেছেন।

গ্রন্থ লেখার কারণ

বাবা কিভাবে বিসুচিকা রোগের প্রকোপ আটা পিষে এবং সেটা গ্রামের বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে থামান এবং এই রোগ সম্পূর্ণরূপে উন্মুলন করে দেন - এই লীলা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি আরো অনেক লীলা শুনেছি, যার দ্বারা আমার মন অফুরন্ত আনন্দে ভরে যায় এবং এই আনন্দের স্রোতই কাব্য রূপে প্রকাশ হয়েছে। আমার এ কথাও মনে হলো যে, এই মহান ও আশ্চর্য্যজনক লীলার বর্ণনা বাবার ভক্তবৃন্দের জন্য অত্যন্ত মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ প্রমাণিত হবে। এই লীলামৃত পান করলে তাদের পাপ সমূলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি বাবার পবিত্র জীবনগাথা এবং তাঁর মধুর উপদেশ লিখতে আরম্ভ করলাম। শ্রী সাইয়ের জীবনী জটিল বা সংকীর্ণ কোনটাই নয়, বরং সত্য ও আধ্যাত্মি ক পথের বাস্তবিক দিগ্‌দর্শন করায়। শ্রী হেমাডপন্তের মনে হয় যে, উনি এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পাত্র নন- "আমি তো নিজের প্রিয় বন্ধুর জীবনীর সম্বন্ধে ভালভাবে পরিচিত নই আর নাই নিজের প্রকৃতির বিষয়ে, তাহলে আমার মত এক মূঢ় মানুষ একজন এমন মহান সৎপুরুষের জীবনী লেখার দুঃসাহস কি করে করতে পারে? অবতারদের প্রবৃত্তির বিষয় বর্ণনা করতে বেদও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে। কোন মহাপুরুষের বা সন্তের চরিত্র বোঝার জন্য সর্বাগ্রে নিজে সন্ত সদৃশ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেই হিসেবে তাঁর লীলার গুণগান করার ক্ষেত্রে আমি সর্বরূপে অযোগ্য। সাধুপুরুষের জীবনী লেখার জন্য মহান সাহসের দরকার এবং এমন যেন না হয় যে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।" এই আমার একমাত্র সংশয়। তাই শ্রী বাবার কৃপা অর্জন করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করি।

মহারাষ্ট্র প্রান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত শ্রী জ্ঞানেশ্বর বলেছিলেন যে, সন্তচরিত্র যে রচনা করে তার প্রতি ভগবান বিশেষ প্রসন্ন হন। ভক্তরা সাধু-সন্তের সেবা করার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন। ওদিকে সন্তরাও কার্য্যটিকে বিচিত্র রূপে সম্পন্ন করিয়ে নেন। আসল প্রেরণা তো সন্তরাই দেন, ভক্ত তো নিমিত্ত মাত্র বা বলা যেতে পারে যে এক যন্ত্রস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ কবি মহীপতি সন্ত-চরিত্র লেখার প্রেরণা পান। এই অন্তঃপ্রেরণার ফলস্বরূপই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। ঠিক এইভাবেই শ্রী দাসগণুর সেবা স্বীকৃত হয়েছিল। মহীপতি চারটি কাব্য রচনা করেন - 'ভক্তবিজয়,' 'সন্তবিজয়,' 'ভক্তলীলামৃত' এবং 'সন্তলীলামৃত।' দাসগণু দুটি কাব্য লেখেন, 'ভক্তলীলামৃত' ও 'সন্তকথামৃত' - যেগুলিতে আধুনিক সন্তদের চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। 'ভক্তলীলামৃত' -তে অধ্যায় ৩১, ৩২ ও ৩৩ ও 'সন্তকথামৃত'-তে অধ্যায় ৫৭তে শ্রী সাই বাবার মধুর জীবনী ও তাঁর অমৃততুল্য উপদেশ খুবই সুন্দর ও মনোরঞ্জকভাবে লেখা হয়েছে। এইগুলি শ্রী সাইলীলা পত্রিকার ১১, ১২, ও ১৩ অঙ্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দকে এইগুলি পড়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই। এই রকমই শ্রী সাই বাবার অদ্ভুত লীলার বর্ণনা একটি ছোট্ট পুস্তকে - ('শ্রী সাইনাথ ভজনমালা') বান্দ্রার শ্রীমতি সাবিত্রীবাঈ রঘুনাথ তেন্দুলকর খুবই সুন্দর ভাবে করেছেন।

শ্রী দাসগণু মহারাজও শ্রী সাই বাবার মহিমার বিষয়ে অনেক মধুর কবিতা রচনা করেছেন। আরেক ভক্ত শ্রী অমীদাস ভবানী মেহতাও বাবার কিছু কথা-কাহিনী গুজরাতীতে প্রকাশিত করেছেন। 'সাইপ্রভা' নামক পত্রিকাতেও কিছু লীলা শিরডীর সংস্থান দ্বারা প্রকাশিত করা হয়েছে। এবার একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে যে, যখন শ্রীসাইনাথ মহারাজের জীবনের উপর আলোকপাত করার জন্য এত সাহিত্য রয়েছে তখন আরেকটি গ্রন্থ 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' রচনা করার আবশ্যকতাটাই বা কি? এর উত্তরে শুধু এই বলা যেতে পারে যে, শ্রী সাইবাবার জীবনী মহাসাগরের ন্যায় অগাধ, বিস্তৃত। যদি এর গভীরে ডুব দেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞান ও ভক্তি রূপী অমূল্য রত্ন সহজেই পাওয়া যাবে। শ্রী সাইবাবার জীবনী, তাঁর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ মহান ও আশ্চর্য্যজনক। দুঃখী ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত জন এর দ্বারা সুখ এবং শান্তি ও পরলোকে শ্রেয়স প্রাপ্ত করবে। **যদি শ্রী সাইবাবার উপদেশগুলি (যেগুলি বৈদিক শিক্ষার ন্যায় মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ) মন দিয়ে শ্রবণ ও মনন করা হয় তাহলে ভক্তরা সহজেই নিজেদের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করতে পারবেন,** অথবা ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা, অষ্টাঙ্গ যোগের সিদ্ধি, ধ্যানের মধ্যে আনন্দ ইত্যাদির প্রাপ্তি বড় সহজেই হয়ে যাবে। এইরূপ ধারণা মনে উদ্ভব হওয়ায় আমি চরিত্রের কথাগুলি সংকলন করতে আরম্ভ

করে দিই। সাথে-সাথে মনে এই বিচারটিও উদয় হয় যে, আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম সাধনাও এইটিই। যে সরল সহজ জন বাবার দর্শন দ্বারা নিজেদের দৃষ্টি ধন্য করার সৌভাগ্য পায়নি তাদের জন্য এই চরিত্র অতন্ত আনন্দদায়ক হবে।

অতএব আমি নিজের অহংকার তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করে দিলাম। আমার মনে হল এর পর আমার পথ সহজতম হয়ে গেছে এবং বাবাই আমায় ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করবেন। কিন্তু গ্রন্থ লেখার বিষয়ে বাবার অনুমতি নিতে সাহস হচ্ছিল না। অতএব আমি মাধবরাওকে (উপনাম শামা), যাঁকে বাবার অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী মানা হয়, এই কাজের ভার দিই। তিনি আমার হয়ে বাবার কাছে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উনি বাবার কাছে বিনম্র শব্দে এইরূপ প্রার্থনা করেন- "এই আন্নাসাহেব আপনার জীবনী লিখবার জন্য অতি উৎসুক। তাই কিন্তু আপনি দয়া করে এমনটি বলবেন না যে, আমি তো এক ফকির, আমার জীবনী লিখবার দরকারটাই বা কি? কেবল আপনার কৃপা ও আজ্ঞার আশীর্বাদ পেলেই ইনি সেটা লিখতে পারবেন। আপনার শ্রীচরণের পুণ্যপ্রতাপই এই কার্য্যটিকে সম্পূর্ণ রূপে সফল করবে। আপনার অনুমতি বা আশীর্বাদের অভাবে কোন কাজই যশস্বী হতে পারে না।" এই রূপ প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয়। তিনি আমায় উদী দিয়ে, নিজের বরদহস্ত আমার মাথায় রেখে আশীস দিয়ে বললেন- "এঁকে জীবনী ও দৃষ্টান্তগুলি একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করতে দাও, আমি এঁকে সাহায্য করব। **আমি স্বয়ং নিজের জীবনী লিখে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করব।** কিন্তু এঁর নিজের অহংকার ত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করা উচিত। যে নিজের জীবনে এইরূপ আচরণ করে তাকে আমি অত্যধিক সাহায্য প্রদান করি। যখন এঁর অহং সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং খুঁজলেও লেশমাত্র পাওয়া যাবে না, তখন **আমি এঁর অন্তঃকরণে প্রকট হয়ে নিজের জীবনী লিখব। আমার চরিত্র এবং উপদেশগুলি শ্রবণ করামাত্র ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জেগে উঠবে এবং সহজেই আত্মানুভূতি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হবে।** গ্রন্থে নিজের মতের সমর্থনে এবং অন্যদের মতকে খন্ডন করার জন্য তথা অন্য কোন বিষয়ের পক্ষপাত করা বা ব্যর্থ বাদবিবাদের কুচেষ্টা থাকা উচিত নয়।"

অর্থপূর্ণ উপাধি 'হেমাডপন্ত'

'বাদ-বিবাদ' শব্দটা লিখতেই মনে পড়ল যে, আমি পাঠকগণকে কথা দিয়েছি 'হেমাডপন্ত' উপাধিটি আমি কি করে পেলাম সেটা বর্ণনা করব। এবার আমি সেটাই বিস্তারিত রূপে লিখছি।

শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত ও নানাসাহেব চাঁদোরকরকে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে গন্য করা হয়। ওঁরাই আমাকে শিরডী গিয়ে শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে অনুরোধ করেন। আমিও তাঁদের কথা দিই, কিন্তু নানারকম বাধা উৎপন্ন হওয়ায় আমার শিরডী যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে লোনাওয়ালায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওঁরা যথাসাধ্য সব রকমের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করেন, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয় ও জ্বর কোন রকমেই কমে না। শেষে ওঁরা নিজেদের গুরুদেবকে ছেলের মাথার কাছে বসান, কিন্তু পরিণাম যে কে সেই থাকে। এই ঘটনাটি দেখে আমার মনে হয় যে, যদি গুরু একটি ছেলের প্রাণও রক্ষা না করতে পারেন, তাহলে তাঁর উপযোগিতাই বা কি? এবং যখন তাঁর মধ্যে কোন সামর্থ্যই নেই তখন আর শিরডী যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন? এই ভেবে আমি শিরডী যাওয়া স্থগিত করে দিই। কিন্তু যা হওয়ার তাতো হবেই। প্রান্তাধিকারী নানাসাহেব চাঁদোরকর বসই ট্যুরে যাচ্ছিলেন। উনি থানা থেকে দাদার পৌঁছন এবং বসই যাওয়ার গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময় বান্দ্রা লোকাল এসে পৌঁছয়, যাতে চড়ে উনি বান্দ্রা পৌঁছান এবং শিরডী যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য আমায় বকুনি দেন। নানা সাহেবের বক্তব্য আমার প্রায় ঠিকই মনে হয়। ফলতঃ সেই রাতেই শিরডী রওনা হওয়া স্থির করি। আমি সোজা দাদার গিয়ে ওখান থেকে মনমাডের ট্রেন ধরব ভেবেছিলাম। এইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে আমি দাদারের ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। ট্রেন ছাড়বে এমন সময় একটি মুসলমান আমার কম্পার্টমেন্টে ঢোকে ও আমার জিনিষপত্র দেখে আমার গন্তব্যস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। আমিও তাকে নিজের যাত্রার বিষয় সব খুলে বলি। তখন সে আমায় জানায় যে, মনমাডের গাড়ী দাদার স্টেশনে দাঁড়ায় না, অতএব সোজা 'বোরীবন্দর' যাওয়া উচিত। এই ঘটনাটি যদি না ঘটত, তাহলে হয়তো পরের দিন শিরডী না পৌঁছতে পারার জন্য নানারকমের কুশঙ্কাদ্বারা আক্রান্ত হতে হতো। কিন্তু তা হয় না। ভাগ্যক্রমে পরের দিন সকাল নটা নাগাদ শিরডী পৌঁছলাম। এই ঘটনাটি ১৯১০ সালে ঘটে যখন প্রবাসী ভক্তদের থাকার জন্য 'সাঠে ওয়াড়া'-ই একমাত্র স্থান ছিল। টাঙ্গা থেকে নেমেই আমি শ্রী সাইবাবার দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। ঠিক সেই সময় ভক্ত প্রবর শ্রী তাত্য়া সাহেব নুলকর মস্‌জিদ থেকে ফিরছিলেন। উনি আমায় জানালেন- 'এই সময় বাবা মস্‌জিদের মোড়েই আছেন। এখন প্রারম্ভিক দর্শন বা 'ধূলি ভেট' করে নাও, তারপর স্নানাদি সেরে দর্শন কোরো।" একথা শোনামাত্র আমি দৌড়ে গিয়ে বাবার দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করি। আমার আনন্দের সীমা রইল না। মনে হচ্ছিল যেন আমি কি না কি পেয়ে গেছি। আমার শরীর উল্লসিত হয়ে ওঠে।

ক্ষিধে বা তেষ্টার কোন বোধই রইল না। যে মুহূর্তে তাঁর ভববিনাশকারী চরণের স্পর্শ পেলাম, তখন থেকেই আমার জীবনে এক নতুন আনন্দ প্রবাহিত হতে শুরু হয়। সে কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। আমি সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে মানসিক প্রণাম করি। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে সাই দর্শনের এক বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর দর্শনের ফলস্বরূপ বিচার পরিবর্তণ হয়- বিগত কর্মের প্রভাব ক্ষীন হয়ে যায় এবং ধীরে-ধীরে অনাসক্তি ও সাংসারিক ভোগের উপর বৈরাগ্য বাড়তে থাকে। শুধু গত জন্মের অনেক শুভ সংস্কারের ফলস্বরূপই এইরকম দর্শন পাওয়া সম্ভব। পাঠকগণ, আমি আপনাদের শপথ করে বলতে পারি যে, যদি আপনারা সাই বাবাকে এক পলক দেখেন, তাহলে সমগ্র বিশ্বই আপনাদের সাইময় মনে হবে।

তুমুল তর্ক

শিরডী পৌঁছে প্রথম দিনই বালাসাহেবের সাথে গুরুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক বেঁধে যায়। আমার মতে নিজের স্বাধীনতা ছেড়ে কারো পরাধীন কেনই বা হওয়া এবং যখন কর্ম করতেই হয় তখন গুরুর কিই বা প্রয়োজন? প্রত্যেককে নিজের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। গুরু শিষ্যের জন্য করেনই বা কি? তিনি তো সুখ-নিদ্রার আনন্দ নেন। এইভাবে আমি স্বতন্ত্র থাকার পক্ষ নিই এবং বালাসাহেব প্রারব্ধের। তিনি বললেন- 'যা ভাগ্যে লেখা আছে, সেটা তো ঘটবেই - সেটা উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষও বদলাতে অসফল হয়ে যান। কথায় বলে- ভাবি এক, হয় আরেক।

তারপর পরামর্শের সুরে বললেন- "ভাই, তোমার এই বিদ্যে-বুদ্ধি ছেড়ে দাও। এইরকম অহংকার তোমায় কোনভাবে সাহায্য করবে না।" এইরূপ দুপক্ষের তর্কা-তর্কিতে প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। শেষে নিরুপায় হয়ে বিবাদ স্থগিত করতে হলো। কিন্তু এর ফল এই হলো যে, আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেলো এবং আমি এটাই অনুভব করলাম যে, যতক্ষন গভীর দৈহিক বুদ্ধির আবরণে থাকা হয়, ততক্ষনই এইরূপ অহংকার ও বিবাদ সম্ভব। বস্তুতঃ সব বিবাদের জড়ই হচ্ছে এই অহংকার। এরপর অন্যান্যদের সাথে যখন মস্‌জিদ পৌঁছই তখন বাবা হঠাৎ কাকা সাহেব দীক্ষিতকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেন- "সাঠে-ওয়াড়ায় কি চলছিল? কি বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল?" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- "এই হেমাডপন্ত কি বলছিলেন?" এ কথাটি শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সাঠে-ওয়াড়া এবং মস্‌জিদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব আছে। সর্বজ্ঞ বা অন্তর্যামী না হলে বাবা তর্কের কথা কি করে জানতে পারতেন?

আমার বার-বার মনে হচ্ছিল বাবা আমায় 'হেমাডপন্ত' নামে কেন সম্বোধন করলেন? এই শব্দটি তো 'হেমাদ্রিপন্ত'-য়ের অপভ্রংশ। হেমাদ্রিপন্ত দেবগিরির যাদব রাজবংশের মহারাজা মহাদেব ও রামদেবের বিখ্যাত মন্ত্রী ছিলেন। উনি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান এবং উত্তম স্বভাবের লোক ছিলেন। 'চতুর্বর্গ চিন্তামনি' (যাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা আছে) এবং 'রাজ প্রশান্তি'-র মতন অতি উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও হিসেব রাখার নবীন প্রণালী ও "মোদী-লিপিমালার (মারাঠী সর্ট হ্যাণ্ড) তিনিই জন্মদাতা। সে জায়গায় কোথায় আমি এক অজ্ঞানী, মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি মানুষ। তাই বুঝতে পারছিলাম না যে, আমাকে এই বিশেষ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার তাৎপর্য্য কি হতে পারে? গভীর বিশ্লেষণের পর এটাই মনে হলো যে, বোধহয় আমার অহংকার চূর্ণ করার জন্যই বাবা এই অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন- ভবিষ্যতে যাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে নিরাভিমানী ও বিনম্র হয়ে থাকি। কিংবা এটা কি আমার বাক্চাতুর্য্যর প্রশংসা? ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টিপাত করলে বোধ হয় যে, বাবার দ্বারা 'হেমাডপন্ত' উপাধিটি দেওয়া কতটা অর্থপূর্ণ ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক হয়েছিল। (সবাই জানে যে কালান্তরে দাভোলকর শ্রী সাই বাবা সংস্থানের পরিচালনা অত্যন্ত বিলক্ষণ ভাবে করে গেছেন এবং তার সাথে-সাথে মহাকাব্য 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' রচনা করেন। এই গ্রন্থে গুরত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির, যেমন- জ্ঞান, বৈরাগ্য, শরণাগতি ও আত্মনিবেদন ইত্যাদির সমাবেশ পাওয়া যায়।)

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ঃ-

এ বিষয়ে বাবার কি মত ছিল, তার উপর হেমাডপন্তদ্বারা লিখিত কোন লেখনী বা স্মৃতি পত্র নেই। কিন্তু কাকাসাহেব দীক্ষিত এই বিষয় একটি লেখনী প্রকাশ করেছেন। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার পরের দিন 'হেমাডপন্ত' এবং কাকাসাহেব বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে মস্জিদে গেলেন। বাবাও স্বীকৃতি দিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করল - "বাবা, কোথায় যাই?" উত্তর এলো - "উপরে যাও।"

প্রশ্ন - "পথ কেমন?"

বাবা - অনেক পথ আছে। একটা পথ এখান থেকেও হয়ে যায়। কিন্তু এই পথ খুবই দুর্গম ও জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের ভয়ও আছে

কাকাসাহেব - যদি পথ প্রদর্শক সঙ্গে থাকে, তাহলে?

বাবা - তাহলে কোন কষ্ট হবে না। সে তোমায় শেয়াল-কুকুর থেকে রক্ষা করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে জঙ্গলে পথ ভুলে যাওয়ার বা গর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই বার্তালাপের সময় দাভোলকর সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। উনি ভাবলেন যে যা কিছু বাবা বলছেন সেটা ওঁরই প্রশ্নের উত্তর যে গুরুর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? উনি একেবারের মতন মনে ঠিক করে নেন যে, এই বিষয়ে আর কোনদিন বাদ-বিবাদ করবেন না যে, স্বাধীন বা পরাধীন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কিরূপ সফল হয়? বরং পরমার্থ লাভের পথে গুরুর উপদেশ পালন করাই উচিত। এই উপদেশগুলির বর্ণনা মূল গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে করা হয়েছে, যাতে লেখা আছে যে শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ মহান অবতার হওয়া সত্ত্বেও আত্মানুভূতির জন্য শ্রীরামকে গুরু বশিষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণকে গুরু সন্দীপনীর শরণে যেতে হয়েছিল। এই পথে উন্নতির জন্য শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য - এই দুটি গুণের আশ্রয় নিতে হয়।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৩

শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি, আদেশ ও প্রতিজ্ঞা, ভক্তদের দ্বারা সমর্পণ, বাবার লীলা আলোকস্তম্ভ স্বরূপ, মাতৃপ্রেম, রোহিলার কাহিনী, বাবার মধুর অমৃতোপদেশ।

শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি ও আশ্বাস

গত অধ্যায়ে এই কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে বাবা সচ্চরিত্র লেখার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন- "এই গ্রন্থটি লেখাতে আমার পুরোপুরি মত আছে। তুমি নিজের মন স্থির করে, আমার কথায় বিশ্বাস রাখো এবং নির্ভয় হয়ে কর্তব্য পালন করতে থাকো। যদি আমার লীলাগুলি লেখা হয়, তাহলে অবিদ্যার নাশ হবে এবং মন ও ভক্তি দিয়ে শ্রবণ করলে দৈহিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হবে। যারা এই লীলাগুলির বেশী গভীরে গিয়ে খোঁজ করবে, তারা অনায়াসেই জ্ঞানরূপী অমূল্য রত্ন আহরণ করবে।"

এই কথাগুলো শুনে হেমাডপন্তের খুব আনন্দ হলো এবং উনি নির্ভয় হয়ে গেলেন। ওঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে উঠল যে এবার তাঁর কাজটি অবশ্যই সফল হবে। বাবা শামার দিকে তাকিয়ে বলেন- "যে ভালোবেসে আমার নাম স্মরণ করবে, আমি তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে দেব। ওর ভক্তি দিনের-পর-দিন বাড়বে। যে আমার চরিত্র এবং কীর্তির শ্রদ্ধাপূর্বক গুণগান করবে, তাকে আমি সর্বদা সবরকম ভাবে সাহায্য করব। বলা বাহুল্য, যে ভক্তরা আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তারা আমার লীলা শ্রবণ করে খুবই আনন্দিত হয়। বিশ্বাস রেখো যে কেউই আমার লীলা কীর্তন করবে সে নিশ্চয় পরমানন্দ ও চিরসন্তোষ লাভ করবে। এটা আমার বৈশিষ্ট্য যে, যে অনন্যরূপে আমার শরণ নেয়, শ্রদ্ধাপূর্বক আমার পূজন, নিরন্তর স্মরণ এবং আমারই ধ্যান করে, তাকে আমি মুক্তি প্রদান করি।"

"যে নিত্য নিরন্তর আমার নাম স্মরণ ও পুজো করে, আমার লীলাগুলি প্রেমপূর্বক মনন করে - এই ধরণের ভক্তদের মধ্যে সাংসারিক বাসনা ও অজ্ঞানরূপী প্রবৃত্তিগুলি কি করে থাকতে পারে? আমি তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিই।"

"**আমার কথা শ্রবণ করলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমার কথাগুলি শ্রদ্ধাপূর্বক শোন ও মনন করো।** সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির জন্য এটাই এক সরল পথ। এর দ্বারা শ্রোতাগণের মনে শান্তি আসবে এবং যখন ধ্যান প্রগাঢ় ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন অখন্ড চৈতন্যধন হতে অভিন্নতা প্রাপ্ত হবে। কেবল 'সাই', 'সাই' উচ্চারণ দ্বারাই তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।"

ভক্তদের বিভিন্ন কার্য্যের প্রেরণা

ভগবান নিজের কোন ভক্তকে মন্দির-মঠ তো কাউকে নদীতীরে ঘাট তৈরী করার, কাউকে তীর্থ পর্য্যটন করার এবং কাউকে ভগবৎ কীর্তন করার - এইরূপ আলাদা-আলাদা কার্য্যের প্রেরণা দেন। এইভাবে আমাকেও 'শ্রীসাই সৎচরিত্র' লেখার প্রেরণা তিনিই দেন। কোন বিদ্যারই সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার দরুণ আমার নিজেকে এই ব্যাপারে সবরকম ভাবে অযোগ্য মনে হচ্ছিল। অতএব এই দুষ্কর কার্য্য করার দুঃসাহস কেনই বা করা উচিত? শ্রী সাই মহারাজের যথার্থ জীবনীর বর্ণনা করার সামর্থ কার আছে? শুধু তাঁর কৃপার দ্বারাই এই কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেইজন্য আমি যখন লেখা শুরু করি, **বাবা আমার অহং-বুদ্ধি নষ্ট করে দেন এবং তিনি স্বয়ং নিজের চরিত্র রচনা করেন। অতএব এই চরিত্রের শ্রেয় তাঁর, আমার নয়।** জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও আমি দিব্যচক্ষুবিহীন ছিলাম, অতএব 'সাই সৎচরিত্র' লিখবার ক্ষেত্রে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় কিই বা অসম্ভব? মূকও বাচাল হয়ে যায় ও পঙ্গুও পাহাড় অতিক্রম করে। নিজের ইচ্ছেমত কাজ সম্পূর্ণ করিয়ে নেওয়ার উপায় তিনিই জানেন। হারমোনিয়াম বা বাঁশি কেমন করে আভাস পাবে সে ধ্বনি কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। এই কথা ত শুধু বাদকই জানে। চন্দ্রকান্ত মনির সৃষ্টি এবং সমুদ্রের কল্লোল এই দুয়ের কোনটারই কারণ তারা নিজেরা নয়; কারণ নিহিত রয়েছে চন্দ্রোদয়ের মধ্যে।

বাবার চরিত্র আলোকস্তম্ভ স্বরূপ

সমুদ্রতটে অনেক স্থানে আলোকস্তম্ভ নাবিককে দুর্ঘটনা থেকে ও জাহাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য বানানো হয়। এই ভবসাগরে 'শ্রী সাইবাবাবর সৎচরিত্র' এর উপযোগিতা ঠিক এইরূপই। এটি অমৃত থেকেও বেশী মধুর ও সাংসারিক পথটিকে সহজ করে তোলে। যখন এটি কানের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন দৈহিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় ও হৃদয়ে একত্রিত করলে সমস্ত কুশঙ্কা লোপ লোপ পায়।

অহংকারের বিনাশ হয় ও বৌদ্ধিক আবরণ লুপ্ত হয়ে জ্ঞান প্রকট হয়। **বাবার বিশুদ্ধ কীর্তির বর্ণনা নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করলে ভক্তদের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এইটি মোক্ষ প্রাপ্তিরও সরল উপায়।** সত্যযুগে শম-দম, ত্রেতাতে ত্যাগ, দ্বাপরে পূজো ও কলিযুগে ভগবৎ কীর্তনই মুক্তির উপায়। এই শেষ সাধনাটি (চারবর্ণের) সকল লোকেদের জন্য সাধ্য। অন্যান্য সাধনা যেমন যোগ, ত্যাগ, ধ্যান ইত্যাদি করা একটু কঠিন, কিন্তু চরিত্র ও হরিকীর্তন শ্রবণ করা অতন্তই সুলভ। শ্রবণ এবং কীর্তন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং ভক্ত বাসনা-রহিত হয়ে আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। এই ফল প্রদান করার জন্যই বাবা এই 'সৎচরিত্র'-য়ের (গ্রন্থটি) নির্মাণ করালেন। ভক্তগণ এবার সরলতাপূর্বক চরিত্র অবলোকন করুন এবং তার সাথে-সাথে তাঁর মনোহর স্বরূপ ধ্যান করে, গুরু এবং ভগবদ ভক্তির অধিকারী হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করুন। 'শ্রীসাই সৎচরিত্র' সফল ভাবে সম্পূর্ণ হওয়াটা সাই মহিমাই জানবেন, আমরা তো শুধু নিমিত্তমাত্র।

মাতৃপ্রেম

গরু নিজের বাছুরকে কিরূপ প্রেম করে সেটা সবাই জানে। ওর স্তন সর্বদাই দুধে ভরা থাকে এবং যখন ক্ষিধের চোটে বাছুর স্তনের দিকে ছুটে আসে, তখন দুধের ধারা আপনা-আপনি প্রবাহিত হতে থাকে। ঠিক এইভাবেই মাও নিজের সন্তানের প্রয়োজন আগে থেকেই খেয়াল রাখেন এবং ঠিক সময় স্তনপান করান। সন্তানের রূপ-সজ্জা দেখে মায়ের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। মায়ের প্রেম বিচিত্র, অসাধারণ ও নিঃস্বার্থ - তার কোন উপমা দেওয়া যায় না। শিষ্যের প্রতি সদ্‌গুরুর প্রেম ঠিক এই রকমই এবং বাবার আমার প্রতি অনুরূপ প্রেম ছিল। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করছিঃ-

১৯১৬ সালে আমি চাকরী থেকে অবকাশ গ্রহণ করি। যা পেনশন আমি পেতাম ,তা দিয়ে পুরো পরিবারের জীবন নির্বাহ একটু কঠিন মনে হচ্ছিল। সেই বছর গুরু পূর্ণিমার দিন আমিও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে শিরডীতেই ছিলাম। বাবার এক ভক্ত আন্না চিঞ্চনীকর নিজে-নিজেই বাবার কাছে আমার জন্য এইরূপ প্রার্থনা করেন - " এর উপর কৃপা করুন। যা পেনশন ইনি পান, তা নির্বাহযোগ্য নয়। কুটুম্ব বৃদ্ধি হচ্ছে। দয়া করে আরেকটি চাকরী পাইয়ে দিন যাতে এঁর চিন্তা দূর হয়।" বাবা উত্তর দেন - "ইনি চাকরী পেয়ে যাবেন কিন্তু এঁকে আমার সেবাতেই রত হয়ে আনন্দ অনুভব করা উচিত। এঁর ইচ্ছে সর্বদা পূরণ হবে। **সম্পূর্ণ মনযোগ আমার দিকে**

দিয়ে অধার্মিক ও দুর্জন থেকে দূরে থাকা উচিত। এঁকে সবার সঙ্গে দয়াপূর্ণ ও নম্র ব্যবহার করা উচিত ও অন্তঃকরণে আমারই উপাসনা করা উচিত। যদি ইনি এইরূপ আচরণ করতে পারেন, তাহলে নিত্যানন্দের অধিকারী হয়ে যাবেন।”

রোহিলার কাহিনী

এই কাহিনীটি এই সত্যের প্রমাণ দেয় যে, শ্রী সাইবাবা সমস্ত প্রাণীদের সমানরূপে ভালবাসতেন। এক সময় রোহিলা নামক এক ব্যক্তি শিরডীতে থাকতে এলো। তার শরীর লম্বা-চওড়া, সুদৃঢ় ও সুগঠিত। বাবার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ও শিরডীতেই থাকতে লাগল। সে অষ্টপ্রহর উচ্চস্বরে ‘কল্‌মা’ (কোরানের শ্লোক) পাঠ করত এবং ‘আল্লা হো আকবর’ এর ডাক আওড়াতো। শিরডীর অধিকাংশ বাসিন্দারা সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে যখন রাতে বাড়ী ফিরত, তখন রোহিলার কর্কশ আওয়াজ তাদের আরাম ও শান্তি ভঙ্গ করত। রাতে বিশ্রাম না করতে পারার দরুণ তারা যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধে অনুভব করছিল। অনেকদিন ওরা এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠলে ওরা বাবার কাছে রোহিলাকে এই উৎপাত বন্ধ করতে বলার জন্য প্রার্থনা জানাতে গেল। কিন্তু বাবা তাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্যই করলেন না, বরং গ্রামবাসীদেরই শাসন করে বললেন যে, তাদের নিজের কাজের প্রতি মন দেওয়া উচিত, রোহিলার দিকে নয়। বাবা তাদের জানালেন যে, রোহিলার স্ত্রী একটু দুষ্ট প্রকৃতির এবং সে রোহিলা ও বাবাকে যথেষ্ট কষ্ট দেয়। কিন্তু ‘কোরাণ শরীফ’-য়ের কল্‌মার সামনে সে টিঁকতে সাহস করে না। তবে গিয়ে দুজনে একটু শান্তিতে ও সুখে থাকতে পারে। কিন্তু আসলে রোহিলার কোন স্ত্রী ছিল না। বাবা শুধু কুবিচারের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বাবা প্রার্থনা এবং ঈশ্বর উপাসনাকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। সুতরাং তিনি রোহিলার পক্ষ নিয়ে গ্রামবাসীদের শান্তিপূর্বক কিছুদিন উৎপাত সহ্য করতে পরামর্শ দেন।

বাবার মধুর অমৃতোপদেশ

একদিন মধ্যাহ্ন আরতির পর, ভক্তরা যখন নিজেদের বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল, সেই সময় বাবা নিম্নলিখিত অতি সুন্দর উপদেশটি দেন -

“তুমি যেখানে খুশি সেখানে থাকো, যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু সব সময় মনে রেখো যে, তুমি যাই করো আমি সব জানতে পারি। **আমিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু এবং সর্বস্থানে ব্যাপ্ত। আমারই উদরে সমস্ত জড় ও চেতন প্রাণীর উদ্ভব।**

আমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা এবং সঞ্চালক। আমিই উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। যারা আমায় ভক্তি করে, তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারে না। আমার ধ্যান যারা উপেক্ষা করে, তারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত জন্তু, জীব এবং দৃশ্যমান, পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী বিশ্ব আমারই স্বরূপ।' এই সুন্দর ও অমূল্য উপদেশ শুনে আমি তৎক্ষনাৎ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, এরপর ভবিষ্যতে নিজের গুরু ছাড়া অন্য কোন মানুষের সেবা করব না। "তুই চাকরী পেয়ে যাবি" - বাবার এই শব্দগুলি আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমার মনে হতো- "সত্যি-সত্যি কি এমনটি হবে?" কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাবার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সত্য হয়। আমি কিছুদিনের জন্য আরেকটা চাকরী পাই। তারপর স্বাধীন হয়ে একাগ্রচিত্তে শেষ জীবন অবধি বাবার সেবা করি।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে আমি পাঠকদের কাছে বিনম্র নিবেদন করছি যে, তাঁরা সমস্ত বাধা যেমন- আলস্য, নিদ্রা, মনের চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়-আসক্তি দূর করে নিজেদের মন বাবার লীলাগুলির দিকে দিন। সরল প্রেম নির্মাণ করে ভক্তি রহস্য জানুন এবং অন্যান্য সাধনায় শ্রম ও সময় যেন নষ্ট না করেন। **ওঁদের শুধু একটাই সহজ উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং সেটা হলো শ্রীসাই লীলা শ্রবণ।** এর দ্বারা অজ্ঞানতার অবসান হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে যাবে। অনেক স্থান ভ্রমণ করার পরও লোভী পুরুষ যেমন নিজের লুকানো ধনের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকে, ঠিক সেই রকমই শ্রী সাইকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করুন। পরের অধ্যায়ে শ্রী সাইয়ের শিরডী আগমনের বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৪

শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন, সন্তদের অবতার কার্য্য, পবিত্র তীর্থ শিরডী, শ্রী সাইবাবার ব্যক্তিত্ব, গৌলী বুয়ার অভিজ্ঞতা, শ্রী বিট্‌ঠল-এর আবির্ভাব, ক্ষীরসাগরের কথা, দাসগণুর প্রয়াগ স্নান, তিনটি 'ওয়াড়া'।

সন্তদের অবতার ক্রীড়া (লীলা)

ভগবদ্‌গীতায় (চতুর্থ অধ্যায় ৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "যে-যে কালে ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, সে-সে সময় আমি অবতার ধারণ করি। ধর্মস্থাপন, দুষ্টজনের বিনাশ এবং সাধুজনদের পরিত্রাণের জন্য আমি যুগে-যুগে জন্ম নিই।" সাধু-সন্ত ভগবানেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। তাঁরা উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হয়ে নিজেদের অবতার কার্য্য পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজেদের কর্তব্যের প্রতি বিমুখ হয়ে যায়; যখন শুদ্র উচ্চ জাতির লোকেদের অধিকার কাড়তে শুরু করে; যখন ধর্মের আচার্য্যদের অনাদর ও নিন্দা হয়; যখন লোকজন নিষিদ্ধ ভোজ্য পদার্থ ও মদ্যপান করতে শুরু করে ও ধর্মের আড়ালে নিন্দিত কার্য্য স্থান পায়; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন পরস্পর দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে; যখন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি কর্ম ছেড়ে দেয়, কর্মঠ পুরুষদের ধার্মিক কার্য্যে অরুচি উৎপন্ন হয়ে যায়; যখন যোগীগণ ধ্যানাদি কর্ম করা ছেড়ে দেন এবং যখন জনসাধারণের এই ধারণা হয়ে যায় যে, শুধু **ধন, সন্তান এবং স্ত্রীই সর্বস্ব এবং এইভাবে লোকেরা সত্যের পথ হতে বিচলিত হয়ে অধঃপতনের দিকে** অগ্রসর হতে শুরু **করেঃ- তখন সন্তগণ আবির্ভূত হয়ে নিজেদের উপদেশ** এবং **আচরণ দ্বারা ধর্মের সংস্থাপনা করেন।** তাঁরা সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের ন্যায় আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং সত্যের পথে চলতে প্রেরণা দেন। এই ভাবে বহু মহামানব যেমন- নিবৃত্তিনাথ, তুকারাম, নরহরি, নরসীভাই, সঞ্জন কসাই, রামদাস এবং অন্যান্য অনেকে সত্যের পথের দিগ্‌দর্শন করাবার জন্য বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সর্বশেষে শিরডীতে শ্রী সাইবাবার অবতার লীলা ঘটে।

পবিত্র তীর্থ শিরডী

আহমদনগর জেলার গোদাবরীর তীর খুবই ভাগ্যবতী। এখানে অনেক সন্তরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অনেকে আশ্রয় পেয়েছেন। এই ধরনের সন্তদের তালিকায়

শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজ প্রধান। শিরডী আহমদনগর জেলার কোপরগ্রাম তালুকে পড়ে। গোদাবরী নদী পার করে রাস্তা সোজা শিরডী যায়। আট মাইল চলার পর নিমগ্রাম পৌঁছতেই শিরডী দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণা নদীর তীরে অন্যান্য তীর্থস্থান যেমন- গঙ্গাপুর, নরসিংহবাড়ী এবং ঔদুম্বরের ন্যায় শিরডীও এক প্রসিদ্ধ তীর্থ। যেমন দামোজী মঙ্গলবেড়াকে, রামদাস সজ্জনগরকে, দত্তাবতার নরসিংহ সরস্বতী বাড়ীকে পবিত্র করেছিলেন, ঠিক সেই রকমই শ্রী সাইনাথ শিরডীতে অবতীর্ণ হয়ে এই স্থানটিকে ধন্য করেন। শ্রী সাইবাবার সান্নিধ্যে শিরডীর মাহাত্ম্য বিশেষ বেড়ে যায়। এবার আমরা তাঁর চরিত্রের দিকে আসব। তিনি এই ভবসাগর জয় করে নিয়েছিলেন, যেটি পার করা অত্যন্ত দুষ্কর ও কঠিন। শান্তি তাঁর আভূষণ ছিল এবং তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। বৈষ্ণব ভক্তরা সর্বদাই তাঁর চরণে আশ্রয় পেতো। দানবীরদের মধ্যে রাজা কর্ণের মত দানী ছিলেন। ঐহিক পদার্থর প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অরুচি বোধ হত। সর্বক্ষণ আত্মস্বরূপেই নিমগ্ন থাকা তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনিত্য বস্তুর আকর্ষণ তাঁকে ছুঁতে পারত না। তাঁর মন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল। তাঁর শ্রীমুখ থেকে সর্বদাই অমৃত ঝরত। তিনি কখনো গরীব ও ধনীর মধ্যে পার্থক্য করেননি। মান-অপমানের বিষয়েও কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা করতেন না- নির্ভয় হয়ে সম্ভাষণ করতেন। বিভিন্ন প্রকারের লোকেদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন, নর্তকীদের অভিনয় এবং নৃত্য দেখতেন ও 'গজল'-কাওয়ালীও শুনতেন। এসবের মাঝেও তাঁর সমাধি (ধ্যান) কিঞ্চিৎমাত্রও ভঙ্গ হত না। 'আল্লা'-র নাম সব সময় ওঁর জিভে ঘুরে বেড়াত। জগৎ ঘুমোলে তিনি জাগতেন এবং জগৎ জাগলে তিনি ঘুমোতেন। এর ব্যাখ্যা যদি ভগবদগীতার হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে এইরূপ বলা যায় - যে বিষয়ে জগতের লোক লালয়িত বা সজাগ থাকে সে সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন এবং যে শাশ্বত ও নিত্য বস্তুর দিকে জগত সুপ্ত থাকে সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতেন। (সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ে অরু শোয়ে। দুখিয়া দাস কবির হ্যায় জাগে অরু রোয়ে- কবীর)। তাঁর অন্তঃকরণ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত ছিল। কেউ নাতো তাঁর বর্ণাশ্রম জানতে পেরেছে আর না পেয়েছে তাঁর কার্য্যপ্রণালীর হদিস। একই স্থানে বাস করেও বিশ্বের সমস্ত ঘটনার খবর তাঁর মুঠোয় থাকত। তাঁর দরবার অতি চিত্তাকর্ষক ছিল। তিনি অনেক রকমেরই গল্প-গুজব করতেন, কিন্তু তাঁর অখন্ড শান্তি কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হত না। তিনি প্রতিদিন মস্‌জিদের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন। সকালে, দুপুরে ও বিকেলে নিয়মিতভাবে 'চাওড়ী'তে বেড়াতে যেতেন। সেই সময়ও সর্বক্ষণ আত্মস্থিত থাকতেন। তিনি বিনম্র, দয়ালু ও অভিমান-শূণ্য ছিলেন। সদাই সবাইকে সুখ দিয়েছেন। এইরূপ

ছিলেন আমাদের শ্রী সাই বাবা যাঁর চরণস্পর্শ পেয়ে শিরডী পবিত্র হয়ে গেছে। তার মাহাত্ম্য অসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে জ্ঞানেশ্বর আলন্দীকে এবং একনাথ পৈঠনের উত্থান করে ছিলেন, ঠিক সেইভাবে শ্রী সাইবাবা শিরডীকে উদ্দীপ্ত করেন। শিরডীর ফুল, পাতা ও পাথরও ধন্য, যারা শ্রী সাই চরণের চুম্বন পেয়েছে এবং তাঁর চরণের ধূলি মাথায় ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। ভক্তদের জন্য শিরডী একটি দ্বিতীয় পন্ঢরপুরী, জগন্নাথপুরী,দ্বারকা, বেনারস (কাশী), মহাকালেশ্বর এবং মহাবলেশ্বর হয়ে গড়ে উঠল। শ্রী সাইয়ের দর্শন করাই ভক্তদের জন্য বেদমন্ত্র ছিল, যার পরিণামস্বরূপ আসক্তি কমতে থাকত এবং আত্মদশর্নের পথ সহজতম হয়ে যেত। তাঁর পাদসেবন করাই ত্রিবেণী (প্রয়াগ) স্নানের সমান এবং চরণামৃত পান করলেই সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হওয়ার ন্যায় তৃপ্তি প্রাপ্ত হত। তাঁর আদেশ আমাদের জন্য বেদবাক্য। প্রসাদ এবং উদী (বিভূতি) গ্রহণ করলে মন শুদ্ধ হত। তিনি আমাদের রাম, কৃষ্ণ ও পরমব্রহ্ম, যিনি আমাদের মুক্তি প্রদান করলেন। তিনি কখনো নিরাশ বা হতাশ হতেন না। তিনি ছিলেন আনন্দের মঙ্গলমূর্তি। নামমাত্রেই শিরডী তাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল কিন্তু তাঁর কার্য্যক্ষেত্র পাঞ্জাব, কলিকাতা, উত্তর ভারত, গুজরাত, ঢাকা এবং কোংকণ অবধি বিস্তৃত ছিল। শ্রী সাইবাবার খ্যাতি দিন-প্রতিদিন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা দর্শন লাভের জন্য শিরডীতে আসতে শুরু করল। কেবলমাত্র দর্শনেই লোকেদের হৃদয় শান্ত হয়ে যেত। তারা ঠিক সেই রকমই আনন্দ অনুভব করত, যেমন পন্ঢরপুরের শ্রী বিট্ঠলের দর্শন করলে আনন্দ হয়। এটা কোন অতিরঞ্জিত উক্তি নয় - দেখুন একজনের এমনই অনুভূতি হয়।

গৌলী বুওয়া

প্রায় ৯৫ বছরের বয়োবৃদ্ধ ভক্ত, যাঁর নাম গৌলী বুওয়া ছিল, পন্ঢরীর এক পর্য্যটক ছিলেন। উনি ৮ মাস পন্ঢরপুরে এবং চার মাস (আষাঢ় থেকে কার্ত্তিক মাস অবধি) গঙ্গাতীরে বাস করতেন। জিনিষপত্র বইবার জন্য একটা গাধা নিজের কাছে রাখতেন এবং একজন শিষ্যও সব সময় ওঁর সঙ্গে থাকত। উনি প্রতি বছর পন্ঢরপুর যেতেন এবং ফেররার পথে শ্রী বাবার দর্শন করার জন্য শিরডী আসতেন। বাবার প্রতি ওঁর অগাধ প্রেম ছিল। উনি নির্ণিমেষ নয়নে বাবার দিকে চেয়ে থাকতেন এবং বলে উঠতেন- 'এই তো শ্রী পন্ঢরীনাথ, শ্রী বিট্ঠলের অবতার, যিনি দীনের উপর কৃপা করেন ও অনাথের নাথ।' গৌলী বুয়া শ্রী বিট্ঠলের পরম ভক্ত ছিলেন। উনি অনেকবার পন্ঢরীপুরের যাত্রা করেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন যে, শ্রী সাইবাবা সত্যি-

সত্যিই পন্ডরীনাথ।

বিট্‌ঠল স্বয়ং আবির্ভূত হন

শ্রী সাইবাবার ঈশ্বর চিন্তন এবং ভজন-কীর্তনে বিশেষ অভিরুচি ছিল। তিনি সব সময় 'আল্লাহ মালিক' উচ্চারণ করতেন এবং ভক্তদের দিয়ে কীর্তন সপ্তাহের আয়োজন করাতেন। এটিকে 'নামসপ্তাহ'ও বলা যেতে পারে। একবার উনি দাসগণুকে নামসপ্তাহ (কীর্তণ সপ্তাহ) করবার আদেশ দেন। তাতে দাসগণু বলেন- "আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করছি, কিন্তু একটা আশ্বাস পেতে চাই যে, সপ্তাহের শেষে বিট্‌ঠল অবশ্যই দেখা দেবেন।' বাবা নিজের বুক স্পর্শ করে বললেন- "বিট্‌ঠল অবশ্যই দেখা দেবেন। কিন্তু তার জন্য ভক্তদের মধ্য শ্রদ্ধা ও তীব্র উৎকণ্ঠাও অনিবার্য্য। ঠাকুর নাথের ডঙ্কপুরী, বিট্‌ঠলের পন্ঢরী, রণছোড়ের দ্বারকা ত এখানেই। কারো অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। বিট্‌ঠল কি বাইরে কোথাও থেকে আসবেন? তিনি এখানেই বিরাজমান। যখন **ভক্তদের মধ্যে প্রেম এবং ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হবে, তখন বিট্‌ঠল স্বয়ং এখানে আবির্ভূত হবেন।"**

সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর বিট্‌ঠল ভর্গবান সত্যি-সত্যি দেখা দেন। কাকাসাহেব দীক্ষিত নিত্য নিয়মানুসারে স্নান করার পর যখন ধ্যান করতে বসেন, তখন বিট্‌ঠলের দর্শন পান। দুপুরে যখন বাবার দর্শনার্থে মস্‌জিদে পৌঁছন, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি হে? বিট্‌ঠল পাটীল এসেছিলেন না? তুমি তাঁর দর্শন করলে? উনি খুব চঞ্চল। তাই কষে ধরে রেখো। যদি একটুও অসাবধান হও, তাহলে কিন্তু উনি পালিয়ে যাবেন।" এই ঘটনাটি ভোরবেলায় ঘটে এবং দুপুরবেলা কাকাসাহেব আবার দর্শন পান। ঠিক ঐ দিন এক ছবি বিক্রেতা ২৫-৩০টা বিঠোবার ছবি নিয়ে সেখানে বিক্রী করতে আসে। এই ছবিটি ঠিক ঐ রকমটি ছিল যেমনটি কাকাসাহেব ধ্যানে দেখেছিলেন। ছবিটি দেখে ও বাবার কথা স্মরণ করে কাকাসাহেব খুবই বিস্মিত ও প্রসন্ন হন। উনি একটা ছবি সানন্দে কিনে নিজের পূজোর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঠানার অবসরপ্রাপ্ত মামলতদার শ্রী বি. ভি. দেব নিজের অনুসন্ধান দ্বারা এটা প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, শিরডী পন্ঢরপুরের পরিধির মধ্যেই পড়ে। দক্ষিণে পন্ঢরপুর শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ বাসস্থান, অতএব শিরডী দ্বারকাপুরী (সাই লীলা পত্রিকা ভাগ ২, পৃষ্ঠা ১১০ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

চতুর্ণামপি বর্গণাং যত্র দ্বারাণি সর্বতঃ।
অতো দ্বারাবতীম্যুক্তা বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।।

যেই স্থান চারি বর্গের লোকেদের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের জন্য সুলভ, দার্শনিকজন সেই জায়গাকে দ্বারকা' নামে ডাকেন। শিরডীতে বাবার মস্‌জিদ শুধুমাত্র চারি বর্ণের লোকেদের জন্যই নয়, বরং দলিত, অস্পৃশ্য ও ভাগোজী সিন্দের মত কুষ্ঠদের জন্যও খোলা ছিল। সুতরাং শিরডীকে দ্বারকা বলাই উচিত।

ভগবন্তরাও ক্ষীরসাগরের কথা

শ্রী বিট্‌ঠল পূজো বাবার কত ভালো লাগত, সেটা ভগবন্তরাও ক্ষীরসাগরের কাহিনীর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভগবন্তরাও-য়ের বাবা বিঠোবার পরমভক্ত ছিলেন। উনি প্রতি বছর পন্ঢরপুরে জল নিয়ে যেতেন। ওঁর বাড়ীতে বিঠোবার একটা মূর্তিও ছিল এবং উনি তাঁর নিয়মিত পূজো করতেন। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর ছেলে ভগবন্তরাও তীর্থযাত্রা, পূজো, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ করে দেন। যখন ভগবন্তরাও শিরডী আসেন তখন বাবা ওঁকে দেখেই বলে উঠেন- "এঁর পিতৃদেব আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাই আমি এঁকে এখানে ডেকেছি। ইনি কখনোই নৈবেদ্য অর্পণ করেননি এবং আমাকে ও বিঠোবাবাকে না খাইয়ে মারছেন। তাই আমি এঁকে এখানে আসার প্রেরণা দিই। এবার আমি জেদ করে এঁকে দিয়ে পুজো-অর্চনা শুরু করাব।"

দাসগণুর প্রয়াগ স্নান

গঙ্গ-যমুনার সঙ্গমে প্রয়াগ এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। হিন্দুদের এমন ধারণা যে, সেখানে স্নানাদি করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক উৎসব বা পর্বে ভক্তগণ সেখানে যান এবং স্নান করে পূণ্য লাভ করেন। একবার দাসগণুরও সেখানে গিয়ে স্নান করার ইচ্ছে জাগে। তাই উনি বাবার কাছে অনুমতি নিতে উপস্থিত হন। বাবা বললেন- **'মিছিমিছি অত দূর যাওয়ার কি দরকার? আমাদের প্রয়াগ তো এখানেই।** আমার উপর বিশ্বাস রাখো।" আশ্চর্য্য! মহান আশ্চর্য্য! যেই দাসগণু বাবার চরণে নতমস্তক হন অমনি বাবার শ্রী চরণ হতে গঙ্গা-যমুনার ধারা বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে দাসগণু প্রেমভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। চোখ থেকে প্রেমাশ্রু অঝোরে বইতে লাগল। ওঁর মুখ থেকে শ্রী সাই বাবার স্রোতস্বিনী স্বতঃপ্রবাহিত হতে লাগল।

শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন

শ্রী সাইবাবার মাতা, পিতা বা জন্মস্থানের বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। এই বিষয়ে অনেক খোঁজ-খবর করা হয়েছে। বাবাকে ও অন্যলোকেদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক উত্তর বা সূত্র পাওয়া যায়নি। আসলে আমরা এই ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। নামদেব এবং কবীর দাসের জন্ম অন্যান্য লোকদের ন্যায় হয়নি। নামদেবকে গোণাই ভীমরথী নদীর তীরে ও কবীর দাসকে তমাল ভাগীরথী নদীর তীরে দেখতে পেয়েছিলেন। ঠিক এরকমই শ্রী সাইবাবার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। তিনি শিরডীর এক নিম বৃক্ষের নীচে ষোল বছরের তরুণ বালকের রূপে ভক্তদের কল্যাণার্থে দেখা দেন। সেই সময়ও তাঁকে দেখে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী মনে হত। স্বপ্নেও তিনি কোন লৌকিক পদার্থের ইচ্ছা করতেন না। তিনি মায়াকে দূরে রাখতেন এবং মুক্তি তাঁর চরণে স্থান খুঁজত। শিরডী গ্রামের এক বৃদ্ধা (নানা চোপদাদের মা) তাঁকে এইরূপ বর্ণনা করেছেন - "একটি তরুণ, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ এবং অতি রূপবান বালক নিম বৃক্ষের নীচে সমাধিতে লীন দেখা যায়। গ্রীষ্ম বা শীতের চিন্তা তার কিঞ্চিৎমাত্র ছিল না। তাঁকে এত অল্প বয়সে এত কঠিন তপস্যা করতে দেখে লোকেরা খুব অবাক হত। দিনের বেলা তিনি কারো সাথে দেখা করতেন না এবং রাত্তিরে নির্ভয়ে একান্তে ঘুরে বেড়াতেন। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত যে, তরুণটি কোথা থেকে এসেছে। তাঁকে দেখতে এত সুন্দর ছিল যে, একবার দেখলেই মানুষ তাঁর দিকে আকর্ষিত হয়ে যেত। তিনি সর্বক্ষণ নিম বৃক্ষের নীচে বসে থাকতেন এবং কারো বাড়ী যেতেন না। যদিও বয়সে তরুণ ছিলেন, তবুও তাঁর ব্যবহার মহাত্মাদের মত ছিল। তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।" একবার একটি খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। এক ভক্তের উপর ভগবান খন্ডোবা ভর করেন। সন্দেহ দূর করার জন্য লোকে বাবার বিষয়ে প্রশ্ন করে- "হে দেব! দয়া করে বলুন ইনি কোন ভাগ্যবান পিতার পুত্র এবং ইনি কোথা থেকে এসেছেন।" তখন ভগবান খণ্ডোবা একটা কোদাল আনতে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান খুঁড়তে বললেন। সেই স্থানটি বেশ খানিকটা খোঁড়া হলে একটা পাথরের নীচে একটা ইঁট পাওয়া যায়। ইঁটটা সরাতেই সেখানে একটা দরজা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে চারটি প্রদীপ জ্বলছিল। ঐ দরজা থেকে একটি পথ একটি গুহার দিকে যাচ্ছিল যেখানে গোমুখী আকারের একটি ইমারত, একটা কাঠের তক্তা, মালা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান খন্ডোবা বললেন- "এই যুবকটি এখানে বারো বছর তপস্যা করেছে।" এরপর লোকেরা দরজাটাকে আবার বন্ধ করে দেয়। যেরকম অশ্বথ গাছকে আমরা পবিত্র মনে করি, ঠিক সেই রূপই

বাবা এই নিম বৃক্ষটিকে পবিত্র মনে করতেন ও খুবই ভালবাসতেন। মহালসাপতি এবং শিরডীর অন্যান্য ভক্তরা এই স্থানটিকে বাবার গুরুর সমাধিস্থল মনে করে সদা সশ্রদ্ধায় প্রণাম করতেন।

তিনটি 'ওয়াড়া'

নিম বৃক্ষের চারিপাশের জমিটি শ্রী হরি বিনায়ক সাঠে কিনে নিয়েছিলেন এবং সেখানে একটা বিশাল ভবন নির্মাণ করান, যার নাম 'সাঠে ওয়াড়া' রাখা হয়। বাইরের লোকেদের জন্য এই ভবনটিই একমাত্র বিশ্রাম গৃহ ছিল এবং সেখানে সর্বক্ষণই ভিড় থাকত। নিম গাছের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট্ট মন্দির আছে, যেখানে ভক্তরা দালানের উপর উত্তরাভিমুখী হয়ে বসে। লোকেদের এমন বিশ্বাস যে, যে যারা বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় সেখানে ধূপ ইত্যাদি সুগন্ধিত পদার্থ জ্বালায় তারা ঈশ্বরের কৃপায় সর্বদা সুখী থাকবে। এই ভবনটি খুবই পুরনো ও জরা-জীর্ণ অবস্থায় ছিল। তার জীর্ণতা সংস্কার করাবার নিতান্তই দরকার বোধ হচ্ছিল। এই কাজটি সংস্থান দ্বারা করা হয়। কিছুদিন পর আরেকটি ভবন তৈরী করা হয় এবং এর নাম দীক্ষিত ওয়াড়া রাখা হয়। কাকাসাহেব দীক্ষিত ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এক দুর্ঘটনার ফলে পায়ে গুরুতর আঘাত পান। উনি অনেক রকমের চিকিৎসা করান, কিন্তু সেই অসুস্থতার থেকে আরোগ্যলাভ হচ্ছিল না। নানাসাহেব চাঁদোরকর তাঁকে বাবার কৃপা প্রাপ্ত করবার পরামর্শ দেন। তাই কাকাসাহেব দীক্ষিত স্থায়ীভাবে শিরডীতে থাকবেন বলে স্থির করেন এবং ভক্তদের থাকার জন্য একটা ভবন নির্মাণ করান। এই ভবনের শিলান্যাস ৯-১২-১৯৯০ সালে হয়। ঐ দিনই দুটি বিশেষ ঘটনা ঘটে - ১) শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি পান। ২) চাওড়ীতে রাত্তিরের আরতি আরম্ভ হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ভবন পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায় এবং রামনবমীর (১৯১১) শুভ দিনে এর উদ্‌ঘাটন করা হয়। এর পর, নাগপুরের এক লক্ষপতি শ্রী বুটী সাহেব আরেকটি ভবন নির্মাণ করান। এই ভবন নির্মাণের জন্য অনেক ধনরাশি ব্যয় হয়। কিন্তু ওঁর সমস্ত পরিশ্রম ও ধন সার্থক হয়েছিল কারণ বাবার পবিত্র শরীর এখন ওখানেই শায়িত রয়েছে। বুটী 'ওয়াড়া'ই বর্ত্তমানে 'সমাধি-মন্দির' নামে বিখ্যাত। এই মন্দিরের জায়গায় এক সময় একটা বাগান ছিল, যেখানে বাবা স্বয়ং গাছে জল দিতেন এবং দেখাশুনা করতেন। যেখানে এক সময় একটা ছোট্ট কুটীরও ছিল না, সেখানে তিন-তিনটে ভবন নির্মাণ হয়ে গেল। এদের মধ্যে 'সাঠে ওয়াড়া' পূর্বকালে খুবই উপযোগী ছিল। বাগানের কথা, বামন তাত্য়ার সাহায্যে স্বয়ং বাগানের দেখাশোনা, শিরডী থেকে শ্রী সাইবাবার

অস্থায়ী অনুপস্থিতি এবং চাঁদ পাটীলের বরযাত্রীর সাথে আবার শিরডী ফেরা, দেবীদাস, জানকী দাস এবং গঙ্গাগীরের সঙ্গতি, মোহিদ্দীন তম্বোলীর সাথে কুস্তি, মস্‌জিদে তাঁর অবস্থান, শ্রী ডেঙ্গলে এবং অন্যান্য ভক্তদের প্রতি প্রেম এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির বর্ণনা পরের অধ্যায়ে করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্‌ ভবতু।।

অধ্যায় - ৫

চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে শ্রী সাইবাবার পুণঃ আগমন, অভিনন্দন এবং 'শ্রী সাই' শব্দ দ্বারা সম্বোধন, অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বেশভূষা এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী, পাদুকার কথা, মোহিদ্দীনের সাথে কুস্তি, মোহিদ্দীনের জীবন পরিবর্তণ, জলের তেলে রূপান্তর, নকল গুরু জৌহর আলী।

গত অধ্যায়ে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছিলাম, এবার শ্রী সাইবাবার শিরডী থেকে অন্তর্ধাণ হওয়ার পর তাঁর শিরডীতে পুনরায় কিভাবে আগমন হলো - সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

চাঁদ পাটীলের শালার বরযাত্রীর সাথে পুণঃ আগমন

ঔরাঙ্গাবাদ জেলার (নিজাম স্টেট) ধূপগ্রামে চাঁদ পাটীল নামক এক ধনী মুসলমান থাকতেন। ঔরঙ্গাবাদ যাওয়ার পথে তাঁর ঘোটকী হারিয়ে যায়। দুমাস ধরে অনেক খোঁজাখুজি করার পরও তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অবশেষে নিরাশ হয়ে জীনটা কাঁধে ফেলে তিনি ঔরঙ্গাবাদ ফিরছিলেন। প্রায় চোদ্দ মাইল হাঁটার পর তিনি এক জায়গায় একটি আম গাছের নীচে এসে দেখেন এক ফকির সেখানে বসে আছে। তাঁর মাথায় একটা টুপী, গায়ে কফনী এবং কাছেই একটা দণ্ড রাখা ছিল। ফকিরের ডাকে চাঁদ পাটীল তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জীনটা দেখে ফকির জিজ্ঞাসা করেন, "এই লাগাম এখানে কেন?" চাঁদ পাটীল নৈরাশ্য ভরা স্বরে বললেন- "কি আর বলি? আমার একটি ঘোটকী ছিল, সেটা কোথাও হারিয়ে গেছে - এটা তারই লাগাম।"

ফকির বললেন- "একটু নালার দিকে খুঁজে দেখো।" চাঁদ পাটীল নালার কাছে গিয়ে দেখেন ঘোটকী সেখানে ঘাস খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। তিনি তক্ষুনি বুঝতে পারেন যে, ফকির কোন সাধারণ লোক নয়, বরং কোন উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী পুরুষ। ঘোটকী নিয়ে যখন তিনি ফকিরের কাছে ফিরে আসেন, ততক্ষনে ফকির ছিলিম তৈরী করে নিয়েছেন - শুধু দুটি জিনিষের দরকার ছিল। এক তো ছিলিম জ্বালাবার জন্য আগুন ও দ্বিতীয় কাপড়টা ভেজাবার জন্য জল। ফকির নিজের

চিমটেটি মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে বার করতেই তার সাথে একটা জ্বলন্ত কয়লা বেরোল। সেটা ছিলিমের উপর রাখা হলো। এরপর ফকির পাশে রাখা দন্ডটি দিয়ে যেই মাটির উপর প্রহার করলেন, সেখান থেকে জলের ধারা বেরোতে লাগল এবং কাপড়টা তাতে ভিজিয়ে ছিলিমটা জড়িয়ে নিলেন। এইরূপ সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর বাবা ছিলিমে টান দেন এবং চাঁদ পাটীলের দিকে এগিয়ে দেন। এই সব চমৎকার দেখে চাঁদ পাটীল খুবই বিস্মিত হন। তিনি ফকিরকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। পরের দিন ফকির চাঁদ পাটীলের সাথে তার বাড়ী যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন। পাটীল ছিলেন ধূপগ্রামের এক উচ্চ পদাধিকারী। তাঁর বাড়ীতে তাঁর শ্যালকের বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। বরযাত্রী শিরডী অভিমুখে রওনা হয়। ফকিরও বরযাত্রীদের সাথে শিরডী যান। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল এবং বরযাত্রী সকুশলে ধূপগ্রাম ফিরে এলো। কিন্তু সেই ফকির শিরডীতেই থেকে যান এবং শেষ জীবন অবধি সেখানেই থাকেন।

ফকিরের 'সাই' নাম পাওয়া

শিরডী পৌঁছেই বরযাত্রীদের খান্ডোবা মন্দিরের কাছে মহালসাপতির ক্ষেতের মধ্যে একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বলা হলো। খান্ডোবা মন্দিরের সামনেই গরুর গাড়ীগুলোকে দাঁড় করানো হয় এবং সব বরযাত্রীরা এক-এক করে নীচে নামে। তরুণ ফকিরকে নীচে নামতে দেখে মহালসাপতি 'এসো সাই' বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। অন্যান্য উপস্থিত লোকেরাও তাঁকে 'সাই' বলেই সম্বোধন করে তাঁকে সম্মান জানান। এর পর থেকে তিনি 'সাই' নামেই প্রসিদ্ধ হন।

অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সংযোগ

শিরডী আসার পর শ্রী সাইবাবা মস্‌জিদে থাকতে শুরু করলেন। বাবার শিরডী আসার অনেক আগে থেকেই দেবীদাস নামক এক সন্ত বহু বছর ধরে ওখানে থাকতেন। উনি বাবার খুব প্রিয় ছিলেন। বাবা ওঁর সাথে কখনো হনুমান মন্দিরে তো কখনো 'চাওড়ীতে' থাকতেন। কিছুদিন পর জানকীদাস নামক এক সন্ত শিরডীতে আসেন এবং তখন থেকে বাবা জানকীদাসের সাথে কথাবার্তায় অনেকটা সময় কাটাতে শুরু করেন। জানকীদাস কখনো-কখনো বাবার কাছে এসে বসতেন। তেমনি পুন্তাম্বার শ্রী গঙ্গাগীর নামক এক বৈশ্য গৃহী সন্তও প্রায়ই বাবার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। প্রথমবার যখন বাবাকে (বাগানে জল দেওয়ার জন্য) জল বইতে দেখে তাঁর খুব

আশ্চর্য্য লাগে। তিনি স্পষ্টই বলেন যে- **"শিরডী পরমভাগ্যবতী, তার কোলে এক অমূল্য হীরে আছে।** তোমরা যাকে এইরূপ পরিশ্রম করতে দেখছ, তিনি কোন সাধারণ বা সামান্য পুরুষ নন। এই ভূমির পরম সৌভাগ্যে যে তার পুণ্যবলে এইখানে এই রত্ন আবির্ভূত হয়েছে।" ঠিক এইরূপ শ্রী আক্কালকোট মহারাজের এক প্রসিদ্ধ শিষ্য সন্তশ্রী আনন্দ নাথ (এওলামঠ), যিনি কিছু শিরডীবাসীদের সাথে শিরডী আসেন, বাবার বিষয়ে এই কথা বলেছিলেন, **"যদিও বাইরে থেকে এঁকে সাধারণ মানুষের মতনই মনে হয়, কিন্তু ইনি আসলে এক অসাধারণ ব্যক্তি।** এই কথা তোমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনুভব করবে।" এইরূপ বলে তিনি এওলা ফিরে যান। এটা সেই সময়কার কথা, যে সময় শিরডী খুবই সাধারণ গ্রাম ছিল এবং সাইবাবার বয়সও ছিল কম।

বাবার পোষাক পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন কর্মসূচী

তরুণ অবস্থায় শ্রী বাবা নিজের চুল কখনো কাটতেন না এবং তিনি সব সময়ই পালোয়ানদের মত পোষাক পরে থাকতেন। রাহাতা (শিরডী থেকে তিন মাইল দূর) গেলে সেখান থেকে তিনি গেঁদা, জুঁই ইত্যাদির গাছ কিনে আনতেন। সেগুলিকে পরিষ্কার করে মাটিতে পুঁতে তাতে নিজে জল দিতেন। বামন তাত্য়া নামক এক ভক্ত তাঁকে রোজ মাটির দুটো ঘড়া দিত। বাবা এই ঘড়ায় করে গাছে জল দিতেন। তিনি নিজে কূয়ো থেকে জল আনতেন এবং সন্ধ্যার সময় ঘড়া দুটিকে নিম গাছের নীচে রেখে দিতেন। নীচে রাখতেই সেগুলি ভেঙ্গে যেত। আগুনে না তাপিয়ে (সেঁকে) সেগুলি কাঁচা মাটি দিয়ে গড়া হত। পরের দিনে তাত্য়া আবার বাবাকে দুটো নতুন ঘড়া দিতো। এইরকম ব্যবস্থা তিন বছর পর্যন্ত চলল। শ্রী সাইবাবার কঠিন পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলস্বরূপ একটি সুন্দর বাগান তৈরী হয়েছিল। আজকাল এই স্থানটিতেই বাবার সমাধি মন্দিরের সুন্দর ভবন শোভায়মান, যেখানে সহস্র ভক্ত আসা-যাওয়া করে।

নিম বৃক্ষের নীচে পাদুকার কাহিনী

শ্রী আক্কালকোট্ মহারাজের এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণজী অলীবাগকর তাঁর ছবির নিয়মিত পূজো করতেন। উনি একবার আক্কালকোট্ (সোলাপুর জিলা) গিয়ে মহারাজের পাদুকার দর্শন এবং পুজো করবেন স্থির করেন। কিন্তু আক্কালকোট্ মহারাজ স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ওঁকে বলেন- "আজকাল শিরডীই আমার বিশ্রাম স্থল এবং তুমি ওখানে গিয়েই আমার পুজো করো।" সেই জন্য তিনি গন্তব্য স্থান বদলে শিরডী এসে শ্রী সাইবাবার পূজো

করেন। তিনি সানন্দে শিরডীতে ছমাস থাকেন এবং এই স্বপ্নের স্মৃতিস্বরূপ পাদুকা নির্মিত করান। ১৯১২ সালে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন নিম বৃক্ষের নীচে পাদুকা স্থাপিত করেন। দাদা কেলকর এবং উপাসনী মহারাজ স্থাপনা উৎসব যথাবিধি রূপে সম্পন্ন করেন। একটি দীক্ষিত ব্রাহ্মণ পুজোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থার ভার এক ভক্ত শ্রী সগুন মেরু নায়ককে দেওয়া হয়।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ

ঠানার অবসরপ্রাপ্ত মামলাতদার শ্রী বি. ভি. দেব (শ্রী সাইবাবার এক পরমভক্ত) সগুন মেরু নায়ক ও গোবিন্দ কমলাকর দীক্ষিতকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পাদুকার সম্পূর্ণ বিবরণ শ্রী সাই লীলা ভাগ ১১ সংখ্যা ১, পৃষ্ঠ ২৫ প্রকাশিত হয়েছিল। নীচে সেই বিবরণই দেওয়া হচ্ছে ঃ-

১৯১২ সালে বম্বের এক ভক্ত (ডাক্তার) রামরাও কোঠারে বাবার দর্শনের জন্য শিরড়ী এসেছিলেন। ওঁর কম্পাউন্ডার ও এক বন্ধু শ্রী কৃষ্ণরাও অলীবাগকরও ওঁর সঙ্গে শিরড়ী আসেন। কম্পাউন্ডার ও ভাইয়ের শ্রী সগুণ মেরু নায়ক এবং জী. কে. দীক্ষিতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতে-করতে এঁদের মনে হয় যে, শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন এবং নিমবৃক্ষের নীচে বাসের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্বরূপ, কেন না পাদুকা স্থাপিত করা হোক? এবার পাদুকা নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তখন ভাইয়ের বন্ধু কম্পাউন্ডার বললেন- "যদি এই কথাটি আমার মনিব শ্রী কোঠারে জানতে পারেন, তাহলে এই কাজের জন্য অতি সুন্দর পাদুকা বানিয়ে দেবেন।" এই প্রস্তাবটি সবার মনে ধরে এবং ডা. কোঠারেকে এ বিষয়ে খবর দেওয়া হলো। উনি শিরডী এসে পাদুকার একটি নক্শা আঁকেন এবং এ বিষয়ে উপাসনী মহারাজের সাথে খান্ডোবা মন্দিরে দেখা করেন। উপাসনী মহারাজ তাতে কিছু পরিবর্তণ করে এবং পদ্মফুলাদি এঁকে তার নীচে নিম বৃক্ষের মাহাত্ম্য ও বাবার যোগশক্তি সম্বন্ধে একটি শ্লোকও লিখে দেন। শ্লোকটি এইরূপঃ-

সদা নিম্ব-বৃক্ষস্য মূলাধিবাসাত্
সুধাস্রাভিনং তিক্তমপ্যপ্রিয়তম্
তরুম্ কল্প-বৃক্ষাদিকং সাধয়ান্তম্
নমামীশ্বরং সদ্‌গুরুং সাইনাথাম্

অর্থাৎ - আমি ভগবান সাইনাথকে প্রণাম করছি, যাঁর সান্নিধ্যে নিম বৃক্ষ কটু

এবং অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অমৃত বর্ষণ করছে। এই বৃক্ষের রসকে অমৃত বলা হয়। অনেক ব্যাধি হতে মুক্তি দেওয়ার গুণ এতে থাকার দরুণ একে কল্পবৃক্ষ'র চেয়েও শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

উপাসনী মহারাজের বিচার সর্বমান্য এবং কার্যান্বিত হলো। পাদুকার জোড়া বম্বেতে তৈরী করানোর পর কম্পাউন্ডারের হাতে শিরডী পাঠানো হয়েছিল। বাবার আজ্ঞা অনুসারে পাদুকার স্থাপনা শ্রাবণ পূর্ণিমার শুভদিনে করা হলো। ঐ দিন বেলা ১১ টা নাগাদ শ্রী জি. কে. দীক্ষিত বাবার পাদুকা মাথায় ধারণ করে খান্ডোবা মন্দির থেকে দ্বারকামাইতে খুব ধূমধাম করে নিয়ে আসেন। বাবা পাদুকা দুটি স্পর্শ করে বললেন- "এইটি ভগবানের শ্রীচরণ। নিম বৃক্ষের নীচে স্থাপনা করে দাও।" এর একদিন আগেই বম্বের এক পারসী ভক্ত শ্রী পাস্তা সেঠ মানী অর্ডারের মাধ্যমে ২৫ টাকা পাঠান। বাবা সেই টাকাটি পাদুকা স্থাপনার নিমিত্তে দেন। এই সমারোহে (স্থাপনার কার্য্যে) ঠিক একশো টাকা ব্যয় হয়, যার মধ্যে পঁচাত্তর টাকা চাঁদারদ্বারা একত্রিত করা হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর ডাঃ কোঠারে প্রদীপের জন্য প্রত্যেক মাসে দুটাকা করে পাঠাতেন। পাদুকার চারিপাশে লাগাবার জন্য লোহার ছড়ীও পাঠান। আজকাল জড়বাড়ী (নানা পূজারী) পূজো করেন এবং সগুণ মেরু নায়ক নৈবেদ্য অর্পণ করেন ও সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালান। ভাই কৃষ্ণজী আগে আক্কালকোট মহারাজের শিষ্য ছিলেন। আক্কালকোট যাওয়ার পথে উনি পাদুকা স্থাপনার শুভ উপলক্ষে শিরড়ী আসেন এবং দর্শন করার পর যখন উনি প্রস্থান করার জন্য বাবার কাছে অনুমতি নিতে যান, তখন বাবা বলেন- "আরে, আক্কালকোটে কি আছে? তুমি ওখানে মিছিমিছি কেন যাচ্ছো? ওখানকার মহারাজ (আমি স্বয়ং) তো এখানেই আছেন।" এই কথা শুনে ভাই আক্কালকোট যাওয়ার বিচার ছেড়ে দেন। পাদুকা স্থাপনার পরও উনি প্রায়ই শিরডী আসতেন। শ্রী বি. ভি. দেব শেষে লিখেছেন যে, এই সব ঘটনাগুলি শ্রী হেমাডপন্ত জানতেন না। নতুবা শ্রী সাই চরিত্রে লিখতে ভুলতেন না।

মোহিদ্দীন তম্বোলীর সাথে কুস্তি ও জীবন পরিবর্তন

শিরডীতে মোহিদ্দীন তম্বোলী নামক এক পালোয়ান ছিল। কোন এক বিষয় নিয়ে ওর বাবার সাথে মতভেদ হয়। ফলতঃ দুজনের মধ্যে কুস্তি হয় এবং বাবা হেরে যান। এর পর বাবা নিজের পোষাক ও থাকার ধরণ-ধারণ বদলে ফেলেন। তিনি কফ্নী ও লেংগোট পড়তেন এবং একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথাটা ঢেকে রাখতেন। বসবার ও শোওয়ার জন্য একটা টাটের টুকরো ব্যবহার করতেন। এইরূপ ছেঁড়া-মেড়া

কাপড় পরেও তিনি খুবই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি সর্বদাই বলতেন- "দারিদ্রতাই আসল রাজকীয় সম্পদ, ধনীর চেয়ে দরিদ্র লাখ গুণে ভাল, ভগবান গরীবের ভাই।" গঙ্গাগীরেরও কুস্তী লড়ার খুব সখ ছিল। এক সময় কুস্তী লড়তে লড়তে হঠাৎ ওঁর মনে ত্যাগের ভাবনা জাগে। এই উপযুক্ত সময় উনি দেববাণী শোনেন, **"ভগবানের সাথে খেলায় নিজের দেহকে লাগিয়ে দেওয়া উচিত।"** তাই ওঁর সংসার ছেড়ে আত্ম-অনুভূতির পথে চলার তীব্র ইচ্ছে জাগে। পূণতাম্বার কাছে একটি মঠ বানিয়ে নিজের শিষ্যদের সাথে সেখানে থাকতে শুরু করেন। শ্রী সাইবাবা লোকেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না আর নাই বিশেষ কথাবার্তা করতেন। যদি কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করত, তখন তিনি শুধু তার উত্তরটা দিতেন। দিনের বেলা তিনি নিম বৃক্ষের নীচে বিরাজমান থাকতেন। কখনো-কখনো গ্রামের সীমাতে নালার কাছে গাছের ছায়ায় বসে থাকতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় যেদিকে খুশী সেদিকে বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন। নিমগ্রামের বালাসাহেব ডেঙ্গলের বাড়ী প্রায়ই চলে যেতেন। বাবা শ্রী বালাসাহেবকে খুব ভালোবাসতেন। ওঁর ছোট ভাই শ্রী নানালাহেবের দ্বিতীয় বার বিয়ে করা সত্ত্বেও কোন সন্তান হয়নি। বালাসাহেব নানাসাহেবকে শ্রী সাইবাবার দর্শনার্থে শিরডী পাঠান। কিছুদিন পর বাবার শ্রীকৃপায় নানাসাহেবের বাড়ীতে পুত্রের জন্ম হয়। এরপর থেকেই বাবার দর্শনের জন্য লোকেদের সংখ্যা দিনের-পর-দিন বাড়তে থাকে। তাঁর নাম ও কীর্তি দূর-দূর প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে যায়। আহ্মদ নগরেও তাঁর খুব নাম হয়ে পড়েছিল। নানাসাহেব চাঁদোরকর, কেশব চিদম্বর এবং অন্যান্য ভক্তদের তখন থেকেই শিরড়ীতে আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন বাবা ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন ও রাতে জীর্ণ-শীর্ণ মস্‌জিদে বিশ্রাম করতেন। এই সময় বাবার কাছে ছিলিম, তামাক, একটি বড় গেলাস, একটি লম্বা কফ্‌নী, মাথায় বাঁধবার কাপড় এবং একটি ছোট ডান্ডা ছিল যেটি তিনি সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। মাথায় একটা সাদা কাপড়ের টুকরো এমনভাবে বাঁধতেন যে কাপড়ের একটা দিক তাঁর বাঁ কাঁধ দিয়ে পিঠে পড়ে থাকত, যেন চুলের একটি খোঁপা। পায়ে কোন জুতো-চটী পরতেন না। শুধু একটা টাটের টুকরো অধিকাংশ দিন তাঁর আসন হিসেবে কাজ দিত। তিনি ধুনিতে কাঠের টুকরোর রূপে নিজের অহংকার, সমস্ত ইচ্ছা এবং কুবিচারগুলির আহুতি দিতেন। সর্বক্ষণ 'আল্লাহ মালিক' উচ্চারণ করতেন। তিনি যে মস্‌জিদে পদার্পণ করেন, তাতে কেবল দুটি ঘরের মত লম্বা জায়গা ছিল এবং এখানেই সব ভক্তরা তাঁকে দর্শন করত। ১৯১২র পর কিছু পরিবর্তণ ঘটে। পুরোন মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার করা হয় এবং তার মেঝেও বানানো হয়। মস্‌জিদে থাকতে শুরু করার আগে বাবা তাকিয়াতে (ফকিরদের বাসস্থান)

থাকতেন। তিনি পায়ে নুপূর বেঁধে প্রেমবিহ্বল হয়ে সুন্দর নৃত্য ও গানও করতেন।

জলের তেলে পরিণত হওয়া

বাবা আলো খুব ভালবাসতেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা তেল ভিক্ষে করে নিয়ে আসতেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে মস্‌জিদ সাজাতেন। এইরূপ কিছুদিন সব ঠিক চলল। এবার একদিন ময়রারা উত্যক্ত হয়ে উঠল এবং স্থির করল যে সেদিন কেউ বাবাকে তেল দেবে না। নিত্য নিয়মানুসারে যখন বাবা তেল চাইতে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে প্রত্যেক দোকান থেকেই খালি হাতে ফিরে আসতে হলো। কাউকে কিছু না বলে বাবা মস্‌জিদে ফিরে এলেন। শুকনো তুলোর সলতে প্রদীপ গুলিতে পরালেন। ময়রারা খুব উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল- বাবা এবার কি করবেন? বাবা বড় গেলাসটি যাতে অল্প একটু তেল ছিল, ওঠালেন। তাতে একটু জল মিশিয়ে সেটাকে পান করে নিলেন। সেটাকে আবার গেলাসে উগড়ে সেই তৈলাক্ত জল প্রদীপগুলিতে ঢেলে সেগুলি জ্বালিয়ে দিলেন। উৎসুক ময়রারা যখন প্রদীপগুলিকে আগের মতই রাতভোর জ্বলতে দেখে নিজেদের ব্যবহারের জন্য খুবই লজ্জিত বোধ করল। ওরা বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। বাবা তাদের ক্ষমা করে ভবিষ্যতে সৎ আচরণ করার শিক্ষা দেন।

নকল গুরু জৌহর আলী

পূর্বে বর্ণিত কুস্তির ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর জৌহর আলী নামক এক ফকীর নিজের শিষ্যদের সাথে রাহাতা আসেন। উনি বীরভদ্র মন্দিরের কাছে একটা বাড়ীতে থাকতেন। ফকির বিদ্বান ছিল। কোরানের প্রত্যেকটি কল্‌মা কণ্ঠস্থ ছিল এবং স্বরও মধুর ছিল। গ্রামের অনেক ধার্মিক ও শ্রদ্ধালু জন ওঁর কাছে আসতে শুরু করে। লোকেদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে বীরভদ্র মন্দিরের কাছে একটা ইদগাহ নির্মাণ করাবার কথা স্থির করে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু ঝগড়ার সৃষ্টি হওয়ায় জৌহর আলী রাহাতা ছেড়ে শিরড়ী এসে বাবার সাথে মস্‌জিদেই বাস করতে শুরু করে। নিজের মিষ্টি মধুর কথায় উনি সহজেই শিরডী বাসীদের মন জিতে নেন এবং বাবাকে নিজের শিষ্য বলে প্রচার করেন। বাবা তাতে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন না এবং ওর শিষ্য হওয়া স্বীকার করেন। এরপর গুরু ও শিষ্য আবার রাহাতাতে এসে থাকতে শুরু করেন। গুরু শিষ্যের যোগ্যতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু শিষ্য গুরুর দোষের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তা সত্ত্বেও বাবা কখনো ওঁকে অশ্রদ্ধা করেননি এবং মন দিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করে ওঁর অনেক ভাবে সেবা করেন। তাঁরা

কখনো-কখনো শিরড়ী আসতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় রাহাতাতেই থাকতেন। বাবার ভক্ত-প্রেমীদের তাঁর দূরে রাহাতাতে থাকাটা একেবারেই ভালো লাগছিল না। তাই ওরা সবাই মিলে বাবাকে শিরডীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য রাহাতা গেল। 'ঈদগা'-র কাছেই এদের বাবার সাথে দেখা হয় এবং ওরা নিজেদের উদ্দেশ্য বাবাকে জানায়। তখন বাবা বলেন যে ফকির ভীষণ রাগী ও বদ্‌মেজাজী লোক; উনি বাবাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। ফকিরের আসার আগেই বাবা তাদের ফিরে যেতে বলেন। যখন এইরূপ কথাবার্তা চলছিল, সেই সময় ফকির সেখানে এসে পৌঁছয়। গ্রামবাসীদের জল্পনা-কল্পনার কথা জেনে উনি খুবই রেগে ওঠেন। কিছুক্ষণ বাদ-বিবাদের পরিস্থিতিতে কিছু পরিবর্তণ দেখা দেয়। শেষে এই নির্ণয় হয় যে, ফকির আর শিষ্য দুজনই শিরডীতে থাকবেন এবং এইভাবে ওঁরা শিরডীতেই থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন পর দেবীদাস গুরুর পরীক্ষা নেন এবং কিছু ত্রুটি পান। চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে বাবার শিরডী আসার প্রায় ১২ বছর আগে শিরডী আসেন- তখন ওঁর বয়স ছিল ১০-১১ বছর এবং উনি হনুমান মন্দিরে থাকতেন। দেবীদাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্যাগের সাক্ষাত প্রতিমূর্তি ও অগাধ জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন। অনেক লোকেরা, যেমন- তাত্য়া কোতে, কাশীনাথ ইত্যাদি তাঁকে গুরুর ন্যায় সম্মান করত। তাই জৌহর আলীকে তাঁর সামনে আনা হলো। তর্কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে জৌহর আলী শিরডী থেকে পালিয়ে যান। অনেক বছর পর উনি শিরডী আসেন এবং শ্রী সাইবাবার চরণ বন্দনা করে। তিনি গুরু ও শ্রী সাইবাবা তাঁর শিষ্য - ওঁর এই ধারনা দূর হয়ে গিয়েছিল। শ্রী সাইবাবা তাঁকে গুরুর মতনই মান দিতেন, এই কথা স্মরণ করে ওঁর খুব অনুতাপ হয়। এইভাবে শ্রী বাবা নিজের আচরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেন যে এইভাবে অহংকারশূণ্য হয়ে শিষ্যের কর্তব্য পালন করে, আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। উপরে উদ্ধৃত ঘটনাক্রম ভক্ত মহালসাপতির কাছ থেকে জানা যায়। এর পরের অধ্যায়ে রাম নবমীর উৎসব, পূর্বে মস্‌জিদের দশা, পরে তার জীর্ণতা সংস্কার ইত্যাদি বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৬

রাম নবমীর উৎসব, মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার, গুরুর করস্পর্শের মহিমা, চন্দন সমারোহ, উর্স এবং রামনবমীর সমন্বয়।

গুরুর করস্পর্শের গুণ

যখন সদ্‌গুরুই নৌকার নাবিক, তখন তিনি নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে ও সহজেই এই ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন। 'সদ্‌গুরু' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই শ্রী সাইবাবার কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন তিনি স্বয়ং আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমার মাথায় উদী লাগিয়ে দিচ্ছেন। আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বয়ে যাচ্ছে। সদ্‌গুরুর করস্পর্শের শক্তি মহান ও আশ্চর্য্যজনক। যে সূক্ষ্ম শরীর, সমগ্র সংসারকে ভস্ম করে দিতে পারে এমন অগ্নি দ্বারাও নষ্ট হয় না, সেটাই গুরুর হাতের স্পর্শে এক নিমেষে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী সাইবাবার মনোরম রূপের দর্শন করে গলা রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যখন হৃদয় ভাবান্বিত হয়ে যায়, তখন 'আমিই সে' (সোহহম্) ভাব জাগৃত হয়ে আত্মানুভূতির আনন্দের আভাস হয়। 'আমি' আর 'তুমি'-র পার্থক্য (দ্বৈত ভাব) নষ্ট হয়ে যায় এবং ততক্ষণাৎ ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা অনুভব হয়। যখন আমি কোন ধার্মিক গ্রন্থ পাঠ করি, তখন প্রতিপদে সদ্‌গুরুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। বাবা শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর জীবন-গাথা শুনিয়ে যান। যখন আমি ভাগবৎ পাঠ শ্রবণ করি, তখন বাবা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ধারণ করেন এবং এইরূপ মনে হয় যেন তিনিই ভক্তদের কল্যাণ হেতু উদ্ধবগীতা শোনাচ্ছেন। কারো সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমি বাবার কথাগুলি স্মরণ করি, যাঁতে উপযুক্ত অর্থ বোঝাতে সফল হতে পারি। নিজে থেকে যখন কিছু লিখতে যাই ঠিক সেই সময় একটা শব্দ বা বাক্যও রচনা করে উঠতে পারি না। কিন্তু যখন বাবা স্বয়ং কৃপা করে আমাকে দিয়ে লেখাতে শুরু করেন, তখন তার আর কোন শেষ থাকে না। যখন ভক্তদের মধ্যে অহংকার বাড়তে শুরু করে, তখন বাবা নিজের হাতে তা দমন করেন এবং নিজের শক্তি প্রদান করে তাকে অহংকারশূণ্য করে চরম লক্ষের প্রাপ্তি করিয়ে দেন। সে পরম সন্তুষ্ট হয়ে অক্ষয় সুখের অধিকারী হয়ে যায়। যে বাবাকে নমন করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর শরণে যায়, তার আর

অন্য কোন সাধনার আবশ্যকতা থাকে না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সে সহজেই পেয়ে যায়। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার চারটি মার্গের (কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি) মধ্যে ভক্তি মার্গ সবচেয়ে বেশী কন্টকাকীর্ণ এবং খানা-খন্দ দিয়ে ভরা। কিন্তু যদি সদ্‌গুরুর উপর বিশ্বাস থাকে এবং পথের গহ্বর থেকে সাবধান হয়ে তাঁর পদানুক্রমণ করে সোজা এগিয়ে যাও, তাহলে সেই চরম লক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট সহজেই পৌঁছে যাবে। শ্রী সাইবাবা বলেছেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম এবং তাঁর বিশ্ব উৎপত্তি, রক্ষণ ও লয় করার বিভিন্ন শক্তিগুলির পৃথকত্বর মধ্যেও একাত্মতা আছে। এই কথাটি বিভিন্ন গ্রন্থকারেরাও লিখেছেন। ভক্তদের কল্যাণের জন্য শ্রী সাইবাবা স্বয়ং যে শব্দগুলির দ্বারা আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেটাই এখানে লেখা হচ্ছে। **"আমার ভক্তদের বাড়ীতে অন্ন-বস্ত্রের কখনো অভাব হবে না। আমার এই বৈশিষ্ট্য যে, যে ভক্ত আমার শরণে আসে এবং কায়মনোবাক্যে আমারই উপাসনা করে, তাঁর কল্যাণের জন্য আমি সর্বদা চিন্তিত থাকি** । কৃষ্ণ ভগবান গীতাতে এই কথাই বুঝিয়েছেন- সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ - (গীতা ১৮/৬৬)। তাই খাওয়া-পরার কথা বেশী চিন্তা কোরো না। যদি কিছু চাইবার অভিলাষ থাকে তাহলে ঈশ্বরকেই চেয়ে নাও। জাগতিক সম্মান বা উপাধি ছেড়ে ঈশ্বরের কৃপা ও অভয়দান প্রাপ্ত করো এবং তাঁরদ্বারাই সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করো। সাংসারিক সাধনায় কুপথগামী হয়ো না। নিজের ইষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। কোন পদার্থদ্বারা আকর্ষিত হয়ো না, সর্বদা আমার ধ্যানেই মন নিযুক্ত রাখো যাতে সে দেহ, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রবৃত্ত না হয়। এইভাবে চিত্ত স্থির, শান্ত ও নির্ভয় হয়ে যাবে। এই ধরনের মনঃস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, মন সুসঙ্গতিতে। আছে। যদি মনের চঞ্চলতাই দূর না হয়, তাহলে তাকে একাগ্র করা যায় না।"

এরপর গ্রন্থকার শিরডীতে রামনবমী উৎসব বর্ণনা করেছেন। শিরডীতে রামনবমী খুব ঘটা করে পালন করা হয় এবং এটি সেখানকার প্রধান উৎসব। অতএব এই উৎসবের সম্পূর্ণ বিবরণ, যেমনটি সাইলীলা পত্রিকার (১৯২৫) ১৯৭ পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে ঃ-

প্রারম্ভ

কোপরগ্রামে শ্রী গোপালরাও গুন্ড নামক এক ইনস্‌পেক্টর থাকতেন এবং উনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রী সাইবাবার কৃপায় উনি একটি পুত্র রত্ন প্রাপ্ত করেন (ওঁর তিনটি স্ত্রী ছিল, কিন্তু তখনো অবধি কোন সন্তান হয়নি)। সেই আনন্দে ১৮৯৭

সালে ওঁর মনে হয় যে শিরডীতে মেলা অথবা উর্স ভরানো উচিত (উর্স শিরডীবাসীদের নিজেদের গ্রামদেবীর চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করার অনুষ্ঠান)। উনি এই কথাটি অন্যান্য ভক্তদের, যেমন- তাত্য়া পাটীল ও মাধবরাওকেও বলেন। ওঁদের সবারই এই পরিকল্পনাটি অতি মর্মস্পর্শী মনে হয় এবং ওরা খুব শীঘ্র বাবার অনুমতি ও আশ্বাসও পেয়ে যান। এইবার কালেক্টরের কাছে একটি প্রার্থনা পত্র পাঠানো হয়। কিন্তু তার আপত্তি করায় স্বীকৃতি পাওয়া গেল না। কিন্তু বাবা তো আগেই আশ্বাস দিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব আবার চেষ্টা করাতে স্বীকৃতি পাওয়া গেল। বাবার আদেশ অনুসারে রামনবমীর দিন মেলা হওয়া (বা উর্স ভরা) স্থির হয়। পরবর্তীকালের ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যে, বাবা যেন কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে এমন আদেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ উর্স এবং রামনবমী উৎসবের একাকীকরণ এবং হিন্দু-মুসলিম একতা। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি পূর্ণ রূপে সফল হয়।

প্রথম বাধা তো কোন রকমে কাটল। এবার দ্বিতীয় সমস্যার (জলের অভাব) সম্মুখীন হতে হল। সে সময় শিরডী একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল এবং বরাবরই সেখানে জলের সমস্যা থাকত। গ্রামে শুধু দুটোই কূয়ো ছিল। তার মধ্যে একটা তো প্রায় শুকিয়েই গিয়েছিল ও অন্যটার জল ছিল নোন্‌তা। বাবা তাতে ফুল ঢেলে তার জল মিষ্টি করে দিলেন। কিন্তু একটা কূয়োর জল কতজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে? তাই তাত্য়া পাটীল বাইরে থেকে জল আনবার ব্যবস্থা করলেন। বাঁশের ও কাঠের দোকান বানানো হল। কুস্তিরও আয়োজন করা হলো। গোপালরাও গুন্ডের এক বন্ধু দামু অন্না কাসার আহমদনগরে থাকতেন। তিনিও সন্তানহীন হওয়ার দরুণ মনোকষ্টে ভুগছিলেন। শ্রী সাইবাবার কৃপায় উনিও সন্তান সুখ প্রাপ্ত করেন। শ্রী গুন্ড ওঁকে এই উপলক্ষে একটা ধ্বজা দিতে বলেন। একটা ধ্বজা জমিদার শ্রী নানাসাহেব নিমোন্‌কর দেন। এই দুটি ধ্বজা খুব ধূমধাম করে গ্রামের বাইরে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হলো এবং শেষে মস্‌জিদের (যাকে বাবা দ্বারকামাই বলে ডাকতেন) কোণে লাগিয়ে দেওয়া হলো। এই সমারোহটি এখনো আগের মতই চলছে।

চন্দন সমারোহ

এই মেলাতে আরেকটি সমারোহও শুরু হয়, যেটি চন্দনোৎসব নামে প্রসিদ্ধ। এর পরিকল্পনা কোরহলের এক মুসলমান ভক্ত শ্রী অমীর শক্কর দালাল করেন। এই ধরনের উৎসব সাধারনতঃ সিদ্ধ মুসলমান সন্তদের সম্মানে করা হয়। অনেকটা চন্দন ঘষে, অনেকগুলি চন্দন ধূপ থালাতে জ্বালিয়ে মিছিল বার করা হত। সব শেষে মস্‌জিদে

এইগুলি পৌঁছিয়ে সমারোহ শেষ হয়ে যেত। থালার চন্দন এবং ধূপ নিমের উপর এবং মস্‌জিদের দেওয়ালের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হত। এই উৎসবের ব্যবস্থা প্রথম তিন বছর আমীর শক্কর করেন। তারপর তাঁর স্ত্রী এর ভার নেন। এইভাবে হিন্দুদের দ্বারা ধ্বজার ও মুসলমানদের দ্বারা চন্দনের শোভাযাত্রা এক সাথে বেরোত এবং আজ অবধি সেইভাবেই বেরোয়।

প্রবন্ধ

রামনবমীর দিনটি শ্রী সাইবাবার ভক্তদের জন্য অতিশয় প্রিয় ও পবিত্র। মেলায় সহযোগিতা ও কাজ করার জন্য অনেক লোকেরা প্রস্তুত থাকত। বাইরের সমস্ত কাজ শ্রী তাত্য়া পাটীল ও বাকী কাজগুলি শ্রী সাইবাবার এক পরম ভক্ত রাধাকৃষ্ণমাই সামলাতেন। এই সময় ওঁর বাড়ী অতিথিতে. ভরে যেত এবং উনি সবার আরামের প্রতি নজর রাখতেন। মেলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুগুলি আয়োজন করে রাখতেন। ওঁর আরেকটা কাজ ছিল, যেটা তিনি সানন্দে করতেন- সেটা হলো মস্‌জিদটিকে পরিস্কার করা ও চূণ লেপা। মস্‌জিদের মেঝে ও দেওয়াল ধুনির ধোঁয়াতে কালো হয়ে যেত। যে সময় বাবা চাওড়ীতে বিশ্রাম করতে যেতেন, সেই সময় রাধাকৃষ্ণমাই মস্‌জিদ পরিস্কার করে নিতেন। সমস্ত জিনিষগুলি ধুনি সমেত বাইরে বার করতে হতো। পরিস্কার ও চুনকামের কাজ হয়ে যাওয়ার পর আবার সেগুলি সাজিয়ে দিতেন।

এই উৎসবের একটা প্রধান অংশ ছিল গরীবদের খাবার খাওয়ান- বাবার খুবই প্রিয় অনুষ্ঠান। এর জন্য বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হতো এবং নানা রকমের মিষ্টান্ন তৈরী করা হতো। এই সব ব্যবস্থাগুলি রাধাকৃষ্ণমাইয়ের বাড়ীতে ওঁর তত্ত্বাবধানেই করা হতো। অনেক ধনী ভক্তরা এই কাজের নিমিত্তে আর্থিক সাহায্য প্রদান করত।

উর্স ও রামনবমীর উৎসবের সমন্বয়

সব ব্যবস্থা ও কাজ এইভাবে উত্তমরূপে চলছিল ও মেলার প্রসিদ্ধি ধীরে-ধীরে বাড়ছিল। ১৯১১ সালে একটা পরিবর্তণ ঘটে। এক ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণরাও জোগেশ্বর ভীষ্ম (শ্রী সাইসগুনোপসনার লেখক) শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডের সঙ্গে মেলার একদিন আগে দীক্ষিত ওয়াড়ায় এসে উঠলেন। এক সময় বারান্দায় শুয়ে-শুয়ে ওঁর একটা কথা মনে হয়। ঠিক সেই সময় কাকা মহাজনী পূজোর সামগ্রী নিয়ে মস্‌জিদের দিকে যাচ্ছিলেন। ওঁদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয় এবং এটাই বোঝা যায় যে মেলা ঠিক রামনবমীর দিনই হওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুক্কায়িত আছে। রামনবমীর দিনটি হিন্দুদের

জন্য খুবই প্রিয়। এই দিন যদি রামনবমী উৎসবও (অর্থাৎ শ্রী রামের জন্মের) শুরু করে দেওয়া হয় তো কেমন হয়? কাকা মহাজনীর এই পরিকল্পনাটি খুব ভাল লাগে। এখন শুধু বাকী রইল একটি হরিদাস খোঁজা- যে এই উপলক্ষে হরিকীর্তন ও ঈশ্বর গুণানুবাদ করতে পারে। এই বাধাটাও কেটে গেল যখন ভীষ্ম বললেন- "আমার স্বরচিত রাম আখ্যান' যাতে রামজন্মের বর্ণনা আছে, লেখা হয়ে গেছে। আমি তারই কীর্তন করব এবং তুমি হারমোনিয়াম বাজাবে। রাধাকৃষ্ণমাঈ 'সুন্থা বড়া'র (আদা ও চিনির মিশ্রণ) প্রসাদ তৈরী করে দেবেন।" এইরূপ আলোচনার পর ঐ দুজনে বাবার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য মস্‌জিদে গেলেন। বাবা তো অন্তর্যামী। তিনি তো সবই জানতেন যে কি কাথাবার্তা হচ্ছিল। তিনি মহাজনীকে জিজ্ঞাসা করলেন- "দীক্ষিত ওয়াড়াতে কি সব চলছিল?" এই আকস্মিক প্রশ্ন শুনে মহাজনী একটু ঘাবড়ে যান। বাবার কথার অভিপ্রায় না বুঝতে পারার দরুণ উনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন বাবা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন- "কি ব্যাপার?' ভীষ্ম তখন রামনবমী উৎসবের প্রস্তাবটা বাবার সামনে রাখেন ও বাবার অনুমতির জন্য প্রার্থনা করেন। বাবাও সহর্ষে অনুমতি দিয়ে দেন। সব ভক্তরাই খুব খুশী হয় এবং রামজন্মোৎসবের তোড়-জোড় শুরু হয়ে গেল। পরের দিনই নানা রঙের পতাকা দিয়ে মস্‌জিদ সাজিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীমতী রাধাকৃষ্ণমাঈ একটা দোলনা আনিয়ে বাবার সামনে রাখিয়ে দিলেন। এর পর উৎসব শুরু হলো। ভীষ্ম কীর্তন গাইতে শুরু করেন ও মহাজনী তার সাথে হারমোনিয়াম বাজান। ঠিক এই সময় বাবা মহাজনীকে ডেকে পাঠান। মহাজনী একটু শঙ্কিতবোধ করেন যে, বাবা বোধ হয় উৎসবের অনুমতি দেবেন না। কিন্তু উনি যখন বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "এসব কি? এই দোলনাটা এখানে কেন রাখা হয়েছে?" মহাজনী তাঁকে জানান যে রামনবমীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে এবং তাই দোলনাটা সেখানে রাখা হয়েছে। বাবা দুটো মালা নিয়ে একটা কাকাজীর গলায় পরিয়ে দেন এবং অন্যটা ভীষ্মর জন্য পাঠিয়ে দেন। এবার আবার কীর্তন শুরু হল। কীর্তন শেষ হলে শ্রী রাজারামের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কীর্তনের জায়গায় আবীর ওড়ানো হলো। সবাই আনন্দে মত্ত ছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল। যে সময় আবীর ছোঁড়া হচ্ছিল, একটু আবীর বাবার চোখে অনায়াসেই চলে যায়। বাবা তাতে একদম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং জোরে-জোরে অপশব্দ বলতে শুরু করেন। এই দৃশ্য দেখে সবাই ভয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যারা বাবার স্বভাবের সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিল তারা এই অপশব্দ শুনে ভয়ভীত হবে কেমন করে? বাবার এই ক্রোধ ও অপশব্দ তারা আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করলো। তাদের মনে

হলো- "আজ রামের জন্মদিন অর্থাৎ রাবনের বিনাশ, অহংকার ও দুষ্ট প্রবৃত্তি রূপী রাক্ষসদের সংহার করার জন্য বাবার ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক।" এছাড়া তারা এও জানত যে যখনই শিরডীতে কোন নতুন কাজ শুরু করা হতো তখন বাবা এইরকমই রেগে যেতেন। তাই তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে রাধাকৃষ্ণমাঈ ভয় পাচ্ছিলেন যে, বাবা রাগের চোটে দোলনাটাই না ভেঙ্গে ফেলেন। তাই তিনি মহাজনীকে দোলনাটা সরিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু বাবা কাকাজীকে তা করতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পর বাবা শান্ত হন। সেইদিনের মহাপূজো ও আরতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। এরপর কাকা মহাজনী দোলনাটি সরিয়ে নেবার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান। কিন্তু বাবা বললেন- "উৎসব এখনও শেষ হয়নি।" পরের দিন গোপালকালা উৎসবের পর বাবা দোলনাটি নামাবার অনুমতি দেন। একটা মাটির পাত্রে দৈ-চিড়ে রেখে সেটা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো। কীর্তন শেষ হওয়ার পর পাত্রটি ভেঙ্গে দৈ-চিড়ে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হল, যেমনটি শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে করেছিলেন। রামনবমীর উৎসব এইভাবে সারা দিন ধরে চলল। দিনের বেলা দুটো ধ্বজার শোভাযাত্রা ও রাত্রিতে চন্দনের মিছিল খুব ঘটা করে বেরোল। এরপর 'উর্স' রামনবমীর উৎসবে রূপান্তরিত হল। পরের বছর (১৯১২) থেকে উৎসবের ঘটা ও কার্য্যক্রমগুলো বাড়তে লাগল। শ্রীমতি রাধাকৃষ্ণমাঈ চৈত্র প্রতিপদ থেকে 'নাম সপ্তাহ' আরম্ভ করে দিলেন (দিন রাত অনবরত সাত দিন অবধি ভগবদ্ নাম নেওয়াকে নাম সপ্তাহ বলে)। সব ভক্তরা পালা করে এতে অংশ গ্রহণ করতেন। দেশের সব জায়গাতেই রামনবমীর উৎসব পালন করা হয়। তাই পরের বছর আবার হরিদাসের ব্যবস্থা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু উৎসবের দিনের আগেই তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেল। পাঁচ-ছদিন আগে হঠাৎ শ্রী মহাজনীর বালা বুয়ার সাথে দেখা হয়। বুয়া সাহেব 'আধুনিক তুকারাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হরিকীর্তন করার দায়িত্ব তাঁর উপরেই দেওয়া হয়। তার পরের বছরও ওঁর গ্রামে প্লেগ ছড়ানোর দরুণ তিনি নিজের গ্রামে হরিদাসের কাজ করতে না পারায় শিরডীতে চলে আসেন। কাকাসাহেব দীক্ষিত ওঁকে কীর্তনের ভার দেওয়ার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান। বাবা অনুমতির সাথে-সাথে বুয়াকে যথেষ্ট পুরস্কারও দেন। ১৯১৪ সালে বাবা হরিদাসের সমস্যাটি পুরোপুরি মিটিয়ে দেন। তিনি এই কাজটির ভার দাসগণু মহারাজকে দেন। সেই থেকে দাসগণু মহারাজ এই কাজটি পূর্ণ উৎসাহের সাথে পালন করেন। ১৯১২ থেকে উৎসবে ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রসিদ্ধ পালোয়ানদের কুস্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। গরীবদের জন্য খুব বড় ভাবে খাওয়ার আয়োজন করা হতো। রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের ঘোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ শিরডী সংস্থানের রূপ অর্জন

করল। সংস্থানের সম্পত্তিও দিন-প্রতিদিন বাড়তে লাগল। একটা সুন্দর ঘোড়া, পাল্কী, রথ এবং রূপোর অন্যান্য জিনিষ ও বাসন-পত্র ইত্যাদি ভক্তরা উপহার রূপে অর্পণ করতেন। এই অবসরে হাতিও ডাকা হতো। যদিও সম্পত্তিতে দিনের-পর-দিন বৃদ্ধি হচ্ছিল, বাবা সে সব থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকতেন। তিনি এই সব জিনিষ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সব সময় সাধারণ বেশভূষা ধারণ করে থাকতেন। মিছিল এবং উৎসবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কাজ করত, কিন্তু আজ অবধি তাদের মধ্যে কোন বিবাদ বা মতভেদ ঘটেনি - এই কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম-প্রথম লোকেদের সংখ্যা পাঁচ-সাত হাজারই হত। কিন্তু পরের দিকে এই সংখ্যা পঁচাত্তর-আশী হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আজকাল ত এইদিন লক্ষাধিক ভক্তরা শিরডীতে সম্মিলিত হয়। তবুও আজ অবধি না তো কোন রোগ আর নাই কোন ঝগড়া দেখা দিয়েছে।

মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার

'উর্স' ভরার (মেলা শুরু করার) বিচারটি যেমন সর্বপ্রথম শ্রী গোপালরাও গুন্ডের মাথায় জাগে ঠিক তেমনিই মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কারের পরিকল্পনাও তাঁর মাথাতেই আগে আসে। এই কাজের নিমিত্তে তিনি পাথর একত্রিত করান ও তা বর্গাকার করান। কিন্তু এই কাজের খ্যাতি তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল না। সেটি নানাসাহেব চাঁদোরকরের ভাগে পড়ে ও মেঝে বানানোর নাম কাকাসাহেব দীক্ষিত পান। প্রথমে বাবা এই কাজের জন্য অনুমতি দেননি। কিন্তু স্থানীয় ভক্ত মহালসাপতির প্রয়াসে স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং এক রাত্তিরেই মেঝে তৈরী হয়ে যায়। তখন অবধি বাবা একটা টাটের টুকরোর উপরে বসতেন। এবার এই টাটের টুকরোটি সরিয়ে সেখানে একটা ছোট গদী রাখা হলো। মস্‌জিদের উঠোনটা খুব ছোট্ট ও অসুবিধেজনক ছিল। কাকাসাহেব দীক্ষিত সেটা বাড়িয়ে তার উপর ছাত নির্মাণ করতে চাইলেন। যথেষ্ট দ্রব্য, বাঁশ ইত্যাদি কিনে আনা হল। কাজও শুরু হয়ে গেল। দিনরাত পরিশ্রম করে ভক্তরা লোহার শিকগুলি মাটিতে গাঁথল। পরের দিন চাওড়ী থেকে ফেরার পর বাবা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিলেন ও ভীষণ রেগে গেলেন। তাত্য়ার মাথার কাপড়টা খুলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। রাগে বাবার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠল। কারো তাঁর দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছিল না। সবাই ভাবছিল এইবার কি যে হবে? ভাগোজী শিন্দে (বাবার এক পরম ভক্ত যিনি কুষ্ঠ রোগে ভুগছিলেন) একটু সাহস করে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু বাবা তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে পিছনে করে দিলেন। মাধবরাও-এরও ঐ একই দশা হলো। বাবা ওঁর উপরে

ঢিল-পাট্‌কেল ছুঁড়তে শুরু করেন। যেই ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে যায়, তারই ঐ দশাই হয়। কিছুক্ষণ পর যখন বাবার রাগ শান্ত হয়, তখন বাবা একটি দোকানদারকে ডেকে একটা জরির কাপড় কিনে নিজের হাতে তাত্‌য়ার মাথায় বেঁধে দেন, যেন তাকে কোন বিশেষ সম্মান দ্বারা অলংকৃত করা হলো। এই বিচিত্র ব্যবহারটি দেখে সেখানে উপস্থিত সবারই খুব আশ্চর্য লাগে। ওরা বুঝে উঠতে পারছিল না যে বাবা কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ রেগে উঠলেন। তিনি তাত্‌য়াকে কেনই বা মারলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রাগ কিভাবে আপনা আপনি শান্ত হয়ে গেল? বাবা প্রায়ই গম্ভীর ও চুপচাপ থাকতেন এবং খুবই প্রেমপূর্বক কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু কখনো-কখনো অনায়াসেই ও বিনা কারণে রেগে উঠতেন। এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখেছি, কিন্তু আমি এটা স্থির করতে পারছিনা যে তাদের মধ্যে কোন্‌টা লিখি আর কোন্‌টা ছাড়ি। তাই ঘটনাগুলি যেমন-যেমন মনে পড়ছে সেই ক্রম অনুসারে বর্ণনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে বাবা হিন্দু ছিলেন না মুসলমান- এই বিষয়ের বিবরণ পাঠকগণ শ্রবণ করবেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্‌ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ প্রথম বিশ্রাম

অধ্যায় - ৭

অদ্ভুত অবতার, শ্রী সাইবাবার প্রকৃতি, তাঁর যোগক্রিয়া, কুষ্ঠ রোগীর সেবা, খাপার্ডের ছেলের প্লেগ, পন্ঢরপুর যাত্রা।

যদি এমনটা বলা হয় যে, শ্রী সাইবাবা হিন্দু ছিলেন তাহলে এও সত্য যে, তাঁকে দেখলে মুসলমান বলেই মনে হতো। কেউ নিশ্চিত করে আজ পর্যন্ত বলতে পারেনি যে, তিনি হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান। তিনি হিন্দুদের রামনবমীর উৎসব যথাবিধি পালন করতেন এবং তার সাথে-সাথে চন্দনোৎসবও। এই উৎসব উপলক্ষে পর্যাপ্ত পুরস্কারও দিতেন। গোকুল অষ্টমীতে তিনি গোপাল কালা সমারোহও বড় ঘটা করে পালন করতেন। 'ঈদ'- এর দিন তিনি মুসলমানদের মস্‌জিদে 'নমাজ' পড়বার জন্য আমন্ত্রিত করতেন। এক সময় 'মহরম উপলক্ষে কিছু মুসলমান 'তাবুদ' বানিয়ে কিছুদিন মস্‌জিদে রেখে তারপর সেটা নিয়ে মিছিলে বেরোবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। শ্রী সাইবাবা কেবল চারদিন তাবুদটি মস্‌জিদে রাখতে দেন এবং পঞ্চমদিন বিনা কোন হৈ-হল্লা করে সেটি ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বলেন।

যদি এমনটা বলা হয় যে তিনি মুসলমান ছিলেন, তাহলে এও দেখা গিয়েছে যে হিন্দুদের মতন তাঁর কানে ফুটো ছিল। যদি কেউ তাঁকে হিন্দু বলে ঘোষণা করে, তাহলে এও সত্য যে তিনি সদা মস্‌জিদে থাকতেন এবং যদি মুসলমান বলা হয়, তাহলে তিনি সর্বদা 'ধুনি' প্রজ্জ্বলিত রাখতেন। এমন অনেক কর্ম যেগুলি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে- যেমন যাঁতা পেষা, শাঁখ বাজানো, ঘন্টাদি, হোম, অন্নদান ও অর্ঘ্য দ্বারা পূজো করা ইত্যাদি, সবসময়ই সেখানে হতো। নানাসাহেবের (যিনি বাবার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন) মতে বাবার নিজের ছুন্নৎ ছিল না ("বাবা হিন্দু না যবন"; প্রবন্ধ-বি.ভি. দেব)।

এরপরও যদি কেউ বলে যে তিনি মুসলমান ছিলেন তো কূলীন ব্রাহ্মণ ও অগ্নিহোত্রীরাও নিজেদের নিয়ম উল্লংঘন করে সদা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন। যারা বাবার জন্মস্থান বা স্বদেশ খোঁজ করতে গিয়েছিল, তারা নিজেদের প্রশ্ন ভুলে তাঁর দর্শনমাত্রেই অভিভূত হয়ে পড়ে। অতএব আজ পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেনি যে বাবা হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান। এতে আশ্চর্য্য হওয়ারই বা কি আছে? যিনি অহং ও ইন্দ্রিয়সুখগুলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঈশ্বরের শরণে চলে গেছেন এবং ঈশ্বরের

সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তার আর কোন জাত পাত থাকে না। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জাতি বা প্রাণীদের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ভেদ করতেন না। ফকিরদের সঙ্গে তিনি আমিষ আর মাছও খেয়ে নিতেন। কুকুররাও ওর খাবার পাত্রে মুখ দিয়ে আনন্দসহকারে খেতো, কিন্তু তিনি কখনো কোন আপত্তি করতেন না। এমনি অপূর্ব ও অদ্ভুত অবতার ছিলেন শ্রী সাইবাবা। গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপ তাঁর শ্রী চরণে বসে তাঁর সৎসঙ্গের সুখ উপভোগ করার সৌভাগ্য আমারও হয়। আমি যে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করেছিলাম, সেটা কিভাবে বর্ণনা করতে পারি? যথার্থে বাবা ছিলেন অখন্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁর মহান ও অদ্বিতীয় চরিত্র কেই বা বর্ণনা করতে পারে? তাঁর শ্রীচরণের আশ্রয় নিয়ে ভক্তরা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। অনেক সন্ন্যাসী সাধক ও মুমুক্ষুজন তাঁর দর্শন করতে আসতেন। বাবাও তাঁদের সাথে উঠতেন-বসতেন, চলতেন ফিরতেন, তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে ওঁদের চিত্তরঞ্জন করতেন। 'আল্লাহ মালিক' সর্বদাই তাঁর মুখে লেগে থাকত। তিনি কখনো বিবাদ বা তর্কাতর্কিতে যেতেন না এবং সবসময় শান্ত ও স্থির থাকতেন। কিন্তু কখনো-কখনো তিনি রেগেও যেতেন। লোকেদের বেদান্তর শিক্ষা দিতেন। কেউ শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি যে, শ্রী সাইবাবা কে ছিলেন? গরীব হোক বা বড়লোক - সবাই তাঁর কাছে সমান। তিনি সবার গোপনীয় কাজ জানতেন এবং যখন তাদের সামনে সেই রহস্য প্রকাশ করে দিতেন, তখন তারা অবাক হয়ে যেত। স্বয়ং জ্ঞানাবতার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা অজ্ঞানেরই ভান করতেন। তাঁর মান সম্মানের আড়ম্বর ভালো লাগত না। এইরূপ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি শরীরধারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্ম তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেয়। শিরডীর নর - নারীরা তাঁকে পরমব্রহ্ম সরূপ মানত।

বিশেষ ঃ-

(১) শ্রী সাই বাবা তাঁর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত মহালসাপতিকে (যিনি বাবার সঙ্গে মস্‌জিদেও চাওড়ীতে শুতেন) বলেছিলেন- "আমার জন্ম পাথর্ডীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল। আমার বাবা-মা আমাকে বাল্য অবস্থাতেই এক ফকিরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।" যে সময় এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, পাথর্ডী থেকে কিছু লোক সেখানে এসে পৌঁছয়। বাবা তাদের পাথর্ডীর কিছু লোকেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমতি কাশীবাঈ কানেট্‌কর (পুণার এক প্রসিদ্ধ বিদূষী মহিলা) নিজের অভিজ্ঞতায় লেখেন- 'বাবার চমৎকারের কথা শুনে আমরা নিজেদের ব্রহ্মবাদী সংস্থার পদ্ধতির অনুসারে বিবেচনা করছিলাম। বিবাদের বিষয় ছিল যে, শ্রী সাইবাবা ব্রহ্মবাদী না বাম্মার্গী। কালান্তরে যখন আমি শিরডী যাই, তখন এ সম্বন্ধে আমার মনে নানারকমের প্রশ্ন

উঠছিল। মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা রাখতেই বাবা উঠে আমার সামনে এসে নিজের বুকের (হৃদয়) দিকে সংকেত করে আমার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলেন- "এইটি ব্রাহ্মণ, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। এর বাম্‌ মার্গের সাথে কি প্রয়োজন? এখানে কোন মুসলমান প্রবেশ করার দুঃসাহস করতে পারে না এবং করাও উচিত নয়। এই ব্রাহ্মণ লক্ষ-লক্ষ মানুষের পথ প্রদর্শণ করতে এবং তাদের অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি করাতে সক্ষম। এটা ব্রাহ্মণের মস্‌জিদ। আমি এখানে কোন বাম্মার্গীর ছায়াও পরতে দেব না।"

বাবার প্রকৃতি ঃ-

আমার মত মূর্খ শ্রী সাইবাবার অদ্ভুত লীলার বর্ণনা করতে পারবে না। শিরডীর প্রায় সব কটি জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার বাবাই করিয়েছিলেন। শ্রী তাত্‌য়া পাটীলকে দিয়ে শনি, গণপতি, শিব-পার্বতী, গ্রামদেবতা ও হনুমানজীর মন্দির মেরামত করান। তাঁর দানও বিলক্ষণ ছিল। দক্ষিণা রূপে যে টাকা একত্রিত হত, তার মধ্যে থেকে কাউকে কুড়ি টাকা, তো কাউকে পনেরো টাকা বা কাউকে পঞ্চাশ টাকা প্রতি দিন স্বচ্ছন্দে বিতরণ করতেন। যারা সেই টাকা পেতো, তারা এটিকে শুদ্ধ দান মনে করতো। বাবাও সর্বদা চাইতেন যে, সেটি উপযুক্ত রূপে খরচ করা হোক। বাবার দর্শন করে ভক্তরা অনেক ভাবে লাভবান হতো। অনেকে নিষ্কপট ও সুস্থ হয়ে যেত, দুষ্টাত্মা পুণ্যাত্মায় পরিণত হয়ে যেত, অনেক কুষ্ঠ রোগী মহারোগ হতে মুক্তি পেয়েছে এবং কত লোক মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করে সুখী হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রীদের দল শিরডীতে আসতে শুরু করে। বাবা সব সময় ধুনির কাছেই বসতেন এবং ওখানেই বিশ্রাম করতেন। তিনি কোন-কোন দিন স্নান করতেন আবার কখনো-কখনো দিনের পর দিন স্নান না করেই সমাধিতে লীন থাকতেন এবং দেহ ঢাকবার জন্য একটা 'অঙ্গরক্‌খা' পরে থাকতেন। তাঁর বেশভূষা শুরু থেকেই এরকম ছিল। জীবনের পূর্বার্দ্ধে তিনি গ্রামে চিকিৎসা কার্য্যও করতেন। রোগীদের ওষুধ দিয়ে তাদের সুস্থ করে দিতেন। তাঁর হাতে অপরিমিত যশ ছিল। তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি যোগ্য চিকিৎসক রূপে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে শুধু একটাই বিচিত্র ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

চোখের বিলক্ষণ চিকিৎসা ঃ-

একটি ভক্তের চোখ অত্যধিক লাল হয়ে ফুলে উঠেছিল। শিরডীর মতো একটা ছোট্ট গ্রামে ডাক্তার কোথায়? তখন সবাই রোগীকে বাবার কাছে নিয়ে এলো। এই ধরনের ব্যাধিতে ডাক্তারেরা সাধারণতঃ প্রলেপ, মলম, কাজল, গরুর দুধ বা কর্পূর

ওষুধ রূপে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বাবার ঔষধি ত একেবারেই ভিন্ন ছিল। তিনি কিছু 'ভেলা'-র বিচী (bibba seeds) পিষে তার দুটো গুলি বানিয়ে রোগীর চোখে এক-একটা গুলি চেপে দিয়ে কাপড়ের পট্টী বেঁধে দিলেন। পরের দিন পট্টী সরিয়ে চোখে জলের ছিটে দেওয়া হলো। ফোলা ভাবটা কম হয়েগিয়েছিল এবং চোখ প্রায় নিরোগ। চোখ শরীরের একটা খুবই সুকোমল অঙ্গ। বাবার ওষুধে চোখের কোনরকম ক্ষতি হয় না বরং চোখের কষ্ট দূর হয়ে যায়। এইভাবে অনেক রোগী নিরোগ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এই ঘটনাটি এখানে উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হলো।

বাবার যৌগিক ক্রিয়া ঃ-

বাবা সমস্ত যৌগিক ক্রিয়া জানতেন। তার মধ্যে শুধু দুটিরই উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

১) নাড়ি-ভুঁড়ি স্বচ্ছ করার ক্রিয়া (dhoti-poti) প্রত্যেক তৃতীয় দিন বাবা মস্‌জিদ থেকে খানিকটা দূরে একটা বট বৃক্ষের নীচে করতেন। একবার লোকেরা দেখে যে তিনি নিজের নাড়ি-ভুঁড়ী পেট থেকে বার করে ভালোভাবে পরিস্কার করে কাছের গাছে শুকোবার জন্যে রেখে দিয়েছেন। শিরডীতে এখনো এমন কয়েকটি লোক বেঁচে আছেন, যাঁরা এই ঘটনাটির পুষ্টি করতে পারেন। ওঁরা এর সত্যতাও পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণতঃ এই ক্রিয়াটি যেভাবে করা হয়, তার থেকে বাবার ক্রিয়াটি বিচিত্র ও অসাধারণই ছিল।

২) খন্ডযোগ - একবার বাবা নিজের অঙ্গপ্রতঙ্গ পৃথক-পৃথক করে মস্‌জিদের ভিন্ন-ভিন্ম স্থানে ছড়িয়ে দেন। হঠাৎ ঐ দিনই এক মহাশয় মস্‌জিদে আসেন এবং শরীরের অঙ্গগুলিকে এদিক-ওদিক ছড়ানো দেখে খুবই ভয় পেয়ে যান। প্রথমে ওঁর মনে হয় যে, গ্রাম অধিকারীকে এই খবরটি দেওয়া উচিত যে বাবাকে কেউ খুন করে তাঁকে টুকরো-টুকরো করে কেটে দিয়েছে। কিন্তু বার্তাবাহকই প্রথমে ধরা পড়ে, এই কথা ভেবে সে কোন রকম উচ্চবাচ্য করে না। পরের দিন মস্‌জিদ পৌঁছে বাবাকে আগের মতনই হৃষ্ট-পুষ্ট ও সুস্থ দেখে ওর খুবই আশ্চর্য্য লাগে। ওঁর মনে হয়- "গতকালের ঘটনাটি কি তাহলে স্বপ্ন ছিল?" বাবা ছোটবেলা থেকেই যৌগিক ক্রিয়া করতেন। তিনি কতখানি পারদর্শী হয়েছিলেন সে কথা কেউ জানত না। চিকিৎসার নামে তিনি কারো কাছ থেকে এক পয়সাও নেননি। তাঁর উত্তম, লোকপ্রিয় গুণের জন্য তাঁর কীর্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অনেক গরীব রোগীদের সুস্থ

করে দিয়েছিলেন। এই সুবিখ্যাত বৈদ্যচূড়ামনি নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা না করে অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে এবং নিজে অসহ্য বেদনা ও কষ্ট সহ্য করে সর্বদা অন্যদের উপকার করেছেন এবং তাদের বিপদে সাহায্য করেছেন। তিনি সব সময় পরকল্যাণার্থে চিন্তিত থাকতেন। এমনি একটা ঘটনা নীচে লেখা হচ্ছে, যেটি বাবার সর্বব্যাপকতা ও দয়ালুতা প্রমাণ করে।

বাবার সর্বব্যাপকতা ও দয়ালুতা ঃ-

১৯১০ সালে কালী পূজোর (দীপাবলী) শুভদিনে বাবা ধুনির কাছে বসেছিলেন। ধুনিতে কাঠ দিচ্ছিলেন ও হাত সেঁকছিলেন। ধুনি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বাবা কাঠের জায়গায় নিজের হাতটা ধুনিতে দিয়ে দেন। ফলতঃ হাতটা গুরুতর ভাবে জ্বলে যায়। শামা ও ভৃত্য মাধব বাবাকে জোর করে পেছনে টেনে নেন। মাধবরাও ব্যাকুল হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "দেব, আপনি এ কি করলেন? কেন করলেন?" বাবা এর উত্তরে জানান- "এখান থেকে একটু দূরে এক কর্মকারের বৌ হাপর দিচ্ছিল। সেই সময় ওর বর ওঁকে ডাক দেয়। কোমরে বাঁধা শিশুর কথা ভুলে উঠতে গিয়ে তার শিশুটি অগ্নিকুন্ডে পড়ে যায়। তাই আগুনে হাত দিয়ে শিশুটিকে বাঁচালাম। আমার হাত জ্বলে গেছে, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু একটি নির্দোষ শিশুর প্রাণ বেঁচে গেল, এটাই বড় কথা।

কুষ্ঠ রোগীর সেবা ঃ-

মাধবরাও দেশপান্ডের মাধ্যমে বাবার হাত জ্বলার সংবাদ পেয়েই শ্রী নানা সাহেব চাঁদোরকর বম্বের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রী পরমানন্দের সাথে ওষুধ, প্রলেপ এবং পট্টী ইত্যাদি নিয়ে শীঘ্রই শিরডী পৌঁছান। উনি বাবাকে শ্রী পরমানন্দকে তাঁর হাতের চিকিৎসা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বাবা ওঁর এই প্রার্থনাটি প্রত্যাখ্যান করে দেন। এক কুষ্ঠ রোগী ভাগোজী শিন্দে রোজ হাতের পোড়া জায়গাটির উপর ঘি লাগিয়ে, তার উপর একটা পাতা রেখে শক্ত করে একটা পট্টি বেঁধে দিতেন। ক্ষতটি যাতে তাড়াতাড়ি সেরে যায়, সেই চিন্তায় নানাসাহেব বার-বার বাবাকে পট্টীটা খুলে দিতে ও শ্রী পরমানন্দকে চিকিৎসা করতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। এমন কি ডাক্তারও কতবার তাকে মিনতি করেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই বাবা এই বলে মানা করে দিতেন- "ভগবানই আমার ডাক্তার।" বাবা হাত নিরীক্ষণ করার অনুমতি শেষ পর্যন্ত দেননি। ডাক্তার পরমানন্দের ওষুধ শিরডীর বায়ুমণ্ডলে খুলতে পারেনি

এবং কোন কাজেও লাগতে পারেনি। তবুও শ্রী পরমানন্দ খুবই সৌভাগ্যশালী যে, তিনি বাবার দর্শন পান। কিছুদিন পর যখন ক্ষতটি ভরে যায়, তখন সব ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু বাবার হাতে একটু ব্যথা রয়ে গিয়েছিল কিনা, সেটা কেউ জানতে পারে নি। বাবার সমাধির দিন পর্যন্ত রোজ সকালে ভাগোজী বাবার হাতটি ঘি দিয়ে মালিশ করে তার উপর পট্টী বেঁধে দিতেন। শ্রী সাইবাবার মত সিদ্ধপুরুষের এইরূপ চিকিৎসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে তিনি ভাগোজীর এই সেবা (অর্থাৎ উপাসনা) স্বীকার করেন। যখনই বাবা লেন্ডীতে বেড়াতে যেতেন, ভাগোজী ছাতা নিয়ে বাবার পেছনে-পেছনে চলতেন। প্রতি দিন বাবা ভোরবেলা যখন ধুনির কাছে এসে বসতেন, ভাগোজী আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং নিজের কাজ অবিলম্বে শুরু করে দিতেন। ভাগোজী পূর্বজন্মে অনেক পাপকর্ম করেছিলেন। তাই ওঁকে কুষ্ঠ রোগে ভুগতে হয়। ওঁর আঙ্গুল গলে গিয়েছিল ও শরীর পুঁজে ভরে গিয়েছিল। শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোত। এরূপ অবস্থায় ওঁকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক, কিন্তু বাবার প্রধান সেবক রূপে স্বীকৃত হওয়ার ফলস্বরূপ উনিই আসলে বেশী ভাগ্যবান ও সুখী ছিলেন। উনি বাবার সান্নিধ্যের পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করেন।

বালক খাপর্ডের প্লেগ ঃ-

এবার আমি বাবার অন্য একটি লীলা বর্ণনা করব। শ্রীমতি খাপার্ডে (অমরাবতীর শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডের স্ত্রী) নিজের ছোট ছেলের সাথে বেশ কয়েক দিন ধরে শিরডীতে থাকছিলেন। হঠাৎ একদিন ছেলের খুব জ্বর হয় ও প্লেগের গিল্‌টী (গাঁট) বেরিয়ে আসে। শ্রীমতি খাপার্ডে খুব ভয় পেয়ে যান এবং অমরাবতী ফিরে যেতে উদ্যত হন। সন্ধ্যাবেলায় বাবা যে সময় বেড়াতে বেরোন সেই সময় শ্রীমতী খাপার্ডে বাবার কাছে গিয়ে কম্পিত স্বরে বলেন- "আমার প্রিয় পুত্রের প্লেগ হয়েছে তাই এবার আমি বাড়ী ফিরতে চাই।" বাবা শান্ত মনে তাঁর সমস্যার সমাধান করে বলেন- "আকাশে খুব মেঘ করেছে। মেঘ সরে যেতেই আকাশ আবার আগের মতন স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" এই বলে তিনি নিজের কফ্‌নীটা কোমর পর্যন্ত তুলে সেখানে উপস্থিত সব ভক্তদের চারটে ডিমের আকারের গাঁট দেখিয়ে বলেন- "দেখ, ভক্তদের জন্য আমি সব রকমেরই কষ্ট সহ্য করি। ওদের কষ্ট আমার কষ্ট।" এই অদ্ভুত ও অসাধারণ লীলা দেখে ভক্তদের কোন সন্দেহ রইল না যে, সন্তরা ভক্তদের কল্যাণার্থে কতরকম কষ্ট নিজেদের উপর নিয়ে নেন। তাঁদের হৃদয় মোমের চেয়েও নরম এবং মাখনের

মত কোমল হয়। তাঁরা অকারণেই ভক্তদের প্রেম করেন ও তাদের নিজের পরম আত্মীয় মনে করেন।

পন্ঢরপুর যাত্রা ও সেখানে থাকা ঃ-

বাবা নিজের ভক্তদের কত ভালবাসতেন এবং কিভাবে তাদের মনের সমস্ত ইচ্ছে ও কথাগুলি আগেই জেনে জেতেন, সেইটা বর্ণনা করে এই অধ্যায়টি শেষ করব।

নানাসাহেব চাঁদোরকর বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। উনি খানদেশে নন্দুর বারেতে মাম্‌লৎদর ছিলেন। কিছুদিন পর ওঁর পন্ঢরপুরে স্থানান্তরণ হয়। বাবার ভক্তির ফলস্বরূপ উনি পন্ঢরপুরে (যাকে ভূবৈকুন্ঠ মানা হয়) থাকার সুযোগ পান। নতুন জায়গায় কাজ সামলাবার আগে উনি তাঁর পন্ঢরপুরে (শিরডী) নিজের বিঠোবাকে (শ্রী বাবা) প্রণাম করে পন্ঢরপুরের জন্য রওনা হতে চাইছিলেন। সময়াভাবে কোন পত্র বা খবর না দিয়েই, অতি শীঘ্র শিরডীর জন্য বেরিয়ে পড়েন। সুতরাং নানা সাহেবের আগমনের বিষয় কেউ কিছু জানত না। কিন্তু বাবা তো অন্তর্যামী। তাঁর কাছে কিই বা লুকানো যায়? তিনি তো সর্বজ্ঞ। যে সময় নানা সাহেব নিমগ্রামে (শিরডী থেকে ২-৩ মাইল দূর) পৌঁছুন সেই সময় বাবা মহালসাপতি, অপ্পা শিন্দে এবং কাশীরামের সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ মস্‌জিদে একটা স্তব্ধতা ছেয়ে গেল এবং বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন- " চলো চারজনে মিলে ভজন গাই - পন্ঢরপুরের দ্বার খোলা আছে - চলো সবাই মিলে প্রেমপূর্বক গাই (পন্ঢরপুরলা জায়াঞ্চে জায়াঞ্চে, তিথেঞ্চ মজলা, রাহাঞ্চি তিথেঞ্চে মজলা রাহাঞ্চে ঘরতে মাঝ্‌য়া রায়াঞ্চে)।" ভজনের ভাবার্থ - আমায় পণ্ঢরপুরে গিয়ে থাকতে হবে। কারণ ঐটি আমার স্বামী অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘর। বাবার সাথে-সাথে সব ভক্তরা এই ভজনটি গাইতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর নানাসাহেব সপরিবারে সেখানে পৌঁছে বাবাকে প্রণাম করেন। তিনি বাবাকে পণ্ঢরপুরে স্থানান্তরনে খবর দিয়ে তাঁর সাথে পণ্ঢরপুর যেতে অনুরোধ করেন। ভক্তরা নানাসাহেবকে জানান যে বাবা স্বয়ং ওনার আসার আগে থেকেই পণ্ঢরপুরে থাকার আনন্দে বিভোর এবং তাঁর এই প্রার্থনার আবশ্যকতা বাবা নিজেই দূর করে দিয়েছেন। এই কথা শুনে নানাসাহেব বাবার চরণে লুটিয়ে পড়েন এবং বাবার আশীর্বাদ ও উদী নিয়ে পণ্ঢরপুর অভিমুখে প্রস্থান করেন। বাবার লীলা অনন্ত। অন্যান্য বিষয় - যেমন মানব জন্মের মাহাত্ম্য, বাবার ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ, বায়জাবাইয়ের সেবা এবং অন্য ঘটনাগুলি পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য রেখে আমরা এইখানে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্‌ ভবতু।।

অধ্যায় - ৮

মানব জন্মের গুরুত্ব, শ্রী সাইবাবার ভিক্ষাবৃত্তি, রায়জাবাঈয়ের সেবা, শ্রী সাইবাবার শয়নকক্ষ, খুশালচন্দের প্রতি প্রেম।

গত অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছিল, এবার হেমাডপন্ত মানব জন্মের মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বোঝাবেন। শ্রী সাইবাবা কিভাবে ভিক্ষা অর্জন করতেন, বায়জাবাঈ বাবার কিরূপ সেবা করতেন, তিনি মস্‌জিদে তাত্‌য়া কোতে ও মহালাসাপতির সাথে কিভাবে শুতেন এবং খুশালচন্দকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, তারই বিবরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

মানব জন্মের মাহাত্ম্য ঃ-

এই বিচিত্র সংসারে ঈশ্বর লক্ষ - লক্ষ প্রাণী (হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ৮৪ লক্ষ) সৃষ্টি করেছেন (যেমন মধ্যে দেব, দানব, গর্ন্ধব্য, জীব-জন্তু ও মানুষ ইত্যাদি) যারা স্বর্গ, নরক, পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশে বাস করে এবং ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম পালন করে। এই প্রাণীদের মধ্যে যাদের পুণ্য প্রবল তারা স্বর্গে বাস করে এবং নিজেদের সৎ কর্মের ফল ভোগ করে। যখন তাদের পাপ-পুণ্যের সমন্বয় ঘটে তখন ওরা মানব জন্মের ও মুক্তি প্রাপ্ত করার সুযোগ পায়। পাপ ও পুণ্য দুটিই নষ্ট হয়ে গেলে তারা মুক্ত হয়ে যায়। নিজের কর্ম বা প্রারব্ধ অনুসারে আত্মা জন্ম নেয় বা দেহ ধারণ করে।

মনুষ্য শরীর অমূল্য ঃ-

এ কথাতো ঠিক যে চারটে জিনিষ সব প্রাণীরই রয়েছে - আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। কিন্তু সব প্রাণীদের মধ্যে মানবকে জ্ঞান একটি বিশেষ দান, যার সাহায্যে সে ঈশ্বর দর্শন করতে পারে। এইটি অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেবতারাও মানব জন্মকে ঈর্ষা করেন এবং পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করার জন্য সর্বদাই লালায়িত থাকেন, যাতে শেষে মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারেন।

অবশ্য অনেকেরই এই ধারণা যে মানব দেহ অতি দোষ যুক্ত। কৃমি, মজ্জা এবং শ্লেষ্মা দিয়ে ভরা, রোগগ্রস্ত, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। নিঃসন্দেহে এই তথ্যটি অংশতঃ সত্য। কিন্তু এত দোষপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানব শরীরের মূল্য অনেক বেশী, কারণ জ্ঞান-

প্রাপ্তি এই দেহেতেই সম্ভব। মানব শরীর পাওয়ার পরই তো জানা যায় যে, এই শরীর নশ্বর এবং বিশ্ব পরিবর্তনশীল। এইরূপ ধারণায় বদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে তিলাঞ্জলি দিয়ে, সৎ-অসতের বিবেক জাগলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করা যেতে পারে। সুতরাং শরীরকে তুচ্ছ ও অপবিত্র মনে করে তার উপেক্ষা করলে, ঈশ্বর-দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কিন্তু আবার শরীরকে অতি মূল্যবান মনে করে তার মোহে পড়ে থাকলে, আমরা ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে প্রবৃত্ত হয়ে যাব এবং তখন আমাদের পতন সু-নিশ্চিত।

সুতরাং সঠিক পথ তো এটাই যে, শরীরকে উপেক্ষাও করা উচিত নয় আর তার প্রতি আসক্ত হওয়াও উচিত নয়। ঠিক একটা ঘোড়সওয়ারের মত ঘোড়ার প্রতি ততক্ষন মোহ থাকা উচিত, যতক্ষন সে সফর পুরো করে নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে না আসে।

তাই ঈশ্বর-দর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য নিজের শরীরকে যুক্ত রাখা উচিত। এইটাই আমাদের জীবনের আসল লক্ষ্য। শাস্ত্রে বলে যে অনেক প্রাণী উৎপন্ন করার পরও ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না; কারণ কোন প্রাণীই তাঁর অলৌকিক রচনা বুঝতে বা অনুভব করতে সমর্থ ছিল না। তাই তিনি একটি বিশেষ প্রাণী অর্থাৎ মানবজাতির উৎপত্তি করেন। মানুষের মধ্যে তাঁর লীলা, অদ্ভুত সৃষ্টি ও জ্ঞান প্রাপ্ত করার যোগ্যতা দেখে তাঁর খুবই আনন্দ ও সন্তুষ্টি হয় (ভাগবৎ স্কন্ধ ১১- -২৮ অনুসারে)। তাই মানব জন্ম বড়ই সৌভাগ্যসূচক। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া তো পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু শ্রী সাই চরণাম্বুজে প্রীতি ও তাঁর শরণাগতি প্রাপ্ত হওয়া, এটি সবের চেয়ে শ্রেয়।

মানুষের প্রচেষ্টা ঃ-

এই সংসারে মানব-জন্ম অতি দুর্লভ। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তো নিশ্চিত এবং যে কোন সময়ই মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করতে পারে। এই ধারণাটিই দৃঢ় করে আমাদের নিজেদের লক্ষ্য প্রাপ্তির প্রতি সব সময় তৎপর থাকা উচিত। যেরকম হারানো রাজকুমারের খোঁজে রাজা সব রকম উপায় অবলম্বন করেন, ঠিক তেমনি কিঞ্চিৎমাত্র দেরী না করে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ হেতু শীঘ্রতা দেখানোই উচিত। সুতরাং সম্পূর্ণ উৎসাহের সাথে, আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ করে আমাদের সর্বক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। এই রকম না করতে পারলে নিজেদের পশু তুল্যই মনে করতে হবে।

কিভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ঃ-

সুলভে সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করার একমাত্র উপায় হলো - কোন যোগ্য সন্ত বা সদ্‌গুরুর (যাঁর ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে) চরণে আশ্রয় নেওয়া। যে লাভ ধার্মিক উপদেশ শ্রবণ করে বা ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে পাওয়া যায় না, সেটা সহজেই এই ধরণের অসাধারণ আত্মজ্ঞানীদের সংসর্গে প্রাপ্ত হয়। যে আলো আমরা সূর্য্য থেকে পাই, তা বিশ্বের সমস্ত তারাগুলি একত্রিত হয়ে গেলেও পাওয়া যাবে না। ঠিক সেই রকমই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপলব্ধি আমরা সদ্‌গুরুর কৃপা দ্বারা করতে পারি, সেটা গ্রন্থ বা উপদেশ দ্বারা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রত্যেকটি গতিবিধি, মৃদু ভাষণ, গুহ্য উপদেশ, ক্ষমাশীলতা, স্থিরতা, বৈরাগ্য, দান এবং পরোপকারীতা, শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ, অহংকার শূণ্যতা ইত্যাদি গুণ গুলি যে রূপ এই পবিত্র বিভূতিদ্বারা আচরণে প্রদর্শিত হত, ভক্তরা সৎসঙ্গ দ্বারা সেগুলি প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। এই ভাবে মস্তিষ্ক জাগ্রত হয় এবং দিনে -দিনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। শ্রী সাইবাবা এই ধরনেরই সন্ত বা সদ্‌গুরু ছিলেন। যদিও তিনি বাহ্যরূপে এক ফকিরের মত অভিনয় করতেন, কিন্তু সর্বদা আত্মলীন হয়ে থাকতেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে ভালবাসতেন এবং তাদের মধ্যে ভগবদ্দর্শন করতেন। ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। বিপদের সম্মুখীন হয়ে তিনি কখনো বিচলিত হতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে গরীব ও বড়লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যাঁর শুধুমাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা ভিখিরী রাজা হয়ে যেত, তিনি শিরডীর দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ভিক্ষে চাইতেন। এই কাজটি তিনি এইরূপ করতেন।

বাবার ভিক্ষাবৃত্তি ঃ-

সেই শিরডী বাসীদের সৌভাগ্য কে কল্পনা করতে পারে, যাদের দ্বারে পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভিক্ষুক রূপে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেন - "ওগো মা, একটা রুটির টুকরো পেতে পারি?" এবং সেটা গ্রহণ করার জন্য হাত পাততেন। এক হাতে একটি বড় গেলাস ও অন্য হাতে একটি ঝোলা থাকত। কয়েকটি বাড়ীতে তো তিনি প্রতিদিনই যেতেন এবং কয়েকটি বাড়ীর সামনে দিয়ে শুধু ঘুরে আসতেন। তিনি জলীয় পদার্থ যেমন দুধ, ঘোল ইত্যাদি গেলাসে নিতেন ও ভাত বা রুটি ইত্যাদি অন্য শুকনো বস্তু ঝোলাতে ঢেলে নিতেন। বাবার জিভে কোন স্বাদ ছিল না, কারণ তিনি সেটা নিজের বশে করে নিয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর চিন্তা তাঁর ছিল না। যা যা ভিক্ষেতে পেতেন সেগুলি সব মিশিয়ে নিয়ে সন্তুষ্টিপূর্বক গ্রহণ করতেন।

অমুক বস্তুটি সুস্বাদু কিনা সেকথা বাবা কখনো ভাবেন নি, কারণ তাঁর জিভে স্বাদের বোধই ছিল না। তিনি শুধু দুপুর পর্যন্ত ভিক্ষা করতেন, যদিও এটারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কোনদিন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসতেন, আবার কোন-কোনদিন প্রায় বারোটা বেজে যেত। একত্রিত খাদ্য বস্তুগুলি একটা পাত্রে ঢেলে দিতেন। সেখানে কুকুর, বেড়াল, কাক ইত্যাদি সব রকমের প্রাণী আনন্দ সহকারে ভোজন করত। বাবা ওদের কখনো তাড়াতেন না। যে মেয়েটি মস্‌জিদে ঝাড়ু লাগাতো, সে রোজ রুটির দশ-বারোটা টুকরো নিয়ে যেত, কিন্তু কেউ কখনো ওকে মানা করত না। যিনি স্বপ্নতেও কুকুর - বেড়ালকে কখনো 'দূর-ছাই' করেননি তিনি সে নিঃসহায় গরীবদের কি করে রুটি দিতে আপত্তি করতে পারতেন? এমন মহান পুরুষের জীবন ধন্য। শিরডীবাসীরা তো প্রথম-প্রথম তাঁকে পাগলই মনে করত এবং তিনি এই নামে শিরডীতে একরকম বিখ্যাতও হয়ে গিয়েছিলেন। যিনি ভিক্ষের ক'টি টুকরোদ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন, তাঁর সম্মান থাকেই বা কি করে? কিন্তু তিনি ত্যাগী, ধর্মাত্মা ও উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁকে দেখে চঞ্চল ও অশান্ত মনে হত, কিন্তু অন্তঃকরণে তিনি দৃঢ় ও গম্ভীর ছিলেন। তাঁর পথ গহন ও গূঢ় ছিল। তবুও গ্রামের কিছু সৌভাগ্য-শালী ও শ্রদ্ধাবান লোকেরা তাঁকে সঠিক চিনেছিল এবং এক মহান পুরুষ মেনে তাঁকে শ্রদ্ধা করত। এরই উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে -

বায়জাবাইয়ের সেবা ঃ-

তাত্য়া কোতের মা, যাঁর নাম বায়জাবাই ছিল, দুপুরের সময় একটা টুকরীর মধ্যে রুটি ও সব্জি ভরে জঙ্গলে গিয়ে বাবাকে আহার করাবার জন্য খুঁজে বেড়াতেন। অনেক সময় অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন ও বাবাকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণ দুটি ধরে নিতেন। বাবা তো ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। বায়জাবাই একটা শাল পাতা বিছিয়ে তার উপর রুটি, সব্জি ইত্যাদি সাজিয়ে বাবাকে খেতে অনুরোধ করতেন। ওঁর সেবা ও শ্রদ্ধার রীতি অতি বিচিত্র ছিল। প্রতিদিন বাবাকে জঙ্গলে খোঁজা ও খেতে অনুরোধ করা। ওঁর এই সেবা ও উপাসনার কথা বাবার শেষ সময় পর্যন্ত মনে ছিল। এই সেবার কথা মনে করে বাবা ওঁকে অনেক রকমের লাভ প্রদান করেছিলেন। মা ও পুত্র দুজনেরই বাবার উপর দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। ওঁরা বাবাকে সর্বদা ঈশ্বরের ন্যায় পূজণীয় মনে করতেন। বাবা কখনো-কখনো ওঁদের বলতেন- "ফকিরের জীবনই সত্যিকারের ঐশ্বর্য্য। এর কোন শেষ নেই। যাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলে মনে করি, সেটা খুব শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যায়।" কিছু বছর পর বাবা জঙ্গলে ঘোরা বন্ধ করে দেন। তিনি গ্রামে

থাকতে ও মস্‌জিদেই খাবার খেতে শুরু করেন। তাই বায়জাবাইও বাবাকে খুঁজতে বেরোবার কষ্ট থেকে মুক্তি পান।

তিনজনের শোওয়ার ঘর ঃ-

সেই সাধু পুরুষেরা ধন্য, যাদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব সর্বদা বাস করেন। সেই ভক্তগণও ভাগ্যবান, যারা তাঁদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত করতে পারে। এমনি দুজন ভাগ্যবান ভক্ত ছিলেন - ১) তাত্‌য়া কোতে পাটীল ২) ভগত মহালসাপতি। দুজনেই বাবার সান্নিধ্য দ্বারা লাভান্বিত হন। বাবা দুজনকেই সমানরূপে ভালবাসতেন। এই তিন মহানুভব নিজেদের মাথা পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে করে এবং মাঝখানে একে-অপরের পায়ের সাথে পা জুড়ে মস্‌জিদে শুতেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অর্দ্ধেক রাত্তির পর্যন্ত প্রেম পূর্বক কথাবার্তা ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। যদি কোন জন ঘুমিয়ে পড়তেন তো অন্যজন তাকে জাগিয়ে দিতেন। তাত্‌য়া নাক ডাকা শুরু করলেই বাবা উঠে ওঁকে জোরে নাড়িয়ে ও মাথা ধরে জোরে টিপে দিতেন। আর মহালসাপতি ঘুমিয়ে পড়লে বাবা ওঁকেও নিজের দিকে টেনে, পায়ে ধাক্কা দিয়ে পিঠ থাপড়াতেন। এইভাবে তাত্‌য়া নিজের বাবা-মাকে বাড়ীতে ছেড়ে বাবার প্রেম ও প্রীতির বশে তাঁর সাথে মস্‌জিদে ১৪ বছর থাকেন। কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি! সেগুলি কি কখনো ভোলা যেতে পারে? সেই ভালবাসার কিই বা উপমা দেওয়া যেতে পারে? বাবার কৃপার মূল্য কিভাবে নিরুপণ করা যেতে পারে? পিতার মৃত্যুর পর তাত্‌য়ার উপর ঘর–সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে, তাই তিনি নিজের বাড়ীতেই শুতে শুরু করেন।

রাহাতা নিবাসী খুশালচন্দ ঃ-

শিরডী নিবাসী গণপত তাত্‌য়া কোতেকে বাবা খুব ভালবাসতেন। তিনি রাহাতার মারোয়াড়ী শেঠ শ্রী চন্দ্রভানকেও খুব ভালবাসতেন। ওঁর মৃত্যুর পর বাবা ওঁর ভাইপো খুশালচন্দকেও খুব স্নেহ করতে শুরু করেন। বাবা সর্বদা ওঁর কল্যাণার্থে চিন্তিত থাকতেন। কখনো গরুরগাড়ীতে, কখনো ঘোড়াগাড়ীতে তিনি নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে রাহাতা যেতেন। বাবা যেই গ্রামের ফাটকে পা দিতেন, গ্রামবাসীরা সঙ্গে-সঙ্গে ওকে অপূর্ব অভ্যর্থনা জানাত। ওঁকে প্রণাম করে খুব ঘটা করে গ্রামের ভেতরে নিয়ে যেতো। খুশালচন্দ বাবাকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতেন। নরম আসনে বসিয়ে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করতেন। তারপর প্রসন্নচিত্তে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করতেন। শেষে বাবা সবাইকে আনন্দিত করে ও আশীর্বাদ দিয়ে শিরডী ফিরে আসতেন। শিরডীর

একদিকে রাহাতা (দক্ষিণে) ও অন্যদিক নিমগ্রাম (উত্তরে)। এই দুটি গ্রামের মাঝখানে শিরডী পড়ে। বাবা নিজের জীবদ্দশায় এই দুটি সীমা পার করে কখনো যাননি। তিনি কখনো রেলগাড়ী দেখেননি বা চড়েননি। তবুও তিনি প্রত্যেকটি গাড়ীর সময় ঠিক-ঠিক জানতেন। যারা বাবার কাছে ফেরার অনুমতি নিয়ে তাঁর আদেশানুসারে রওনা হত, তারা সকুশল গৃহে পৌঁছে যেত। অপর দিকে যারা বাবার আদেশ অবজ্ঞা করত, তাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনার সম্মুখীণ হতে হতো। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও অন্যান্য বিষয় বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে করা হবে।

এই অধ্যায়ের শেষে বাবার খুশালচন্দের প্রতি প্রেমের সম্বন্ধে টীকা দেওয়া হয়েছে। তিনি কিরূপ কাকা সাহেব দীক্ষিতকে রাহাতা গিয়ে খুশালচন্দকে শিরডী নিয়ে আসতে বলেন এবং সেইদিনই দুপুরে খুশালচন্দকে স্বপ্নে শিরডী আসতে বলেন- এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না, কারণ এর বর্ণনা এই সৎচরিত্রের ৩০ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৯

রওনা হওয়ার সময় বাবার আজ্ঞা পালন এবং অবজ্ঞা করার পরিণামের কয়েকটি উদাহরণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও তার আবশ্যকতা, ভক্তদের (তর্খড পরিবারের) অভিজ্ঞতা।

গত অধ্যায়ে শুধু এতটাই সংকেত দেওয়া হয়েছিল যে, ফেরবার সময় যাঁরা বাবার আদেশ পালন করেছিলেন, তাঁরা কুশলে বাড়ী পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং যাঁরা অবজ্ঞা করেছিলেন তাঁদের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই অধ্যায়ে এই সত্যটি কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে বিস্তৃত আকারে বোঝান হবে।

শিরডী যাত্রার বিশেষত্ব ঃ-

শিরডী যাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল যে বাবার অনুমতি ছাড়া কেউ শিরডী থেকে প্রস্থান করতে পারত না এবং যদি কেউ দুভার্গ্যবশতঃ বাবার আজ্ঞার অবজ্ঞা করে যাত্রা করত, তাহলে যেন সে অনেক কষ্টকে আহ্বান করত। আবার এও ঠিক যে, যদি কাউকে বাবা শিরডী থেকে রওনা হওয়ার আদেশ দিতেন তাহলে তার আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকবার সুযোগ হত না। যখন ভক্তরা রওনা হওয়ার সময় বাবাকে প্রণাম করতে যেত, তখন বাবা ওদের যা আদেশ দিতেন, সেটা পালন করা নিতান্তই আবশ্যক হয়ে দাঁড়াত। এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

তাত্য়া কোতে পাটীল ঃ-

একবার তাত্য়া কোতে টাঙ্গায় চড়ে কোপর গ্রামের বাজারে যাচ্ছিলেন। ওঁর একটু তাড়া ছিল। সেই শীঘ্রতাতেই মস্‌জিদে আসেন। বাবাকে প্রণাম করে বলেন- "আমি কোপর গ্রামের বাজারে যাচ্ছি।" বাবা তার প্রত্যুত্তরে বললেন- "অত তাড়াহুড়ো কোরো না। বাজার যাওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করো, গ্রামের বাইরে যেও না।" কিন্তু ওঁর তীব্র ইচ্ছে দেখে বাবা বলেন- "আচ্ছা, এক কাজ করো, শামাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" বাবার আদেশ না মেনে তাত্য়া তক্ষুনি টাঙ্গায় চড়ে বেরিয়ে পড়েন। টাঙ্গার দুটি ঘোড়ার মধ্যে একটা (যার দাম প্রায় তিনশো টাকা ছিল) খুবই চঞ্চল ও দ্রুতগামী ছিল। সাঁওলী বিহীর গ্রাম পার করতেই ঘোড়াটি প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে লাগল। অকস্মাৎ কোমরে

মোচড় লাগতে সে ওখানেই পড়ে যায়। যদিও তাত্যার বেশী ব্যথা লাগেনি, কিন্তু নিজের সাই মায়ের আদেশের কথা অবশ্যই মনে পড়ে যায়। আরেকবার কোল্হার গ্রামে যাওয়ার সময় উনি বাবার আদেশ অবজ্ঞা করেন এবং উপরে বর্ণিত ঘটনার মতই ওনাকে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়।

এক ইউরোপীয় মহাশয় ঃ-

একবার বম্বের এক ইউরোপীয় মহাশয়, নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে কোন বিশেষ কাজে শিরডী আসেন। ওঁকে একটা বড় তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হয়। উনি বাবার সামনে নত হয়ে তাঁর হাতে চুমু খেতে চাইছিলেন। তাই তিনবার মস্‌জিদে সিঁড়ি চড়তে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাবা ওকে নিজের কাছে আসতে দেন না। ওঁকে সভা-মণ্ডপেই বসতে এবং ওখানে থেকেই দর্শন করতে বলা হয়। এই বিচিত্র অভ্যার্থনায় অপ্রসন্ন হয়ে ভদ্রলোক শীঘ্রই শিরডী থেকে প্রস্থান করবেন বলে স্থির করেন এবং রওনা হওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য মস্‌জিদে আসেন। বাবা ওঁকে পরের দিন রওনা হতে ও উৎকণ্ঠা না করতে পরামর্শ দেন। অন্য উপস্থিত ভক্তরাও ওঁকে বাবার আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উনি সবার কথা অবজ্ঞা করে টাঙ্গায় চড়ে রওনা হয়ে যান। কিছুদূর পর্য্যন্ত ঘোড়াগুলি ভালভাবেই চলল। কিন্তু সাঁওলী বিহীর পার হতেই একটা সাইকেল সামনে থেকে আসতে দেখে ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে দ্রুতগতিতে দৌড়তে লাগল। ফলে টাঙ্গা উল্টে যেতেই ভদ্রলোক নীচে পড়ে যান এবং কিছু দূর টাঙ্গার সাথেই রাস্তায় রগড়ানি খান। লোকেরা তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে নেয়। ওঁকে কোপর গ্রামে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে ভক্তরা শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, বাবার আদেশ অবহেলা করলে কোন-না-কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতেই হয়। যারা বাবার আজ্ঞা পালন করে, তারা নির্বিঘ্নে ও আনন্দে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

ভিক্ষাবৃত্তির আবশ্যকতা ঃ-

এবার আমরা ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্নের উপর বিচার করব। অনেকের মনে এই সন্দেহ উৎপন্ন হতে পারে যে, বাবা এত মহান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও আজীবন ভিক্ষাবৃত্তি করে কেন জীবন নির্বাহ করেন? এই প্রশ্নের উত্তর দুটি দৃষ্টিকোণ সামনে রেখে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম দৃষ্টিকোন - ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করার অধিকারী কে?

শাস্ত্রানুসারে যাঁরা তিনটি মুখ্য আসক্তি যথা - কামিনী, কাঞ্চন ও কীর্তি ত্যাগ করেছেন, আসক্তি মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তাঁরাই ভিক্ষাবৃত্তির উপযুক্ত অধিকারী। কারণ তাঁরা নিজের বাড়ীতে খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা করতে পারেন না। অতএব তাঁদের ভোজনের ভার গৃহস্থদের উপর দেওয়া হয়েছে। শ্রী সাইবাবা না তো গৃহস্থ ছিলেন আর না বানপ্রস্থী। বাল্যকাল থেকে তিনি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। তাঁর এইটাই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁর বাসস্থান। তিনি স্বয়ং বিশ্ব পালনকর্তা ভগবান শ্রী বাসুদেব ও পরমব্রহ্ম। অতএব তিনি ভিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ অধিকারী!

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ -

পাঁচটি পাপ ও তাদের প্রায়শ্চিত্ত ঃ- সবাই জানে যে, ভোজন সামগ্রী বা রান্নার জন্য গৃহস্থকে পাঁচ রকমের ক্রিয়া করতে হয় - ১) পেষা ২) চূর্ণ করা ৩) বাসন মাজা ৪) ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা ৫) উনুন জ্বালানো। এই ক্রিয়াগুলির পরিণামস্বরূপ অনেক পোকা-মাকড় ও জীব মরে যায় এবং এইভাবে গৃহস্থকে পাপের ভাগী হতে হয়। এই পাপগুলির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শাস্ত্রতে পাঁচ রকমের যজ্ঞ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন - ১) ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন - ব্রহ্মকে অর্পণ করা বা বেদ অধ্যয়ন করা ২) পিতৃযজ্ঞ - পূর্বপুরুষদের দান ৩) দেবযজ্ঞ - দেবতাদের নামে বলি ৪) ভূতযজ্ঞ - প্রাণীদের দান ৫) মনুষ্যযজ্ঞ - মানুষদের (অতিথিদের) দান।

যদি এই কর্মগুলি বিধিপূর্বক শাস্ত্রানুসারে করা হয়, তাহলে মন শুদ্ধ হয়ে জ্ঞান ও আত্মানুভূতির প্রাপ্তি সুলভ হয়ে যায়। বাবা দ্বারে-দ্বারে গিয়ে গৃহস্থদের এই পবিত্র কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতেন। তারা খুবই ভাগ্যবান, যারা বাড়ী বসে বাবার দ্বারা দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল।

ভক্তদের অভিজ্ঞতা ঃ-

এবার একটি মনোরঞ্জক বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন **"যে আমায় ভক্তিপূর্বক কেবল একটা পাতা, ফুল, ফল বা জল অর্পণ করে আমি সেই শুদ্ধচিত্তের ভক্তের দ্বারা অর্পিত বস্তু সানন্দে স্বীকার করি।"**

যদি ভক্তদের শ্রী সাইবাবাকে সত্যি-সত্যি কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছে হত এবং অর্পণ করার কথা তারা যদি ভুলে যেত তাহলে বাবা তাদের কিংবা তাদের বন্ধুদের দ্বারা ঐ উপহারের কথা মনে করিয়ে দিতেন এবং সেটা দিতে বলতেন। বলাবাহুল্য,

উপহার পাওয়ার পর তাদের আশীষও দিতেন। এই ধরনের কিছু ঘটনা নীচে বর্ণনা করা হচ্ছে।

তর্খড পরিবার (পিতা ও পুত্র) ঃ-

শ্রীরামচন্দ্র আত্মারাম উপনাম বাবাসাহেব তর্খড প্রথমে প্রার্থনা সমাজী ছিলেন। তবুও তিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। একবার উনি স্থির করেন যে, ছেলে ও মা গরমকালের ছুটি শিরডীতেই কাটাবে। কিন্তু ছেলের বান্দ্রা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ওর ভয় ছিল যে, শ্রীবাবার পূজো নিয়ম মত হতে পারবে না। পিতা প্রার্থনা সমাজের রীতি অনুসরণ করেন, তাই খুব সম্ভব শ্রী সাইবাবার পূজা ইত্যাদির খেয়াল রাখতে পারবেন না। কিন্তু পিতা আশ্বাস দেন যে, বাবার পূজোয় কোন বাধা পড়বে না এবং মা ও ছেলে শুক্রবার রাতে শিরডী অভিমুখে রওনা দেয়। পরের দিন শনিবার। শ্রীমান তর্খড ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে, স্নানাদি সেরে, পূজো শুরু করার আগে, বাবাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করেন- "হে বাবা। আমি ঐ ভাবেই আপনার পূজো-অর্চনা করব যেমনটি আমার ছেলে করত। কিন্তু কৃপা করে এটা একটা শারীরিক কর্মের সীমায় আবদ্ধ রাখবেন না।" এই বলে উনি পূজো আরম্ভ করেন এবং মিছরি নৈবেদ্য অর্পণ করেন, যেটা দুপুরের খাবারের সাথে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হয়। সেই সন্ধ্যা ও পরের দিন (রবিবার) নির্বিঘ্নে কেটে যায়। সোমবার দিন উনি অফিস যান, কিন্তু সেদিনটাও নির্বিঘ্নে কেটে যায়। শ্রী তর্খড জীবনে কখনো এইভাবে পূজো করেননি। ওঁর এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে, ছেলেকে দেওয়া কথামত পূজো যথারীতি সন্তোষজনক ভাবে চলছে। পরের দিন (মঙ্গলবার) রোজকার মত পূজো করে উনি অফিস চলে যান। দুপুরে বাড়ী ফিরে খেতে বসে থালায় প্রসাদ না দেখতে পেয়ে রাঁধুনিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে ওঁকে জানায় যে, আজ ভুলবশতঃ উনি নৈবেদ্য অর্পন করেননি। এই কথা শুনে উনি তক্ষুনি আসন থেকে উঠে বাবাকে দণ্ডবত প্রণাম করেন। সঠিক পথ প্রদর্শন না করার জন্য ও পূজোটিকে কেবল শারীরিক পরিশ্রম পর্যন্ত সীমিত রাখার জন্য বাবার উপর দোষারোপ করেন। সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে উনি একটা চিঠি ছেলেকেও লেখেন এবং ওকে অনুরোধ করেন- "এই চিঠিটা বাবার শ্রীচরণে রেখে ওঁকে জানিও যে, এই অপরাধের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।" এই ঘটনাটি দুপুর বেলায় বান্দ্রাতে ঘটেছিল। ঠিক ঐ সময়ই শিরডীতে মধ্যাহ্ন আরতি শুরু হবে, এমন সময় বাবা শ্রীমতি তর্খডকে বলেন- "মা, আমি কিছু খাবার পাওয়ার আশায় তোমার বাড়ী (বান্দ্রাতে) গিয়েছিলাম। দরজায় তালা দেখেও কোনরকমে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ

করি। কিন্তু সেখানে দেখি মহাশয় (শ্রী তর্খড) আমার জন্য কিছুই (খাবার) রেখে যাননি। তাই আমি ক্ষুধার্তই ফিরে এসেছি।" কেউই বাবার কথার অভিপ্রায় বুঝতে পারল না। কিন্তু শ্রী তর্খডের ছেলে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝে গেল যে, নিশ্চয় বান্দ্রাতে বাবার পূজোয় কোন ভুল হয়ে গেছে। তাই ও বাবার কাছে অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল। কিন্তু বাবা ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না এবং শিরডীতে থেকে সেখানেই পূজো করার আদেশ দেন। শিরডীতে যা-যা ঘটল, তা একটা চিঠিতে লিখে ছেলে নিজের বাবাকে পাঠায় ও ভবিষ্যতে পূজোয় সাবধান থাকতে অনুরোধ করে। দুটো চিঠিই ডাক মারফত দুই পক্ষ একই সময় পায়। ঘটনাটি অত্যাশ্চর্য্য নয় কি?

শ্রীমতি তর্খড ঃ-

একবার শ্রীমতি তর্খড তিনটি জিনিষ-মশলা মাখানো বেগুন ভাজা, বেগুনের গোল টুকরো ঘিয়ে ভাজা ও পেঁড়া বাবার জন্য পাঠান। বাবা সেগুলিকে কিভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন, এবার আমরা সেটাই দেখব।

বান্দ্রার শ্রী রঘুবীর ভাস্কর পুরন্দরে বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীমতি তর্খড শ্রীমতি পুরন্দরেকে দুটো বেগুন দেন এবং শিরডী পৌঁছে উপরোক্ত দুটি ব্যঞ্জন বাবাকে অর্পণ করতে অনুরোধ করেন। শিরডী পৌঁছে শ্রীমতি পুরন্দরে প্রথম ব্যঞ্জনটি (ভূর্তা) নিয়ে মস্‌জিদে যান। বাবা ঠিক সেই সময়েই খেতে বসেছিলেন। বাবার বেগুনের 'ভূর্তা' খেয়ে খুবই ভাল লাগে এবং একটু-একটু সবাইকে বিতরণ করেন। কিছুক্ষণ পরই বেগুনের কাচরা (দ্বিতীয় ব্যঞ্জনটি) আনতে বলেন। রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় যে, বাবা বেগুন ভাজা চেয়ে পাঠিয়েছেন। এবার রাধাকৃষ্ণমাঈ তো খুবই বিপদে পড়লেন, কারণ বছরের এই সময় তো বেগুন পাওয়াও যায় না। বেগুন পাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এবার খোঁজ পড়ল যে, বেগুনের ব্যঞ্জনটি কে বানিয়ে এনেছিল। তখন জানা গেল যে বেগুন শ্রীমতি পুরন্দরে এনেছিলেন এবং ওঁকেই বেগুনটি ভেজে বাবাকে পরিবেশন করার ভার দেওয়া হল। এবার সবাই বাবার হঠাৎ বেগুন ভাজা খাওয়ার ইচ্ছার অভিপ্রায় বুঝতে পারল। বাবার সর্বজ্ঞতা দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে শ্রী গোবিন্দ বালারাম মানকর শিরডী গিয়ে সেখানে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে চাইলেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি শ্রীমতি তর্খডের

সঙ্গে দেখা করতে যান। শ্রীমতি তর্খড বাবার জন্য কিছু পাঠাতে চাইছিলেন। বাড়ীময় খোঁজাখুঁজির পরও একটা পেঁড়া ছাড়া কিছুই পেলেন না এবং পেঁড়াটাও নৈবেদ্য রূপে আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে সেই পেঁড়াটিই অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে বাবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবা সেটি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। শিরডী পৌঁছে গোবিন্দরাও বাবার দর্শন করতে যান, কিন্তু সেই সময় পেঁড়াটি নিয়ে যেতে ভুলে যান। বাবা কিছু বলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ও যখন গোবিন্দরাও পেঁড়া না নিয়েই বাবার দর্শন করতে যান তখন বাবা আর চুপ থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি আমার জন্য কি এনেছ?" উত্তর পান-"কিছু না।" বাবা আবার প্রশ্ন করেন এবং একই উত্তর পান। এবার বাবা স্পষ্ট শব্দে জিজ্ঞাসা করেন- "মা তোমায় (শ্রীমতি তর্খড) রওনা হওয়ার সময় কিছু দেননি?" এবার ওঁর পেঁড়ার কথা মনে পড়ে এবং খুবই লজ্জিত বোধ করেন। বাবার কাছে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চান। তক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে পেঁড়াটি এনে বাবার সামনে রাখেন। বাবা তক্ষুনি সেটি মুখে পুরে ফেলেন। এই ভাবে শ্রীমতি তর্খডের উপহার বাবা গ্রহণ করেন। "ভক্ত আমার উপর বিশ্বাস রাখে তাই আমিও গ্রহণ করে নিই।" - এই ভগবদবচন সিদ্ধ হল।

(বাবার) তৃপ্তিকর ভোজন ঃ-

একবার শ্রীমতি তর্খড শিরডী যান। দুপুরের খাবার প্রায় তৈরী এবং থালা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেই সময় একটি কুকুর ক্ষিধের চোটে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে সেখানে এসে দাঁড়াল। শ্রীমতি তর্খড তক্ষুণি উঠে গিয়ে রুটির একটা টুকরো কুকুরটাকে দেন। সে খুব আনন্দের সাথে সেটা খেয়ে নেয়। বিকেল বেলা যখন বাবা মস্‌জিদে এসে বসেন তখন তিনি শ্রীমতি তর্খডকে দেখে বলেন- "মা, আজ তুমি আমায় খুব ভালবেসে খাওয়ালে। আমার ক্ষুধার্ত আত্মা বড়ই তৃপ্তি পেল। সব সময় এইরূপ আচরণই কোর, কখনো-না-কখনো তুমি এর উত্তম ফল পাবে। এই মস্‌জিদে বসে আমি কখনো অসত্য ভাষণ করব না। সর্বদা আমার উপর এইরূপ অনুগ্রহই রেখো - এই কথাটা ভাল ভাবে মনে রেখো।" বাবার কথাগুলি উনি ঠিক বুঝতে পারেন না, তাই প্রশ্ন করেন- "আমি আবার কাকে খেতে দিলাম? আমি তো নিজেই অন্যদের উপর আশ্রিত। অন্যের কাছে অর্থের বিনিময়ে খাবার সংগ্রহ করি।" বাবা তাতে বলেন- "ঐ রুটিটা খেয়ে আমার হৃদয় তৃপ্ত হয়ে গেল এবং এখনো অবধি ঢেকুর উঠছে। **ভোজন করার আগে তুমি যে কুকুরটাকে দেখেছিলে এবং যাকে তুমি রুটির**

টুকরো দিয়েছিলে, সে ত আসলে আমারই স্বরূপ। এই রকম অন্যান্য প্রাণীরাও (বেড়াল, শূকর, মাছি, গরু ইত্যাদি) আমারই স্বরূপ- আমিই ওদের আকারে বিদ্যমান। যে এই সব প্রাণীদের মাঝে আমাকেই দর্শন করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। তাই দ্বৈত বা ভেদ ভাব ভুলে তুমি আমার সেবা কোর।"

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।

(-গীতা ৬/৩০)

এই অমৃততুল্য উপদেশ গ্রহণ করে শ্রীমতি তর্খড হতবাক হয়ে গেলেন এবং ওঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এবং মন আনন্দে নেচে উঠল।

শিক্ষা ঃ-

"সমগ্র প্রাণীদের মাঝে ঈশ্বর দর্শন করো" - এইটাই হচ্ছে এই অধ্যায়ের শিক্ষা। উপনিষদ, গীতা ও ভাগবৎ এই উপদেশ দেয় যে, সব প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বরের বাস, এই সত্যই প্রত্যক্ষ অনুভব কর। অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত ঘটনাটি ও অন্য আরো অনেক দৃষ্টান্ত এখনো লেখা বাকী আছে। বাবা স্বয়ং প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রস্তুত করে দেখাতেন যে কিভাবে উপনিষদের শিক্ষাগুলি আচরণবদ্ধ করা উচিত এই ভাবে শ্রী সাইবাবা শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষা দিতেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ১০

শ্রী সাই বাবার জীবনধারা, শোওয়ার তক্তা, শিরডীতে তাঁর অবস্থান, তাঁর উপদেশ, তাঁর বিনয়, নানাবলী, সহজতম পথ।

প্রারম্ভ ঃ-

শ্রী সাইবাবাকে সর্বক্ষণ প্রেমপূর্বক স্মরণ কর কারণ তিনি সর্বদা অন্যদের কল্যাণার্থে তৎপর ও আত্মলীন থাকতেন। তাঁকে স্মরণ করলেই জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। সব সাধনার মধ্যে এটি সব চেয়ে সরল, কারণ এতে কোন অর্থ ব্যয় না। কেবল একটু পরিশ্রমেই ভবিষ্যত ফলদায়ক হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়গুলি বলিষ্ঠ থাকাকালীন প্রতি মুহূর্তে এই সাধনাটির অভ্যাস করা উচিত। অন্যান্য দেবী-দেবতা তো ভ্রম উৎপন্ন করতে পারেন, কেবল গুরুই আমাদের ঈশ্বর। তাঁর পবিত্র চরণে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তিনি তো প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যবিধাতা এবং স্নেহময় প্রভু। যে অনন্যরূপে তাঁর সেবা করবে, সে এই ভবসাগর হতে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। **দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্র পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। যেরূপ বিশ্বাস নদী বা সমুদ্র পার করার সময় নাবিকের উপর রাখতে হয়, ঠিক সেই রকমই বিশ্বাস ভবসাগর পার হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর উপর রাখা উচিত।** সদ্‌গুরু তো কেবলমাত্র ভক্তদের ভক্তিভাব দেখে তাদের জ্ঞান ও পরমানন্দের প্রাপ্তি করিয়ে দেন।

পাঠকগণ, এবার শ্রী সাইবাবা কিভাবে থাকতেন, শুতেন ও শিক্ষা দিতেন- সে কথা শুনুন।

বাবার বিচিত্র বিছানা ঃ-

প্রথমে আমরা এটা দেখব যে, বাবা কিভাবে শুতেন। শ্রী নানাসাহেব ডেঙ্গলে একটা চার হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া কাঠের তক্তা শ্রী সাইবাবার জন্য নিয়ে আসেন। তক্তাটা নীচে না বিছিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে একটা দোলনার মত বানিয়ে বাবা তাতে শোওয়া আরম্ভ করেন।

দোলনার দড়িগুলি একেবারে পাতলা ও ছেঁড়া হওয়ার দরুণ লোকেদের কাছে

এই দোলনাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ দড়ির তো তক্তার ভার নেওয়ারও সামর্থ ছিল না। তবে বাবার শরীরের ভার কিভাবে বহন করত? যে ভাবেই হোক, সে তো ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু এটি তো বাবার একটি লীলাই বলতে হবে যে, ছেঁড়া দড়িগুলি তক্তা ও বাবার ভার সামলাচ্ছিল। বাবা কি ভাবে তক্তায় উঠে বসতেন ও শুতেন- এই দৃশ্য দেখা দেবতাদের জন্য দুর্লভ ছিল। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে এটাই ভাবত যে, বাবা কিভাবে তক্তায় উঠতেন ও নামতেন। কৌতূহলবশে লোকেরা রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু সেটা জানতে বা বুঝতে কেউ সফল হতে পারেনি। একথা জানবার জন্য ভীড় দিনের-পর-দিন বাড়তে লাগল। শেষে একদিন অতিষ্ট হয়ে বাবা তক্তাটা ভেঙ্গে বাইরে ফেলে দিলেন। যদিও বাবা অষ্টসিদ্ধিতে পারদর্শী ছিলেন, তবুও তিনি সেগুলো কখনো ব্যবহার করেননি। সেগুলি সহজেই ও আপনা-আপনি বাবার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল।

ব্রহ্মের সগুন অবতার ঃ-

বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী সাইবাবা সাড়ে তিন হাত লম্বা এক সামান্য পুরুষ মনে হলেও প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনিই বিরাজমান। অন্তরে তিনি আসক্তিশূণ্য ও স্থির ছিলেন, কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে জনকল্যাণ হেতু সর্বদাই চিন্তিত মনে হতো। অন্তর হতে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ছিলেন। ভক্তদের জন্য তাঁর হৃদয়ে পরম প্রেম ও শান্তি বিরাজমান ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তাঁকে অশান্ত মনে হতো। তিনি অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু বাহ্যরূপে সংসার চক্রে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হতো। তিনি কখনো স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন, তো কখনো পাথর মারতেন, কখনো গালি-গালাজ করতেন তো কখনো বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তিনি গম্ভীর, শান্ত, সহনশীল ছিলেন এবং সর্বদা নিজের ভক্তদের খেয়াল রাখতেন। সর্বদা একটা আসনের উপরে বিরাজমান থাকতেন। তাঁর দণ্ড একটা ছোট্ট লাঠি ছিল, যেটি তিনি সব সময় নিজের কাছে সামলে রাখতেন। তিনি কাঞ্চন বা কীর্তির চিন্তা কখনো করেননি এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করেছেন। 'আল্লাহ মালিক' সর্বদা তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকত। ভক্তদের প্রতি অটুট ও বিশেষ ভালবাসা ছিল। আত্ম জ্ঞানের খনি ও পরম দিব্যরূপ ছিলেন। একটি অপরিমিত, অনন্ত, সত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল সিদ্ধান্ত (যার অন্তর্ভুক্ত এই সমগ্র বিশ্ব) শ্রী সাইবাবার মধ্যে আবির্ভূত হয়। এই অমূল্য রত্ন কেবল সৎ ও ভাগ্যবান ভক্তরাই প্রাপ্ত করে। যাঁরা শ্রী সাইবাবাকে কেবল সামান্য পুরুষ রূপে জেনেছেন, তাঁরা অবশ্যই অভাগা।

শ্রী সাইবাবার মা-বাবা ও তাঁর জন্মতিথির বিষয় ঠিক-ঠিক খবর কেউই জানে

না। তবুও তাঁর শিরডী অবস্থানের মাধ্যমে অনুমানিক ভাবে সেটা নির্দ্ধারিত করা যেতে পারে। যখন প্রথম-প্রথম উনি শিরডী আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল কেবল ১৬ বছর। শিরডীতে তিন বছর থাকার পর কিছু সময়ের জন্য অন্তর্হিত হন। কিছুকাল পর ঔরঙ্গাবাদের কাছে (নিজাম স্টেটে) আবির্ভূত হন এবং চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে আবার শিরডী আসেন। সেই সময় তাঁর বয়স হবে প্রায় ২০ বছর। তিনি ৬০ বছর শিরডীতে ছিলেন এবং ১৯১৮ সালে মহা সমাধিতে লীন হয়ে যান। এই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর জন্ম ১৮৬৮ সালে হয়েছিল।

বাবার জীবনের লক্ষ্য এবং উপদেশ ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬০৮-১৬৮১) সন্ত রামদাসের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি মুসলমানদের দিয়ে গরু এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করান। কিন্তু দু শতাব্দী পরই হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ-বৈষম্য বেড়ে যায় এবং এটাই দূর করা জন্য শ্রী সাইবাবা আবির্ভূত হন। তিনি সবাইকে একটাই উপদেশ দিতেন- "রাম (হিন্দুদের ভগবান) এবং রহীম (মুসলমানদের খোদা) একই এবং তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিতমাত্র প্রভেদ নেই। তবে কেন তাদের ভক্তরা পৃথক হয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে? দুই সম্প্রদায় এক হয়ে মিলে-মিশে থাকো। শান্ত চিত্তে থেকে রাষ্ট্রীয় একতার লক্ষ্য প্রাপ্ত করো। কলহ ও বিবাদ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। তাই লড়াই-ঝগড়া কোর না এবং পরস্পর প্রাণঘাতক হয়ো না। সব সময় নিজের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা চিন্তা করো। শ্রীহরি তোমাদের রক্ষা নিশ্চয়ই করবেন। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার অনেক পথ আছে যেমন, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা, জ্ঞান ইত্যাদি। যদি তুমি কোন রকম ভাবেই সফল সাধক না হতে পারো, তাহলে তোমার জন্ম বৃথা। যে যতই তোমার নিন্দে করুক, তুমি তার প্রতিবাদ কোর না। যদি কোন ভালো কাজ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে সর্বদা অন্যের উপকার করো।" সংক্ষেপে সাইবাবার এই বক্তব্যই ছিল যে, উপরোক্ত আদেশানুসারে আচরণ করলে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই তোমার উন্নতি হবে।

সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজ ঃ-

গুরু তো অনেক আছে। কিছু গুরু এমন দেখা যায়, যারা হাতে বীণা নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়ায় এবং নিজেদের ধার্মিকতা প্রদর্শিত করে। শিষ্যদের কানে মন্ত্র ফুঁকে তাদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। ওরা শুধু ভক্তি ও ধার্মিকতার ভাব দেখায়। বস্তুতঃ তারা অপবিত্র ও অধার্মিক। শ্রী সাইবাবার মনে লোকেদের সামনে ধার্মিক নিষ্ঠা

প্রদর্শন করার বিচার কখনোই আসেনি। দৈহিক আড়ম্বর তাঁকে কিঞ্চিৎমাত্র ছুঁতে পারেনি। কিন্তু ভক্তদের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ ছিল। গুরু দুরকমের হন- ১) নিয়ত বা নির্দ্দিষ্ট ২) অনিয়ত বা অনির্দ্দিষ্ট। অনিয়ত গুরুর উপদেশ পালন করলে আমাদের উত্তম গুণগুলির বিকাশ হয় এবং মন শুদ্ধ হয়ে বিবেকের বৃদ্ধি হয়। উনি ভক্তিপথে লোকেদের প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু নিয়ত গুরুর সংস্পর্শে এলেই দ্বৈত বুদ্ধি হ্রাস পেয়ে যায়। গুরু আরো অনেক ধরনেরও হয়, যারা বিভিন্ন প্রকারের সাংসারিক শিক্ষা প্রদান করে। যিনি আমাদের আত্মস্থিত করে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেন, তিনিই আমাদের সদ্‌গুরু। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই সদ্‌গুরু। তাঁর মহানতা অবর্ণনীয়। যে ভক্তরা বাবার দর্শন করতে আসত, তাদের প্রশ্ন করার আগেই বাবা ওদের সমস্ত জীবনের ত্রৈকালিক ঘটনাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে দিতেন। তিনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতেন। শত্রু-মিত্র তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিঃস্বার্থ ও দৃঢ় ছিলেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। তিনি কখনও সংশয়গ্রস্ত হন নি। দেহধারী হয়েও তাঁর দেহের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র আসক্তি ছিল না। দেহটি ছিল তাঁর জন্য একটা আবরণ মাত্র। তিনি তো নিত্যমুক্ত ছিলেন। সেই শিরডীবাসীরা ধন্য, যাঁরা শ্রী সাইবাবার ঈশ্বর রূপে উপাসনা করেছেন। উঠতে-বসতে, খেতে-পরতে, মাঠে বা বাড়ীতে যে কোনই কাজ করুন না কেন, তাঁরা সর্ব্বদাই ওঁকে স্মরণ ও তাঁর গুণগান করতেন। শ্রী সাইবাবা ছাড়া অন্য কোন ভগবানকে ওঁরা মানতেন না। শিরডীর নারীদের প্রেমের মাধুর্য্যের কথা তো বলাই যায় না। ওঁরা ছিলেন একেবারেই সরল ও সাদাসিধে। পবিত্র প্রেম ওঁদের গ্রাম্য ভাষায় ভজন লেখার প্রেরণা দিত। যদিও ওঁরা শিক্ষিত ছিলেন না, তবুও ওঁদের সরল ভজনের মাধ্যমে প্রকৃত কাব্যের ঝিলিক পাওয়া যেত। ওঁদের শুদ্ধ প্রেমই এই ধরনের কবিতার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিতা তো সত্য প্রেমেরই স্বরূপ। সর্বসাধারণের জন্য এই রকম লৌকিক গান অত্যাবশ্যক। হয়তো ভবিষ্যতে বাবার কৃপায় কোন ভাগ্যশালী ভক্ত গীত সংগ্রহের ভার নিয়ে এই গানগুলিকে সাইলীলা পত্রিকাতে কিংবা পুস্তক রূপে প্রকাশ করবেন।

বাবার বিনয় ঃ-

বলা হয় যে ভগবানের মধ্যে ছয় প্রকারের বিশেষ গুণ পাওয়া যায় - যেমন ১) কীর্তি ২) শ্রী ৩) বৈরাগ্য ৪) জ্ঞান ৫) ঐশ্বর্য্য এবং ৬) উদারতা। শ্রী সাইবাবার মধ্যে এই সব গুণগুলি বিদ্যমান ছিল। তিনি ভক্তদের ইচ্ছাপূর্তির জন্যই সগুণ অবতার ধারণ করেছিলেন। তাঁর কৃপা (দয়া) বড়ই বিচিত্র। ভক্তদের জন্য নিজের শ্রীমুখ থেকে

এমন বাক্য বলতেন, যার বর্ণনা করতে মা সরস্বতীও সাহস করবেন না। তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। বাবা অতি বিনম্র হয়ে বলতেন- "দাসানুদাস আমি তোমার ঋণী।" এটা কি রকমের বিনয়? যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হত যে, বাবা বিষয় পদার্থ উপভোগ করছেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎমাত্রও ছিল না। তিনি খাবার তো নিশ্চয় খেতেন, কিন্তু তাঁর জিভে কোন স্বাদ ছিল না। তিনি চোখ দিয়ে দেখতেন, কিন্তু দৃশ্যের প্রতি কোন রুচি ছিল না। বাসনার ব্যাপারে তিনি হনুমানের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর কোন পদার্থের প্রতি আসক্তি ছিল না। তিনি ছিলেন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ যেখানে সমস্ত ইচ্ছা, অহংকার ও সব রকমের চেষ্টা লোপ পায়। সংক্ষেপে তিনি নিঃস্বার্থ, মুক্ত এবং পূর্ণ ব্রহ্ম ছিলেন। এই কথাটি বোঝাবার জন্য একটি উৎকৃষ্ট ঘটনা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে।

নানাবলী ঃ-

শিরডীতে নানাবলী নামে এক বিচিত্র ব্যক্তি থাকত। বাবার সব কাজের দেখাশোনার ভার তার উপর ছিল। একবার যে সময় বাবা নিজের আসনে বসেছিলেন, নানাবলী তাঁর কাছে এসে জানায় যে, সে স্বয়ং ঐ আসনের উপর বসতে চায়। তাই সে বাবাকে সেখান থেকে সরে যেতে বলল। বাবা তক্ষুনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং নানাবলী সেখানে গিয়ে বসে। একটু পরে সে সেখান থেকে উঠে বাবাকে নিজের স্থান গ্রহণ করতে বলে। বাবা আবার নিজের আসন গ্রহণ করেন। এই দেখে নানাবলী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে। বাবা এই সমগ্র ব্যাপারটি দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রসন্ন হন নি।

সুগম পথ সাধু-সন্তদের কথা শ্রবণ ও সমাগম ঃ-

যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী সাইবাবার আচরণ সামান্য পুরুষদের মতই মনে হত কিন্তু তাঁর কর্মের মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যেত। তিনি কখনও নিজের ভক্তদের কোন প্রাণায়াম বা যোগাআসন বা বিশেষরকমের উপাসনার আদেশ দেননি। কখনও তাদের কানে মন্ত্র দেননি। ওঁর তো সবার জন্য একই মন্ত্র ছিল - **সব রকম চতুরতা ত্যাগ করে, সব সময় সাই-সাই স্মরণ করো। এই ধরনের আচরণ করলে সমস্ত বন্ধন কেটে যায় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।** পঞ্চাগ্নি, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা কেবল ব্রাহ্মণদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যান্য শ্রেণীর কাছে তা কার্যকরী নয়।
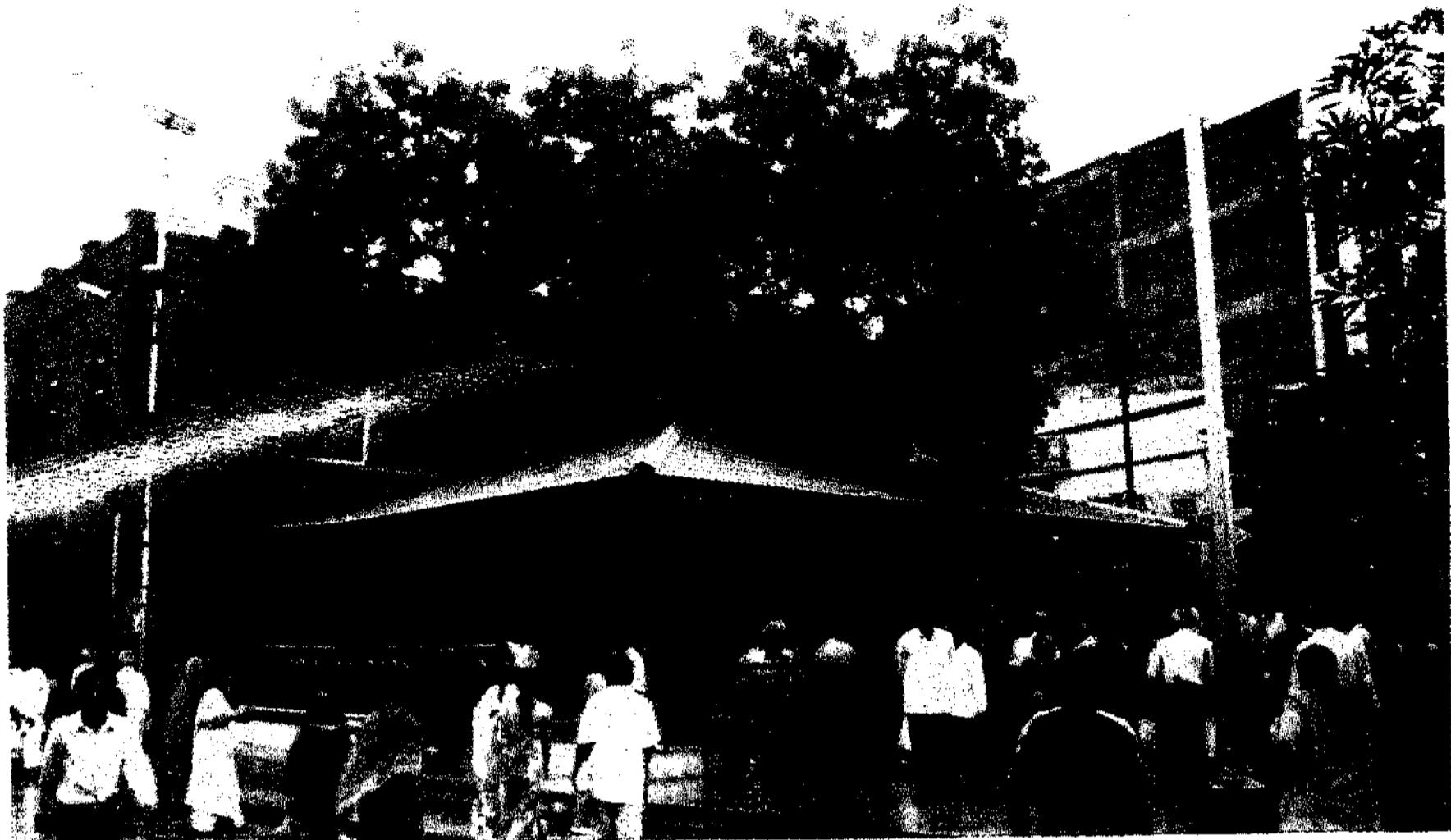
মনের কাজ হচ্ছে বিচার করা। বিচার না করে সে এক দণ্ডও থাকতে পারে
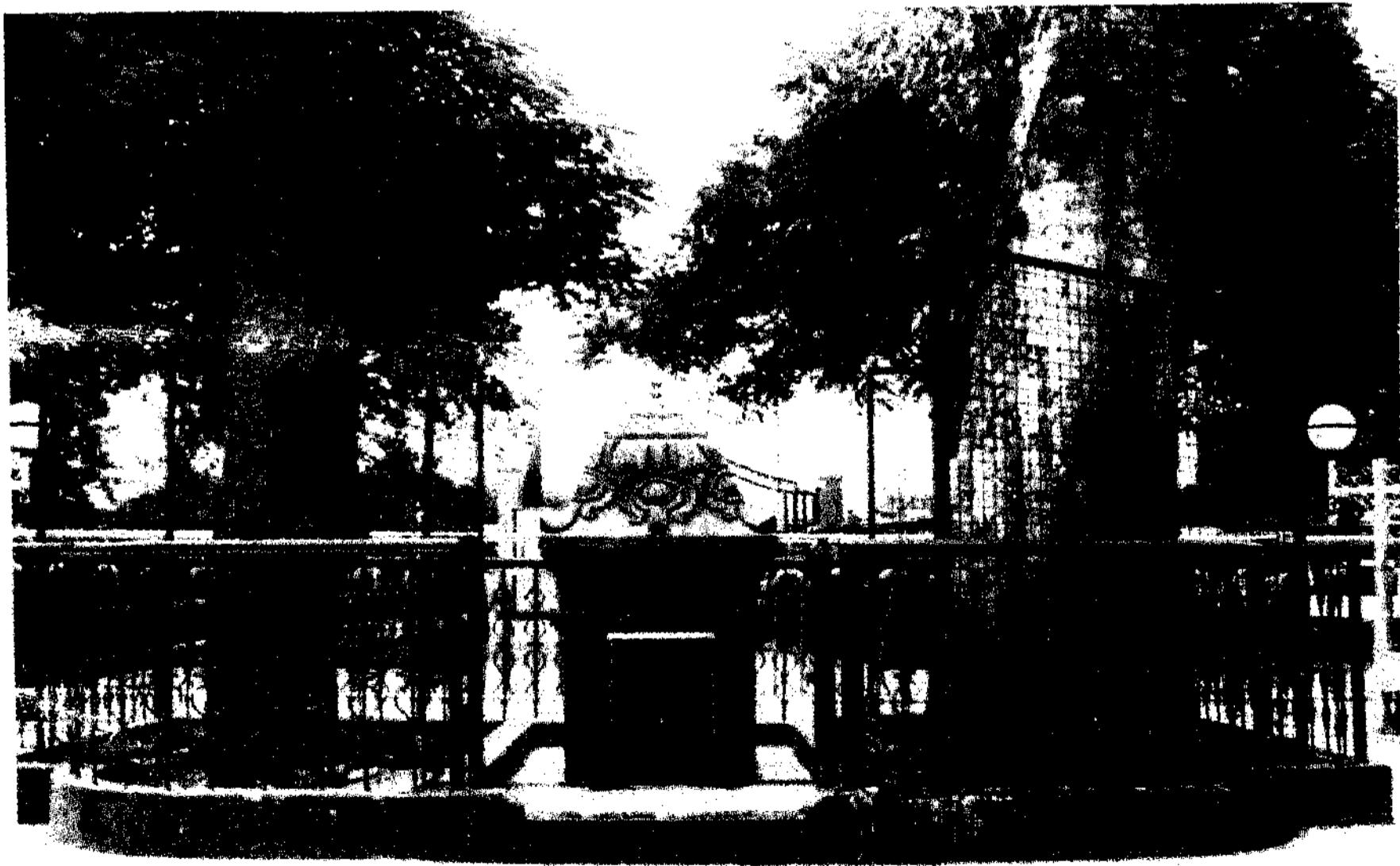
না। তাকে কোন বিষয়-বস্তুর সাথে সংলগ্ন করে দিলে মন তারই চিন্তন করে এবং যদি গুরুকে অর্পণ করে দাও, তাহলে তাঁরই চিন্তন করবে। আপনারা খুবই মন দিয়ে সাইয়ের মহানতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ করেছেন। এই কাহিনীগুলি সাংসারিক ভয় নির্মূল করে আধ্যাত্মিক পথে আরুঢ় করে দেয়। তাই এই কথাগুলি সর্বদাই শ্রবণ এবং মনন করবেন। আচরণেও এগুলি মনে রাখবেন। যদি এইগুলি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই নয়, বরং স্ত্রী ও অন্যান্য দলিত জাতিও শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে। সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থেকেও নিজের মনটা সাই ও তাঁর লীলাগানেই ডুবিয়ে রাখুন। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করবেন। এত সরল পথ হওয়া সত্ত্বেও সবাই এই পথ অবলম্বন করে না। ঈশ্বর কৃপার অভাবে সন্তদের কথা শোনার ইচ্ছে বা রুচি উৎপন্ন হয় না। তাঁর কৃপায় প্রত্যেক কাজ সুচারু ও সুন্দর ভাবে সফল হয়। সন্তদের কথা শ্রবণ করাই তাঁদের সান্নিধ্যের সমান এবং তার গুরুত্ব অনেক। এর দ্বারা দৈহিক বুদ্ধি, অহংকার এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি খুলে যায় এবং ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘটে। বিষয়বস্তু থেকে নিশ্চয়ই বিরক্তি বাড়ে, সুখ-দুঃখে সুস্থির থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং শেষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সুলভ হয়ে যায়। যদি আপনি কোন সাধনাই, যেমন- নাম স্মরণ, পূজো বা ভক্তি ইত্যাদি না করতে পারেন, অনন্য ভাবে কেবল সন্তের শরণাগত হয়ে যান, তাহলেও তিনি আপনাকে খুব সহজে ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন। এই কাজের নিমিত্তেই সন্তরা এই জগতে আবির্ভূত হন। পবিত্র নদীগুলি - গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি সংসারের সমস্ত পাপ ধুয়ে দেয়। কিন্তু তারাও সর্বদা কামনা করে যে, কোন মহাত্মা নিজের চরণ স্পর্শ দ্বারা তাদের পবিত্র করুন। সন্তদের মহিমাই এইরূপ। গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই শ্রী সাই চরণের প্রাপ্তি সম্ভব।

আমি শ্রী সাইয়ের মোহ বিনাশক চরণ ধ্যান করে এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি। তাঁর স্বরূপ কত সুন্দর ও মনোহর! মস্‌জিদের কোণে দাঁড়িয়ে 'উদী' বিতরণ করতেন। যিনি জগৎ মিথ্যা জেনে সব সময় আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন, সেই সচ্চিদানন্দ শ্রী সাই মহারাজের চরণ কমলে আমার বারম্বার প্রণাম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

গুরু স্থান

নন্দা দ্বীপ

চাওড়ী

দ্বারকামাঈ

অধ্যায় - ১১

সগুণ ব্রহ্ম শ্রী সাইবাবা, ডাক্তার পণ্ডিতের পূজো, হাজী সিদ্দীক ফালকে, তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ।

সগুণ ব্রহ্ম শ্রী সাইবাবা ঃ-

ব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ - নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুণ নিরাকার হয় ও সগুণ সাকার। যদিও দুটিই একই ব্রহ্মের দুই রূপ, তবুও কারো নির্গুণ উপাসনা তো কারো সগুণ উপাসনা রুচিকর মনে হয় - যেমনটি গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সগুণ উপাসনা সরল ও শ্রেষ্ঠ। মানুষের আকার আছে। তাই তার ঈশ্বরের সাকার উপাসনা স্বভাবতঃই সরল মনে হয়। কিছুকাল সগুণ উপাসনা না করলে প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি হয় না। যেমন-যেমন সগুণ উপাসনায় আমাদের উন্নতি হতে থাকে, তেমন-তেমন নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। তাই সগুণ উপাসনা দিয়েই শুরু করা উচিত। মূর্তি, বেদী, অগ্নি, আলো, সূর্য্য, জল এবং ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উপাসনার বস্তু হওয়া সত্বেও সদ্‌গুরুই এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রী সাইয়ের স্বরূপ চোখের সামনে আনুন-যিনি বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি এবং অনন্যয়ী শরণাগত ভক্তদের আশ্রয়দাতা। তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর পূজোর সংকল্পের দ্বারাই সমস্ত ইচ্ছা আপনা-আপনি পূরন হয়ে যায়।

কেউ-কেউ শ্রী সাইবাবাকে এক 'ভগবৎভক্ত' বা 'মহাভক্ত' বলেই মানত বা মানে। কিন্তু আমাদের জন্য তো উনি ঈশ্বরাবতার। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, শান্ত ও সরল ছিলেন, যার কোন উপমাই দেওয়া যায় না। যদিও তিনি দেহধারী ছিলেন, কিন্তু আসলে নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত ও নিত্যমুক্ত। গঙ্গা নদী সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথে গ্রীষ্মের উষ্ণতার দ্বারা আক্রান্ত প্রাণীদের শীতলতা প্রদান করে সুখী করে। ঠিক সেই রকমই শ্রী সাই জীবিত কালে অন্যদের সান্ত্বনা ও সুখ প্রদান করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন- "সন্তই আমার আত্মা।" এই অবর্ণনীয় ঈশ্বরীয় শক্তিগুলি - সত্, চিত্ত, আনন্দ শিরডীতে সাই রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় উপনিষদ) ব্রহ্মকে 'আনন্দ' বলা হয়েছে। আজ অবধি এ কথা কেবল বইতেই পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু ভক্তগণ

শিরডীতে এই আনন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। বাবা সবার আশ্রয়দাতা ছিলেন, তাঁর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হত না। তাঁর বসার জন্য ভক্তগণ একটা মোলায়েম (নরম) আসন ও একটা বড় বালিশ রাখত। বাবা ভক্তদের মনোভাব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদের ইচ্ছানুসারে পূজানাদি করাতে কোন রকম আপত্তি করতেন না। কেউ আতর ও চন্দন লাগাত তোকেউ সুপূরী-পান ও অন্যান্য বস্তু অর্পণ করত, কেউ বা নৈবেদ্য। যদিও দেখে মনে হত যে শিরডীই তাঁর বাসস্থান, কিন্তু আসলে তিনি তো ছিলেন সর্বব্যাপী। এইরূপ সর্বব্যাপী গুরুদেবের চরণে আমার বারম্বার প্রণাম।

ডাক্তার পণ্ডিতের ভক্তি ঃ-

একবার শ্রী তাত্য়া নুলকরের বন্ধু ডাক্তার পণ্ডিত বাবার দর্শনার্থে শিরডী আসেন। বাবাকে প্রণাম করে উনি মস্জিদে কিছুক্ষণ বসেন। বাবা ওঁকে শ্রী দাদাভট্ট কেলকরের বাড়ী যেতে বলেন, যেখানে ওঁর খুব ভালো অভ্যর্থনা হয়। তারপর দাদাভট্ট ও ডাক্তার পণ্ডিত একসাথে বাবার পূজোর জন্য মস্জিদে পৌঁছন। প্রথমে দাদাভট্ট বাবার পূজো করেন। বাবার পূজো-অর্চনা তো প্রায় সবাই করত, কিন্তু তাঁর শুভমস্তকে চন্দন লাগাবার সাহস কখনো কারো হয়নি। শুধু মহালসাপতি তাঁর গলায় চন্দন লাগাতেন। কিন্তু সেদিন ডাক্তার পণ্ডিত পূজোর থালা থেকে চন্দন নিয়ে বাবার কপালে ত্রিপুণ্ডাকার এঁকে দেন। বাবা একটি শব্দও বললেন না। ভক্তরা অবাক হয়ে এই দৃশ্যটি দেখল। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার ভট্ট আর থাকতে না পেরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি তো কাউকে কপালে চন্দন লাগাতে দেন না, কিন্তু ডাক্তার পণ্ডিতকে কেন কিছু বললেন না?" বাবা এর উত্তরে বললেন- "ডাক্তার পণ্ডিত তাঁর গুরু শ্রী রঘুনাথ মহারাজ ধোপেশ্বরকে (উনি কাকা পুরানীকের নামে প্রসিদ্ধ) যেরূপ চন্দন লাগাতেন, ঠিক সেই ভাবনায় বশীভূত হয়ে আমার কপালে চন্দন লাগান। এবার বলো, আমি কি করে তাঁকে বাধা দিতাম?" ডাক্তার পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি দাদাভট্টকে বললেন- "আমি বাবাকে নিজের গুরু কাকা পুরানীকের ন্যায় মেনে তাঁকে চন্দন লাগিয়ে ছিলাম, যে রূপ আমি আমার গুরুকে লাগাই।"

যদিও বাবা ভক্তদের তাদের ইচ্ছেমত পূজো করতে দিতেন, তবুও কখনো-কখনো তাঁর ব্যবহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হত। যখন তিনি পূজোর থালা ফেলে দিয়ে রুদ্রাবতার ধারণ করতেন, তখন তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস কারো হত না। কখনো তিনি ভক্তদের বকতেন, তো কখনো মোমের চেয়েও নরম হয়ে শান্তি ও ক্ষমামূর্তির ন্যায় ব্যবহার করতেন। কখনো-কখনো রাগে কাঁপতেন ও তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে

যেত, তবুও তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও মাতৃস্নেহের স্রোত বইত। ভক্তদের কাছে ডেকে বলতেন যে তিনি তো জানতেই পারেননি যে, কোন্ সময় তিনি তাদের উপর রেগে উঠেছিলেন। বাবা সমুদ্রের ন্যায় ভক্তরূপী নদীগুলির উপর রাগ করে কখনো কি তাদের ফিরিয়ে দিতে পারেন বা তাদের উপেক্ষা করতে পারেন? তিনি তো ভক্তদের কাছেই থাকেন ও ভক্তরা যখন তাঁকে ডাকে তিনি তক্ষুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে যান। তিনি সর্বদাই ভক্তদের ভালবাসার পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকেন।

হাজী সিদ্দীক ফালকে ঃ-

কখন শ্রী সাইবাবা কোন্ ভক্তকে নিজের কৃপাছায়ায় টেনে নেবেন সেটা কেউই বলতে পারত না। এটা শুধুমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করত। হাজী সিদ্দীক ফালকের কাহিনী এই সত্যেরই একটি উদাহরণ। কল্যাণনিবাসী এক মুসলমান, যাঁর নাম সিদ্দীক ফালকে ছিল, মক্কা শরীফের 'হজ' যাত্রা করে শিরডী আসেন। তিনি চাওড়ীর উত্তর দিকে থাকতে শুরু করেন। মস্‌জিদের সামনে খোলা উঠোনটায় বসতেন। বাবা ওঁকে ন'মাস মস্‌জিদে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি। এমনকি মস্‌জিদের সিঁড়িও চড়তে দেননি। ফালকে খুবই নিরাশ হন এবং উনি এটা ভেবে উঠতে পারেন না যে কোন্ উপায় কার্য্যকরী হতে পারে। লোকেরা ওঁকে নিরাশ না হয়ে বাবার অন্তরঙ্গ ভক্ত শামার সাহায্যে বাবার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করতে বলে। যেভাবে ভগবান শিবের দরবারে পৌঁছনোর জন্য নন্দীর কাছে যাওয়া আবশ্যক, তেমনি বাবার কাছেও শামার মাধ্যমেই যাওয়া উচিত। ফালকের এই পরামর্শটি ভালো লাগে এবং উনি শামাকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেন। শামাও তাঁকে আশ্বাস দেন এবং সুযোগ পেয়ে বাবাকে বললেন- "বাবা, আপনি এই বুড়ো হাজীকে মস্‌জিদে কেন ঢুকতে দিচ্ছেন না? কত ভক্ত ইচ্ছেমত আপনার দর্শন করতে আসে-যায়। কিছু না হোক, একবার ওঁকে আশীষ তো দিয়ে দিন।" বাবা বললেন- "শামা, তুমি এখনো অবুঝ আছো। যদি ফকির (আল্লাহ) অনুমতি না দেন, তাহলে আমিই বা কি করি? তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ এই মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়তে পারে না। আচ্ছা ওকে জিজ্ঞেসা করো, যে ও কি দ্বাদশ কূপের কাছে নীচু সংকীর্ণ রাস্তাটায় আমার সাথে দেখা করতে পারে?" শামা সম্মতিসূচক উত্তর নিয়ে ফেরেন। তখন বাবা আবার শামাকে বলেন- "ও কি আমায় চারটে কিস্তিতে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজী আছে?" শামা এই উত্তর নিয়ে ফেরেন যে, আপনি যদি চল্লিশ লাখ টাকাও চান তো দিতে রাজী আছি। "আমি একটা পাঁঠা কাটতে চাই, ওকে জিজ্ঞাসা করো যে, ও তার মাংস খেতে চায় না তার অণ্ডকোষ?" শামা এসে

জানান যে, বাবার খাবার পাত্র থেকে একটি গ্রাস পেলেই হাজী নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। এই উত্তরটি শুনে বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং মাটির ঘড়াটা ফেলে দিয়ে নিজের কফ্নীটা (খাপনি) উপরে উঠিয়ে সোজা হাজীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। "শুধু-শুধু নমাজ কেন পড়ো? নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন কেন করো? এ রকম বৃদ্ধ হাজীদের মত বেশভূষা কেন ধারণ করে আছো? এই রকম কোরান পড়েছ তুমি? তোমার নিজের মক্কা যাত্রার অহংকার হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি এখনো আমায় চেনোনি।" এই ভাবে বকুনি খেয়ে হাজী ঘাবড়ে গেল। বাবা মস্জিদে ফিরে আসেন এবং কিছু আমের টুকরী কিনে হাজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই বাবা হাজীকে ভালবাসতে শুরু করেন এবং একত্রে বসে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতেন। এবার হাজীও নিজের ইচ্ছানুযায়ী মস্জিদে আসা-যাওয়া শুরু করেন। কখনো-কখনো বাবা ওঁকে কিছু টাকাও দিতেন। এই ভাবে হাজী বাবার দরবারে সম্মিলিত হয়ে যান।

বাবার তত্ব (প্রকৃতির শক্তি) নিয়ন্ত্রণ ঃ-

বাবার তত্ত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ স্বরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে -

১) একবার সন্ধ্যার সময় শিরডীতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। আকাশ ঘন ও কালো মেঘে ঢাকা ছিল। খুব জোরে হাওয়া বইছিল এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই শুধু জল। সব পশু-পাখী ও শিরডীবাসীরা ভয়ানক ভয় পেয়ে মস্জিদে একত্রিত হয়েছিল। শিরডীতে গ্রামদেবী তো অনেক আছেন, কিন্তু ঐ দিন সাহায্য করতে কেউ এলেন না। তাই সবাই নিজেদের ভগবান শ্রী সাইকে, যিনি শুধু তাদের ভক্তি একান্ত ভাবে কামনা করতেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা করে। বাবা তাদের ভক্তিতে মুগ্ধ ও বিচলিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। মস্জিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে, মেঘের দিকে তাকিয়ে, গম্ভীর স্বরে বলেন- "ব্যস্, এবার শান্ত হও।" কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টির জোর কম হয়ে পড়ে এবং ঝড় শান্ত হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ দেখে সব লোকেরা প্রসন্ন মনে নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

২) আরেক দিন মধ্যাহ্নের সময় ধুনির আগুন এতো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে নিয়েছিল যে অগ্নিশিখা ছাদ ছুঁতে লাগল। মস্জিদে উপস্থিত লোকেরা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, জল ঢেলে ধুনির আগুন শান্ত করে দেওয়া উচিত অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। বাবাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো ছিল না।

কিন্তু বাবা শীঘ্রই পরিস্থিতিটি জানতে পেরে যান। তিনি নিজের দণ্ডটি উঠিয়ে সামনের থামের উপর সজোরে আঘাত করে বলতে লাগলেন- "নীচে নামো ও শান্ত হয়ে যাও।" প্রত্যেক আঘতের প্রভাবে শিখাগুলির প্রচণ্ডতা কম হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুনি শান্ত ও আগের রূপ ধারণ করে। শ্রী সাই ঈশ্বরের অবতার। যে তাঁর সামনে নত হয়ে তাঁর শরণে যাবে, তিনি তার উপর অবশ্যই কৃপা করবেন। যে ভক্ত এই অধ্যায়ের কাহিনীগুলি প্রতিদিন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পাঠ করবে, সে দুঃখ হতে শীঘ্রই পরিত্রাণ পাবে। শুধু তাই নয়, সে সর্বদাই শ্রী চরণে লিপ্ত থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন প্রাপ্ত হয়ে তার সমস্ত ইচ্ছে পুরণ হয়ে যাবে এবং এই রূপ সে নিষ্কাম হয়ে যাবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১২

১) কাকা মহাজনী ২) ধূমাল উকিল ৩) শ্রীমতি নিমোনকর ৪) নাসিকের মূলে শাস্ত্রী ৫) একটি ডাক্তারের অভিজ্ঞতা (বাবার লীলার)

বাবা ভক্তদের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎকার করতেন এবং কিরূপ ব্যবহার করতেন, তার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

সন্তদের কার্য্য ঃ-

ঈশ্বরীয় অবতারদের উদ্দেশ্য সাধুজনদের পরিত্রাণ এবং দুষ্টদের সংহার করা। কিন্তু সৎপুরুষদের কার্য্য তো একেবারেই ভিন্ন। সন্তদের জন্য সাধু ও দুষ্ট প্রায় একরূপ। আসলে দুষ্কর্ম যারা করে, তাদের জন্যই তাঁদের বেশী চিন্তা এবং তাদের ঠিক পথে নিয়ে আসাটা তাঁদেরই কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ভবসাগরের দুঃখ শুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগস্ত্য মুনি এবং অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ করার জন্য সূর্য্যের সমান। সন্তদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব বাস করেন। তাঁরা বাসুদেব থেকে পৃথক নন। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই অবতার, যিনি শুধু ভক্তদের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞান-জ্যোতিস্বরূপ ও তাঁর দিব্যপ্রভা অপূর্ব। তাঁর কাছে শত্রু, মিত্র, রাজা, ভিক্ষুক সবাই সমান। পাঠকগণ, এবার মন দিয়ে তাঁর কীর্তি শ্রবণ করুন। বাবা ভক্তদের জন্য নিজের দিব্য গুণ সমূহ পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করতেন এবং সদৈব তাদের সাহায্য করার জন্য তৎপর থাকতেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাঁর কাছে পৌছতে পারত না। ওদের শুভ কর্ম উদিত না হয়ে থাকলে বাবার স্মৃতি বা তাঁর লীলা গান তাদের কান পর্যন্ত পৌছতে পারত না। তাহলে বাবার দর্শনের অভিলাষ মনে উৎপন্ন হওয়া কিভাবে সম্ভব হত? অনেক লোকেদের শ্রী সাইবাবার দর্শনের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমাধি পর্যন্ত কোন সংযোগ ঘটেনি। অতএব এরকম লোকেরা যাঁরা বাবার দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত রয়ে গেছেন, তাঁরা যদি শ্রদ্ধাপূর্বক সাই লীলাগুলি শ্রবণ (বা পাঠ) করেন, তাহলে তাঁদের সাই দর্শনের সেই ইচ্ছে অনেকাংশে তৃপ্ত হয়ে যাবে। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁরা কোন প্রকারে বাবার কাছে গিয়ে তাঁর দর্শন পেতেন, তাঁরাও বেশীদিন সেখানে থাকতে পারতেন না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেবল বাবার আদেশ কাল অবধি সেখানে

থাকতেন এবং আদেশ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্থান ছেড়ে দিতে হত। অতএব এসব তাঁর শুভ ইচ্ছার উপরই নির্ভর করত।

কাকা মহাজনী ঃ-

এক সময় কাকা মহাজনী বম্বে থেকে শিরডী যান। ওঁর ইচ্ছে ছিল এক সপ্তাহ সেখানে থেকে গোকুল অষ্টমীর উৎসবে সম্মিলিত হবেন। দর্শনের পর বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কবে যাচ্ছো?" প্রশ্নটা শুনে কাকা মহাজনী একটু আশ্চর্য্যই হন। উত্তর দেওয়া তো একটা দিতেই হবে। তাই উনি বলেন- "যখন বাবা আজ্ঞা করবেন।" বাবা পরের দিনই ফিরে যেতে বলেন। বাবার এক-একটি শব্দ আইনের মত মানা হত এবং সেগুলি অলঙঘ্যনীয়। কাকা মহাজনী আদেশনুসারে সেখান থেকে রওনা হয়ে যান। বম্বেতে অফিস পৌঁছে দেখেন যে, তাঁর শেঠ তার জন্য অতি উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর ম্যানেজার অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুণ কাকার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেঠ শিরডীতে কাকার নামে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, সেটা বম্বের ঠিকানায় ওঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভাউ সাহেব ধূমাল ঃ-

এবার একটা বিপরীত ঘটনা শুনুন। একবার ভাউ সাহেব একটি মোকদ্দমার ব্যাপারে নিফাড়ের আদালতে যাচ্ছিলেন। পথে উনি শিরডীতে নামেন। বাবার দর্শন করেই তক্ষুনি নিফাড়ের জন্য রওনা হতে উদ্যত হন, কিন্তু বাবার অনুমতি পান না। বাবা ওঁকে শিরডীতে আরো এক সপ্তাহ থাকতে আদেশ দেন। এর মধ্যে নিফাড়ের ম্যাজিস্ট্রেট পেটের কষ্টে অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েন। তাই ভাউয়ের মোকদ্দমার দিন পেছিয়ে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পর ভাউসাহেব রওনা হওয়ার অনুমতি পান। এই মোকদ্দমার শুনানি কয়েকমাস ধরে চলে ও চারজন বিচারকের সামনে প্রস্তুত করা হয়। অবশেষে ধূমাল মোকদ্দমাটি জিতে যান এবং ওঁর মক্কেল নির্দোষ ঘোষিত হয়।

শ্রীমতি নিমোনকর ঃ-

অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী নানাসাহেব নিমোনকর, এক সময় নিজের স্ত্রীর সাথে শিরডীতে এসে থাকছিলেন। নিমোনকর ও তাঁর স্ত্রী অনেকটা সময় বাবার সেবায় ও পবিত্র সঙ্গতিতে কাটাতেন। একবার এমন হলো যে, ওঁদের পুত্র বেলাপুরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই শ্রীমতি নিমোনকর সেখানে গিয়ে ছেলেকে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের

সাথে দেখা করে কিছুদিন সেখানে থেকে আসবেন - এমনটি মনে-মনে ঠিক করেন। কিন্তু শ্রী নিমোনকর তাঁকে পরের দিনই ফিরে আসতে বলেন। শ্রীমতি নিমোনকর একটু সমস্যায় পড়ে যান। কিন্তু বাবা উপায় জুটিয়ে দেন। সাঠেওয়াড়ার কাছে বাবা নানাসাহেব ও আরো কিছু ভক্তদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমতি নিমোনকর বাবার চরণ বন্দনা করে প্রস্থান করার অনুমতি চান। বাবা বলেন- "তাড়াতাড়ি যাও, ঘাবড়াবার কিছু নেই। শান্ত মনে বেলাপুরে চারদিন আনন্দ করে থেকে, সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে তারপরই শিরডী ফিরো।" বাবার শব্দগুলি কত সময়োপযোগী হয়েছিল! শ্রী নিমোনকরের আদেশ বাবা খারিজ করে দেন।

নাসিকের মূলে শাস্ত্রী জ্যোতিষী ঃ-

নাসিকে এক কর্মনিষ্ঠ, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওঁর নাম ছিল মূলে শাস্ত্রী। উনি ছটি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন ও জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রেও ওঁকে পটু মানা হত। উনি একবার নাগপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রী বাপু সাহেব বুটী ও অন্যান্য ভক্তদের সাথে বাবার দর্শন করতে যান। বাবা অনেক রকম ফল কিনে মস্‌জিদে উপস্থিত লোকেদের সেগুলি বিতরণ করছিলেন। এমন সুন্দর ভাবে আমগুলি চারদিক দিয়ে টিপতেন যে, চোসামাত্রই সমস্ত রসটা মুখে এসে যেত। আঁটি ও খোসা সহজেই আলাদা হয়ে যেত। বাবা কলার খোলা ছাড়িয়ে সব ভক্তদের দিলেন ও খোসাগুলি নিজের কাছে রেখে নিলেন। মূলে শাস্ত্রী বাবার হাত দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু বাবা ওঁর অনুরোধে কান না দিয়ে ওঁকে চারটে কলা দেন। এরপর সবাই ওয়াড়ায় ফিরে আসে। এবার মূলে শাস্ত্রী স্নান করে পূজোর জোগাড় শুরু করেন। বাবাও নিজের নিয়মানুসারে 'লেণ্ডী'-র দিকে বেরিয়ে পড়েন। যেতে-যেতে উনি বলেন- "কিছু গেরুয়া রং আনো, আজ আমার বস্ত্র গেরুয়া রঙ করব।" বাবার কথার অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ পর বাবা ফিরে আসেন। দুপুরের আরতির জোগাড় চলছিল। বাপু সাহেব যোগ মূলেকে আরতির সময়ে যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করেন। তাতে মূলে জানান যে উনি সন্ধ্যার সময় বাবার দর্শন করতে যাবেন। তখন যোগ একলাই প্রস্থান করেন। বাবা আসনে বসতেই ভক্তরা পূজো আরম্ভ করে দেয়। এবার আরতি শুরু হয়ে যায়। বাবা হঠাৎ বলেন- "ঐ ব্রাহ্মণটির কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা আনো।" বুটী স্বয়ং দক্ষিণা নিতে যান এবং বাবার বার্তা মূলে শাস্ত্রীর কাছে প্রকাশ করেন। মূলে শাস্ত্রী বেশ ঘাবড়ে যান-"আমি তো এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, আমার কি দক্ষিণা দেওয়া উচিত হবে? যদিও বাবা এক মহান সন্ত, কিন্তু আমি তো তাঁর শিষ্য নই।" তবুও ওঁর মনে হয়

যে, যখন বাবার ন্যায় মহান সন্ত দক্ষিণা চাইছেন ও বুটীর মতন এক লক্ষপতি লোক সেটা নিতে এসেছেন, তখন সেটা অগ্রাহ্য করা যায় না। এই ভেবে নিজের কৃত্যটি অপূর্ণ রেখেই বুটীর সঙ্গে মস্‌জিদে গিয়ে পৌছন। নিজেকে পবিত্র ও মস্‌জিদ অপবিত্র- এই ভেবে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখান থেকেই হাত জুড়ে বাবার উপর ফুল ফেলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড। হঠাৎ দেখেন বাবার জায়গায় সেই আসনে বিরাজমান ওঁর গুরু কৈলাশবাসী ঘোলপ স্বামীকে। নিজের গুরুকে ওখানে দেখে উনি খুঁব আশ্চর্যান্বিত হন। 'এটা কোন স্বপ্ন নয় তো? না। না! এটা স্বপ্ন নয়। আমি তো সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত। কিন্তু আমার গুরু মহারাজ এখানে কি করে পৌছলেন?' কিছুক্ষণ তো ওঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোয় না। উনি নিজেকে চিমটি কাটেন এবং আবার সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করেন। কিন্তু তবুও বুঝতে পারেন না যে, ওঁর কৈলাসবাসী গুরু ঘোলপ স্বামী মস্‌জিদে কি করে পৌছলেন? তারপর সমস্ত সন্দেহ মিটিয়ে এগিয়ে যান এবং 'গুরু-র' চরণে পড়ে হাত জুড়ে স্তুতি করতে শুরু করেন। অন্যান্য ভক্তরা বাবার আরতি গাইছিল, কিন্তু মূলে শাস্ত্রী নিজের গুরুর নামের গর্জনা করছিলেন। এবার সব জাত-পাতের অহংকার এবং পবিত্রতা-অপবিত্রতার কল্পনা ত্যাগ করে উনি গুরুর শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখেন বাবা দক্ষিণা চাইছেন। বাবার আনন্দস্বরূপ এবং তাঁর অনির্বচণীয় শক্তি দেখে মূলে শাস্ত্রী আত্ম বিস্মৃত হয়ে যান। ওঁর আনন্দের সীমা রইল না। চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে আনন্দে নাচছিল। বাবাকে পুনঃ নমস্কার করে এবং দক্ষিণা দিয়ে উনি বলেন- "আমার সব সংশয় আজ দূর হয়ে গেছে। আজ আমি আমার গুরুর দর্শন পেয়েছি।" বাবার এই অদ্ভুত লীলা দেখে ভক্তগণ ও মূলে শাস্ত্রী বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান। "গেরুয়া রং আনো - আজ গেরুয়া বস্ত্র রঙ করা হবে" - বাবার এই শব্দগুলির অর্থ এবার সবাই বুঝতে পারল। এমন অদ্ভুত মহিমা ছিল শ্রী সাইবাবার।

ডাক্তার ঃ-

একবার এক মাম্‌লৎদার নিজের এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে শিরডী আসেন। ডাক্তারের বক্তব্য ছিল- "শ্রীরাম আমার ইষ্টদেব। আমি কোন মুসলমানের সামনে নতমস্তক হব না। অতএব আমি শিরডী যেতে রাজী নই।" মাম্‌লৎদার ওঁকে বোঝান- "প্রণাম করতে তোমায় কেউ বাধ্য করবে না। অতএব তুমি আমার সাথে চলো, ভালো লাগবে।" শিরডী পৌছে ওঁরা বাবার দর্শন করতে যান। কিন্তু ডাক্তারকেই সব থেকে আগে এগিয়ে যেতে এবং সর্বাগ্রে বাবার চরণ বন্দনা করতে দেখে সবার খুব

আশ্চর্য্য লাগে। লোকেরা আর থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করে বসে যে, ওঁর হৃদয় পরিবর্তন কিভাবে ঘটল? একজন মুসলমানকে কি করে প্রণাম করে ফেললেন? ডাক্তার জানান যে, উনি বাবার স্থানে নিজের ইষ্টদেব শ্রীরামের দর্শন পেয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। এইরূপ বলতে-বলতেই পুণঃ শ্রী সাইবাবাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেন। উনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেন-"এটা কি স্বপ্ন? ইনি তো পূর্ণ যোগ অবতার।" পরের দিন থেকে উনি উপবাস শুরু করেন এবং এই স্থির করেন যে যতক্ষন বাবা নিজে ডেকে আশীর্বাদ না দেবেন, ততক্ষন মস্‌জিদে কদাপি যাবেন না। এই ভাবে তিনদিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন ওঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খানদেশ থেকে শিরডী আসেন। ওঁরা দুজনে বাবাকে দর্শন করতে মস্‌জিদে এলেন। প্রণাম ইত্যাদি হওয়ার পর বাবা ডাক্তারকে বলেন- "আপনাকে ডাকবার কষ্ট কে করল? আপনি এখানে কি করে এলেন?" এই প্রশ্নটি শুনে ডাক্তার তো একেবারে অবাক। সেই রাত্রিতেই বাবার ওঁর উপর কৃপা হয়। ডাক্তার নিদ্রাতেই পরমানন্দের অনুভূতি পান। বাড়ী ফিরে আসার পরও পনেরো দিন পর্যন্ত সেই দিব্য অনুভূতিতে নিমগ্ন ছিলেন। এই ভাবে ওঁর সাইভক্তি অনেক গুণে বেড়ে যায়।

এই ঘটনাগুলির, বিশেষতঃ মূলে শাস্ত্রীর গল্পটির, শিক্ষা এই যে আমাদের নিজের গুরুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। পরের অধ্যায়ে বাবার অন্যান্য লীলা বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্‌ ভবতু ।।

অধ্যায় - ১৩

অন্য কয়েকটি লীলা - ১) ভীমাজী পাটীল ২) বালা গণপত দর্জী ৩) বাপুসাহেব বুটী ৪) আলন্দী স্বামী ৫) কাকা মহাজনী ৬) হরদার দত্তোপন্ত

মায়ার অভেদ্য শক্তি ঃ-

বাবার বক্তব্য সর্বদা সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ, গূঢ় ও বিদ্যাভূষিত হত। তিনি সদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতেন। তাঁর কথায় "আমি একজন ফকির, আমার না স্ত্রী আছে আর না আছে ঘর-বাড়ি। সব চিন্তা ত্যাগ করে আমি একই স্থানে থাকি। তবুও মায়া আমায় কষ্ট দেয়। আমি নিজেকে তো ভুলে গেছি, কিন্তু মায়া আমায় ভুলছে না, কারণ সে আমায় নিজের চক্রে জড়িয়ে নিতে চায়। শ্রীহরির এই মায়া ব্রহ্মাদিকেও ছাড়ে না, তবে আমার মত ফকির তো কোন ছাড়? কিন্তু যারা শ্রীহরির শরণ নেবে, তারা তাঁর কৃপায় মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।" এই ভাবে বাবা মায়ার শক্তির পরিচয় দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে উদ্ধবকে বলেন- "সন্তই আমার জীবিত স্বরূপ।" এবং বাবাও এ কথা বলতেন- "তারা খুবই ভাগ্যবান যাদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। তারাই আমার উপাসনার দিকে অগ্রসর হতে পারে বা হয়। যদি তুমি শুধু 'সাই' 'সাই'-ই স্মরণ করতে থাকো, তাহলেও আমি তোমায় ভবসাগর পার করিয়ে দেব। এই শব্দগুলির ওপর বিশ্বাস করো, তুমি নিশ্চয়ই লাভ পাবে। আমার পূজোর জন্য কোন সামগ্রী বা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দরকার হয় না। আমি তো ভক্তিতেই বাস করি।" এবার দেখা যাক অনাশ্রিতদের আশ্রয়দাতা সাই, ভক্তদের কল্যাণের জন্য কি-কি দেন বা করেন।

ভীমাজী পাটীল ঃ সত্য সাই ব্রত ঃ-

নারায়ণ গ্রামের (তালুক জুন্নর, জেলা পুনা) এক ভদ্রলোক ভীমাজী পাটীল ১৯০৯ সালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। উনি অনেক রকমের চিকিৎসা করান, কিন্তু কোন লাভ হয় না। শেষে হতাশ হয়ে উনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন- "হে নারায়ণ! হে প্রভু! এই অনাথকে কিছু সাহায্য করো।" আমরা যখন সুখে থাকি তখন ভগবানকে স্মরণ করি না, কিন্তু যেই দুর্ভাগ্য ঘিরে নেয় এবং দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হয়, তখন

ভগবানের কথা মনে পড়ে। তাই ভীমাজীও ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। হঠাৎ ওঁর মনে হলো শ্রী সাইবাবার পরম ভক্ত শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে পরামর্শ করলে কেমন হয়? তাই নিজের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে ওঁকে পথ প্রদর্শন করতে প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে নানাসাহেব লেখেন- "এখন শুধু একটাই উপায় রয়ে গেছে এবং সেটা হলো শ্রী সাইবাবার চরণের শরণাগতি।" নানাসাহেবের কথা বিশ্বাস করে ভীমাজী শিরডী যাত্রার ব্যবস্থা শুরু করেন। ওঁকে শিরডী আনা হয় এবং মস্‌জিদে এনে শোওয়ান হয়। শ্রী নানাসাহেব ও শামাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাবা বললেন- "এ সব পূর্ব জন্মের দুষ্কর্মের ফল, তাই আমি এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাই না।" এই কথা শুনে রোগী অত্যন্ত নিরাশ হয়ে করুণ স্বরে মিনতি করেন- "বাবা, আমি একেবারে নিঃসহায় এবং শেষ আশা নিয়ে আপনার শ্রী চরণে এসেছি। আপনার কাছে দয়ার ভিক্ষে চাইছি। হে দীনের একমাত্র শরণ। আমার উপর দয়া করুন।" এই হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা শুনে বাবা দ্রবীভূত হয়ে বললেন- "আচ্ছা দাঁড়াও। চিন্তা করো না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। কারো হাজার যাতনা বা কষ্ট হোক না কেন, এই সিঁড়ির উপর পা রাখতেই তার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। মস্‌জিদের ফকির খুব দয়ালু এবং সে তোমার রোগও নির্মূল করে দেবে। সে তো প্রেম ও দয়ার সাগর এবং সবাইকে রক্ষা করে।" রোগী প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর রক্ত-বমি করত। কিন্তু বাবার এই ঘোষণার পর রোগটি ভালোর দিকে ঘুরল। বাবা যে স্থানে ভীমাজীকে থাকতে আদেশ করেন, সে জায়গাটি রোগীর জন্য সুবিধেজনক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ তো ছিল না কিন্তু বাবার আজ্ঞা অবহেলাই বা কে করতে পারত? সেখানে থাকাকালীন দুটো স্বপ্ন দিয়ে বাবা ওর রোগ হরণ করে নেন। প্রথম স্বপ্নে রোগী দেখে যে, একটি বিদ্যার্থী শিক্ষকের সামনে কবিতা মুখস্থ না করতে পারার জন্য দণ্ডস্বরূপ বেতের মারের অসহ্য কষ্ট ভোগ করছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখে যে কেউ যেন বুকের নীচের থেকে উপর এবং উপর থেকে নীচে পাথর ঘোরাচ্ছে, যার দরুণ তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। স্বপ্নে এই রকম কষ্ট পেয়ে ভীমাজী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং বাড়ী ফিরে আসেন। তারপর থেকে উনি কখনো-কখনো শিরডী আসতেন এবং বাবার কৃপা ও দয়ার কথা মনে করে বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। বাবা নিজের ভক্তদের কাছে কোন বস্তুর আশা রাখতেন না। উনি তো শুধু স্মরণ, দৃঢ় নিষ্ঠা ও ভক্তিই চাইতেন। মহারাষ্ট্রের লোকেরা প্রতি পক্ষ বা প্রতি মাস সদৈব শ্রী সত্যনারায়ণের ব্রত করে। কিন্তু নিজের গ্রামে ফিরে ভীমাজী পাটীল শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রতের জায়গায় একটা নতুন ব্রত 'সত্য সাই ব্রত' শুরু করেন।

বালা গণপত দর্জী ঃ-

বালা গণপত দর্জী, বাবার আরেক ভক্ত, একবার ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছিলেন। সব রকম ওষুধ-পথ্যের দ্বারাও কোন লাভ হয় না। যখন জ্বর বিন্দুমাত্র কমে না, তখন উনি শিরডী আসেন এবং বাবার শ্রী চরণের শরণ নেন। বাবা ওকে এক বিচিত্র আদেশ দেন- "লক্ষ্মী মন্দিরের কাছে একটা কালো কুকুরকে একটু দৈ-ভাত খাওয়াও।" বালা এই আদেশ পালন করার উপায় বুঝে উঠতে পার ছিলেন না। যাই হোক, একটু ভাত ও দৈ নিয়ে লক্ষ্মী মন্দির পৌছন। সেখানে একটা কালো কুকুর দেখতে পেয়ে সহজেই কাজটি সম্পন্ন করেন। শ্রী বাবার চরিত্রের ব্যাখ্যান কোন মুখ দিয়ে করি যে, এই উপায়টি করামাত্র বালা দর্জীর জ্বর একেবারে সেরে গেল।

বাপু সাহেব বুটী ঃ-

শ্রীমান বাপু সাহেব বুটী একবার পেটের অসুখে অসম্ভব ভুগছিলেন। ওঁর আলমারিতে অনেক রকমের ওষুধ ছিল, কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হচ্ছিল না। বাপু সাহেব দিনে-দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ওঁর অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, মস্‌জিদে এসে বাবার দর্শন করতে পারতেন না। বাবা ওঁকে নিজের কাছে ডেকে বললেন- "সাবধান, আর তোমার পেট খারাপ হবে না।" তারপর আঙ্গুল উঠিয়ে বলেন- "বমিও বন্ধ হয়ে যাবে।" বাবা এমন কৃপা করেন যে রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে গেল এবং বুটী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

আরেকবার উনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। ফলতঃ ওঁর খুব তেষ্টা পেত। ডাক্তার পিল্লে ওঁর সব রকমের চিকিৎসা করেন, কিন্তু ওঁর অবস্থায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অবশেষে উনি আবার বাবার কাছে গিয়ে ওঁর রোগ নিবারণ করার জন প্রার্থনা করেন। বাবা ওঁকে, "মিষ্টি দুধে বাদাম, আখরোট ও পিস্তা ফুটিয়ে খাও' এই ঔষধ দেন।

অন্য কোন ডাক্তার বা হাকীম বাবার এই ঔষধিটিকে মারাত্মক মনে করত, কিন্তু বাবার আদেশ মেনে পালন করাতে এইটাই রোগনাশক প্রমাণিত হল এবং আশ্চর্যের কথা এই যে রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে গেল।

আলন্দীর স্বামী ঃ-

আলন্দীর এক স্বামীজী বাবার দর্শনার্থে শিরডী আসেন। ওঁর কানে একটা অসহ্য

ব্যথা হত, যার দরুণ উনি এক দণ্ডও বিশ্রাম করতে পারতেন না। ওঁর শল্য চিকিৎসাও হয়েছিল - তবুও ওঁনার কানের ব্যাথা কমে নি। শেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উনি বাবার কাছে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে গেলেন। সেই দেখে শামা বাবার কাছে প্রার্থনা করেন- "স্বামীজীর কানে খুব ব্যথা - আপনি ওঁর উপর কৃপা করুন।" বাবা আশ্বাস দিয়ে বলেন- "আল্লাহ্ মঙ্গল করবেন।" স্বামীজী পুণায় ফিরে গেলেন এবং এক সপ্তাহ পর শিরডীতে চিঠি পাঠান- "ব্যথা ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু ফোলা ভাবটা এখনো আগের মতই আছে।" সেটা যাতে ঠিক হয়ে যায়, তাই আপরেশনের জন্য উনি বম্বে যান। 'সার্জন' (শল্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ) সব পরীক্ষা করার পর জানান, "আপরেশানের কোন দরকার নেই।" বাবার শব্দের গূঢ়ার্থ আমাদের মত অজ্ঞ, মুর্খ কি বুঝবে?

কাকা মহাজনী ঃ-

কাকা মহাজনী নামক বাবার এক ভক্ত একবার অতিসার রোগে ভুগছিলেন। বাবার সেবায় কোন বাধা না পড়ে, এই ভেবে উনি মস্‌জিদের এক কোণে এক ঘটি জল রেখে দেন, যাতে প্রয়োজন হলেই বাইরে যেতে পারেন। যদিও উনি বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি কারণ উনি ভেবেছিলেন উনি শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু শ্রী সাইবাবা তো সবই জানতেন। মস্‌জিদের মেঝে তৈরী করার স্বীকৃতি তো বাবা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যখন আসল কাজ আরম্ভ হয়, তখন বাবা হঠাৎ রেগে হয়ে ওঠেন। উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে শুরু করেন। মস্‌জিদে গোলমাল বেঁধে যায় এবং সকলেই পালাতে আরম্ভ করে। যেই কাকা সেখান থেকে পালাতে যাবেন, অমনি বাবা ওঁকে ধরে নিজের সামনে বসিয়ে দেন। এই গোলমালে কেউ একটা চীনেবাদামের ছোট থলে সেখানে ভুলে ফেলে গিয়েছিল। বাবা তার মধ্যে থেকে এক মুঠো চীনেবাদাম বার করে, সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলি কাকাকে দেন। রেগে যাওয়া, চীনেবাদাম ছাড়ানো, সে গুলি কাকাকে খাওয়ানো, এক সাথেই চলছিল। বাবা তার মধ্যে থেকে কয়েকটি চীনেবাদাম নিজেও খান। যখন থলেটি প্রায় খালি হয়ে যায় তখন বাবা বলেন- "আমার তেষ্টা পাচ্ছে। একটু জল নিয়ে এসো।" কাকা এক ঘড়া জল নিয়ে আসেন এবং দুজনে তার থেকে জল খান। এরপর বাবা বললেন- "এইবার তোমার অতিসার রোগ দূর হয়ে গেছে। তুমি মেঝে তৈরী করার কাজটা ঠিক ভাবে করতে পারবে।" একটু পরই যারা ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা একে-একে ফিরে এলো। কাজ আবার শুরু হয়ে গেল। কাকার রোগও প্রায় সেরে এসেছিল। তাই উনিও পূর্ণ

উৎসাহের সাথে কাজে নেমে পড়েছিলেন। অতিসার রোগের ওষুধ কি চীনেবাদাম হতে পারে? এর উত্তর কে দেবে? বর্তমান চিকিৎসা প্রণালীর হিসেবে চীনেবাদাম খেলে এই রোগ দূর হওয়ার থেকে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকবারের মত বাবার আশ্বাস ও নির্দেশ ঔষধিস্বরূপ সিদ্ধ হলো।

হরদার দত্তোপন্ত ঃ-

হরদার শ্রী দত্তোপন্ত ১৪ বছর থেকে পেটের কষ্টে ভুগছিলেন। কোন ওষুধেই লাভ হচ্ছিল না। হঠাৎ কোথাও থেকে বাবার কীর্তি ওঁর কানে আসে যে, বাবার দৃষ্টি মাত্রতেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। অতএব উনিও শিরডী এসে বাবার চরণে শরণ নেন। বাবা তাঁর স্বাভাবিক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওঁকে আশীর্বাদ করেন। আশীষ ও উদী পেয়ে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ভবিষ্যতে কখনো আর ওর ব্যথা হয়নি। এই রকমের তিনটি চমৎকার এই অধ্যায়ের শেষে লেখা হচ্ছে -

১) মাধবরাও দেশপাণ্ডে অর্শ রোগে ভুগছিলেন। বাবার আদেশ অনুসারে সোনামুখীর পাতার রস খেয়ে নীরোগ হয়ে যান। দুবছর পর আবার সেই কষ্ট দেখা দেওয়াতে উনি বাবার সাথে পরামর্শ না করেই সেই রস সেবন করেন। ফলস্বরূপ রোগ বেড়ে যায়। কিন্তু পরে বাবার কৃপায় উনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

২) কাকা মহাজনীর বড় ভাই - গঙ্গাধর পাণ্ডের কিছু বছর থেকে সমানেই পেটে একটা ব্যথা হত। বাবার কীর্তি শুনে উনিও শিরডী আসেন এবং আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করেন। বাবা ওর পেট স্পর্শ করে বলেন- "আল্লাহ ভালো করবেন।" এরপর প্রায় তক্ষুনি ওর পেটের ব্যথা সেরে যায় এবং উনি সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে যান।

৩) শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের একবার খুব পেটব্যথা হয়েছিল। উনি দিনরাত ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতন ছট্‌পট্‌ করতেন। ডাক্তাররা অনেক রকমের চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষে উনি বাবার শরণ নেন বাবা ওঁকে ঘিয়ের সাথে 'বর্ফি' (মিষ্টি) খেতে বলেন। এই ওষুধে উনি অচিরেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এই সব ঘটনা গুলির মাধ্যমে আমরা একটাই ইঙ্গিত পাই যে, স্থায়ী ভাবে রোগ নির্মূল করার আসল ওষুধ হলো বাবার মুখনিঃসৃত বাণী ও তাঁর কৃপার প্রভাব।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্রাম

অধ্যায় - ১৪

নাদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া, সন্ত মৌলা সাহেব, দক্ষিণা মীমাংসা, গণপত্ রাও বোডস্, শ্রীমতি তর্খড, দক্ষিণা মর্ম।

শ্রী সাইবাবার কথা ও কৃপার দ্বারা কিভাবে অসাধ্য রোগ নির্মূল হয়ে যায়, গত অধ্যায়ে সেটা বর্ণনা করা হয়েছে। এবার বাবা কিভাবে রতনজী ওয়াডিয়াকে অনুগৃহীত করেন এবং তাঁকে পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্বাদ দেন - তার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হবে।

এই সন্তের জীবনী সর্বরূপে প্রাকৃতিক ও মধুর। তাঁর অন্যান্য কার্য্যকলাপ, যেমন- খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ও সহজ-স্বাভাবিক অমৃতোপদেশ একই রকম মধুর। তিনি ছিলেন আনন্দের অবতার। নিজের ভক্তদেরও এই পরমানন্দের রসাস্বাদন করান। তাই ভক্তরা তাঁকে কখনো ভুলতে পারেনি। বিভিন্ন রকমের কর্ম ও কর্তব্যের উপদেশ তিনি ভক্তদের দেন, তাই তারা সত্যের পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। বাবা সর্বদা চাইতেন যে, লোকেরা সুখে জীবন যাপন করুক এবং সদৈব সজাগ থেকে নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য, আত্মানুভূতি (ঈশ্বর দর্শন), অবশ্যই প্রাপ্ত করুক। **পূর্ব জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই এই দেহ প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর সার্থকতা তখনই সিদ্ধ হবে, যখন এর সাহায্যে আমরা এই জীবনে ভক্তি ও মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারব**। জীবনের শেষ সময় ও জীবন লক্ষ্যর বিষয়ে সর্বদা সাবধান ও সতর্ক থাকা উচিত। যদি তুমি নিত্য শ্রী সাই লীলা শ্রবণ করো, তাহলে সর্বদা তাঁর দর্শন পাবে। দিনরাত হৃদয় দিয়ে তাঁকেই স্মরণ করো। এইরূপ আচরণ করলে মনের চঞ্চলতা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। এর নিরন্তর অভ্যাসের ফলে চৈতন্যধন থেকে অভিন্নতা লাভ হবে।

নাদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া ঃ-

এবার আমরা এই অধ্যায়ের মূল ঘটনার বর্ণনা শুনব। নাঁদেড়ে (নিজাম রাজ্য) রতনজী-শাপুরজী ওয়াডিয়া নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী থাকতেন। ব্যবসা করে উনি অনেক ধন সংগ্রহ করেছিলেন ও বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে ওঁকে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট মনে হত, কিন্তু আসলে উনি অন্তরে দুঃখী ছিলেন। বিধাতার নিয়ম এমনই বিচিত্র যে, এই সংসারে পূর্ণ রূপে সুখী কেউই নয়। উনি পরোপকারী

ও দানী ব্যক্তি ছিলেন এবং গরীব-দুঃখীদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করতেন। সবাইকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। ওঁকে লোকেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করত। কিন্তু দীর্ঘকাল অবধি কোন সন্তান না হওয়ার দরুণ উনি খুবই সন্তপ্ত ছিলেন। যেরূপ প্রেম ও ভক্তিরহিত কীর্তন, বাদ্যযন্ত্ররহিত সঙ্গীত, যজ্ঞোপবীতরহিত ব্রাহ্মণ, ব্যবহারিক জ্ঞানরহিত শিল্পী, পশ্চাতাপরহিত তীর্থযাত্রা ও কণ্ঠমালা ছাড়া অলংকার ভালো লাগে না, সেই রকমই সন্তানরহিত গৃহস্থ বাড়ীও খালি-খালি লাগে। রতনজী সব সময় এই চিন্তাতেই ডুবে থাকতেন। উনি মনে-মনে ভাবতেন- "ঈশ্বরের কি আমার উপরে কখনোই দয়া হবে না? আমার কি কখনো কোন সন্তান হবে না?" এই ভেবে উনি প্রায় উদাস থাকতেন। খাবারের প্রতিও কোন রুচি ছিল না। সন্তান প্রাপ্তি কখন হবে, এই চিন্তাতেই দিন কাটত। দাসগণু মহারাজের উপর ওঁর দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাই ওঁর সামনে নিজের মনের কথা খুলে বলেন। দাসগণু তখন শ্রী সাইবাবার শরণে যেতে ও তাঁর কাছে সন্তান প্রাপ্তির প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শটি রতনজীর মনেও ধরে এবং উনি শিরডী অভিমুখে রওনা হবেন স্থির করেন। কিছুদিন পর উনি শিরডী আসেন ও বাবার দর্শন করে ওঁর চরণে লুটিয়ে পড়েন। বাবাকে একটা সুন্দর মালা পরান ও অনেক ফুল-ফল অর্পণ করেন। তারপর বাবার কাছে বসে শ্রদ্ধাপূর্বক অনুরোধ করেন- "অনেক বিপদগ্রস্ত লোক আপনার কাছে আসে এবং আপনি তাদের কষ্ট তক্ষুনি দূর করে দেন। এই কীর্তি শুনেই আমিও অনেক আশা নিয়ে আপনার শ্রী চরণে আশ্রয় নিতে এসেছি। দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না।" শ্রী সাইবাবা ওঁর কাছে পাঁচ টাকা দক্ষিণা চান, যেটা উনি নিজেই দিতে চাইছিলেন। কিন্তু বাবা বলেন- "আমি তোমার কাছ থেকে তিন টাকা চৌদ্দ আনা আগেই পেয়ে গেছি, বাকীটাই দাও।" এই কথা শুনে রতনজী একটু অবাক হয়ে যান। বাবার কথার অভিপ্রায় উনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। উনি মনে-মনে ভাবেন- "এটা তো আমার প্রথম শিরডী যাত্রা। তাই এতো খুব আশ্চর্য্যের কথা যে, বাবা তিন টাকা চৌদ্দ আনা আগেই আমার কাছ থেকে কি করে পেলেন?" উনি বাবার এই হেঁয়ালিটি বুঝতে পারলেন না। বাবার শ্রীচরণের কাছেই বসে রইলেন ও বাকি দক্ষিণাটি অর্পণ করেন। এরপর উনি নিজের আগমনের কারণ জানিয়ে পুত্র প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। বাবা করুণায় বিগলিত হলেন। তিনি বললেন- "চিন্তা ছেড়ে দাও, তোমার দুর্দিন এবার শেষ হয়ে গেছে।" উদী দিয়ে বাবা নিজের বরদহস্ত ওঁর মাথার উপর রেখে বললেন- "ভগবান তোমার ইচ্ছে পুরণ করবেন।"

বাবার অনুমতি পেয়ে রতনজী নাঁদেড় ফিরে আসেন ও শিরডীর ঘটনাগুলির

বৃত্তান্ত দাসগণু মহারাজকে বলেন। রতনজী বলেন- "সব কাজই ঠিক মত হলো। বাবার শুভ দর্শন, ওঁর আশীর্বাদ ও প্রসাদও পাওয়া হলো, কিন্তু ওখানকার শুধু একটা কথাই বুঝতে পারলাম না। বাবা বলেন- 'আমি তিন টাকা চৌদ্দ আনা পূর্বেই পেয়ে গেছি।' দয়া করে এর অর্থটা বোঝান। এর আগে আমি শিরডী কখনো যাইনি। তবে যে টাকার কথা উনি উল্লেখ করেছেন, সেই টাকাটা উনি কি করেই বা পেলেন?" দাসগণুর কাছেও এই প্রশ্নটা একটা ধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ বিষয়ে উনি অনেক দিন চিন্তা করেন। কিছুদিন পর ওঁর মনে পড়ে যে, ক'দিন আগেই রতনজী নিজের বাড়ীতে মৌলা সাহেব নামক এক মুসলমান সন্ন্যাসীকে (সন্ত) আমন্ত্রিত করেছিলেন। (মৌলাসাহেব নাদেড়ের এক প্রসিদ্ধ সন্ত ছিলেন এবং কুলীর কাজ করতেন।) রতনজী মৌলা সাহেবের সম্মান ও সৎকার হেতু একটা ছোট জলপানের আয়োজন করেছিলেন এবং ওঁর আতিথেয়তাতে কিছু টাকা খরচ হয়েছিল। দাসগণু রতনজীর কাছে খরচার সূচীটি চান। এটা জেনে সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে যে, ঠিক তিন টাকা চৌদ্দ আনাই খরচ হয়েছিল - এক পয়সা কমও না, এক পয়সা বেশীও না। বাবার ত্রৈকালজ্ঞতার পরিচয় সবাই পেয়ে যায়। যদিও উনি শিরডীতে বাস করতেন, তবুও শিরডীর বাইরে কি-কি হচ্ছে, সেটা তাঁর অজানা থাকে না। যথার্থরূপে বাবা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পূর্ণ জ্ঞাতা এবং প্রত্যেক আত্মা ও হৃদয়ের সাথে তাঁর সম্বন্ধ আছে। তা নাহলে মৌলা সাহেবের অতিথি সৎকারে করা খরচের রাশি বাবা কি করে জানতে পারতেন।

রতনজী এই উত্তর দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং ওঁর মনে শ্রী সাই চরণের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি জাগে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওঁর ঘরে পুত্ররত্নের জন্ম হয়, যার দরুণ ওঁর আনন্দের সীমা থাকে না। এমন শোনা যায় যে, ওঁর বারোটি সন্তান হয় কিন্তু কেবল চারটি জীবিত থাকে। এই অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে যে, বাবা রাওবাহাদূর হরি বিনায়ক শাঠেকে ওঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহর পর পুত্ররত্ন প্রাপ্তির ইঙ্গিত করেছিলেন। রাওবাহাদুর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথমে দুটি মেয়ে হয়, যার দরুণ উনি বেশ নিরাশ হন, কিন্তু তৃতীয় বারে পুত্রের জন্ম হয়। এই ভাবে বাবার কথা সত্য হয় এবং শাঠে সাহেব সন্তুষ্ট হন।

দক্ষিণা মীমাংসা ঃ-

দক্ষিণার সম্বন্ধে কিছু অন্য কথা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শেষ করব। এ তো সবাই জানে যে যারা বাবার দর্শন করতে আসত, তাদের কাছ থেকে বাবা দক্ষিণা নিতেন। এখানে যে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে, বাবা যখন ফকির ও

উদাসীন ব্যক্তি ছিলেন, তখন ওঁর এই ভাবে দক্ষিণা গ্রহণ করা ও কাঞ্চনকে গুরুত্ব দেওয়া কি উচিত ছিল? এবার আমরা এই প্রশ্নের বিষয়ে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করব।

অনেকদিন পর্যন্ত বাবা ভক্তদের কাছ থেকে কিছু নিতেন না। তিনি পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি নিজের পকেটে একত্রিত করতেন। ভক্ত হোক বা অন্য কেউ - তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নিতেন না। যদি কেউ তাঁর সামনে এক পয়সা রাখত তো তিনি সেটা গ্রহণ করে তা দিয়ে তামাক বা তেল কিনতেন, তিনি প্রায় কলকি পান করতেন। কয়েকজন স্থির করল যে কিছু না দিয়ে সাধুজনের দর্শন করা উচিত নয়। তাই ওরা বাবার সামনে টাকা রাখতে আরম্ভ করল। যদি এক পয়সা রাখা হতো তো তিনি সেটা পকেটে রেখে নিতেন। কিন্তু কেউ যদি দু'পয়সা অর্পণ করত, তাহলে তিনি তক্ষুনি তাকে পয়সা ফেরত দিয়ে দিতেন। শীঘ্রই বাবার নাম ও কীর্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যায় এবং বাবার দর্শনের জন্য ভক্তদের দল শিরডী আসতে শুরু করে। বাবা তখন তাদের দক্ষিণা স্বীকার করতে শুরু করেন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, স্বর্ণ মুদ্রার অভাবে ভগবানের পূজোও অপূর্ণ রয়ে যায়। অতএব যখন ঈশ্বর পূজনে মুদ্রার দরকার, তখন সন্ত পূজনেই বা হবে না কেন? শাস্ত্রে বলে যে, নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঈশ্বর, রাজা, সন্ত বা গুরুর দর্শন কিছু অর্পণ না করে কখনো করা উচিত নয়। এবার প্রশ্ন ওঠে ওঁদের কি উপহার দেওয়া উচিত? এই সম্বন্ধে উপনিষদে বর্ণিত নিয়মগুলি অবলোকন করা হচ্ছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, একবার দক্ষ প্রজাপতি দেবতা, মানুষ এবং রাক্ষসদের সামনে 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করেন। দেবতারা মনে করেন এর অর্থ দম অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা উচিত। মানুষেরা ভাবল তাদের দান করার অভ্যাস অবলম্বন করতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ও রাক্ষসেরা ভাবে যে, তাদের 'দয়া' অভ্যাস করতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দান ও অন্যান্য সদ্‌গুণের অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। দানের সম্বন্ধে লেখা আছে- "বিশ্বাসের সঙ্গে দান করো।" ভক্তদের কাঞ্চন ত্যাগের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের আসক্তি দূর করার ও চিত্ত শুদ্ধ করানোর জন্য বাবা সবার কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন। কিন্তু ওঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাবা বলতেন- "যা কিছু আমি স্বীকার বা গ্রহণ করি - তার একসো গুণের চেয়েও বেশী আমায় ফেরত দিতে হয়।" তাঁর এই কথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটা ঘটনা ঃ-

শ্রী গণপতরাও বোডস্‌, প্রসিদ্ধ শিল্পী, নিজের জীবনীতে লেখেন যে, বাবা বারংবার

অনুরোধ করার ফলস্বরূপ উনি নিজের টাকার থলিটা বাবার সামনে উল্টে দেন। শ্রী বোডস্ লিখেছেন যে, এর পরিণাম এই হয় যে জীবনে কখনো ওঁর আর টাকার অভাব হয়নি এবং প্রচুর মাত্রায় লাভই হয়। দক্ষিণার একটা অন্য অর্থও হতে পারে। দুটো উদাহরণ দিয়ে এই কথাটি স্পষ্ট করা হচ্ছে। বাবা প্রোফেসর সী. কে. নারকের কাছে ১৫ টাকা দক্ষিণা চান। উনি প্রত্যুত্তরে জানান যে, ওঁর কাছে এক পয়সাও নেই। তখন বাবা বলেন- "আমি জানি তোমার কাছে কোন দ্রব্য নেই, কিন্তু তুমি যোগবশিষ্ঠ অধ্যয়ন ত করো, তার থেকেই দক্ষিণা দাও।" এখানে দক্ষিণার অর্থ হলো - বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে হৃদয়ঙ্গম করা- কারণ হৃদয় তো বাবারই বাসস্থান।

২) দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি এক মহিলা শ্রীমতি আর. এ তর্খডের কাছে ছ টাকা দক্ষিণা চান। মহিলা খুবই দুঃখিত হন কারণ ওঁর কাছে দেওয়ার মত টাকা ছিল না। ওঁর স্বামী তখন ওঁকে বোঝান যে, বাবা ছয় মানসিক রিপুর দিকে ইঙ্গিত করছেন যেগুলি বাবাকেই সমর্পণ করে দেওয়া উচিত। বাবাও এই ব্যপারে শ্রী তর্খডের সাথে একমত ছিলেন।

এটা মনে রাখতে হবে যে, বাবার কাছে দক্ষিণা রূপে অনেকটা দ্রব্য একত্রিত হয়ে পড়ত। সব কিছু তিনি সেদিনই খরচ করে দিতেন এবং পরের দিন সকাল থেকে আবার ফকির!

প্রায় ১০ বছর অবধি হাজার-হাজার টাকা দক্ষিণা রূপে পাওয়া সত্ত্বেও, যখন বাবা মহাসমাধি গ্রহণ করলেন তখন তার কাছে অল্প রাশিই অবশিষ্ট ছিল। সংক্ষেপে, দক্ষিণা নেওয়ার প্রধান লক্ষ্য তো কেবল ভক্তদের চিত্ত শুদ্ধি বা ভ্রম দূরীকরণই ছিল।

দক্ষিণার মর্ম ঃ-

ঠানের শ্রী বি. ভি. দেব (সেবা-নিবৃত্ত প্রাপ্ত মাম্‌লৎদার, যিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন) এই বিষয় একটা লেখনী প্রকাশিত করেছেন -

"বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন না। যদি বাবার না চাওয়া সত্ত্বেও কেউ তাঁকে দক্ষিণা দিত তো কখনো গ্রহণ করে নিতেন আবার কখনো অস্বীকারও করে দিতেন। তিনি শুধু নির্দ্দিষ্ট ভক্তদের কাছেই কিছু চাইতেন। এমন লোকেদের কাছে তিনি কখনো দক্ষিণা চাইতেন না, যারা ভাবত বাবা চাইলে তবেই দক্ষিণা দেব। যদি কেউ তাঁকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দক্ষিণা দিত, তাহলে তিনি স্পর্শ করতেন না।

বাবা চাওয়া সত্ত্বেও যারা দক্ষিণা দিত না, তিনি তাদের উপর কখনো রাগ করতেন না। যদি কেউ কোন বন্ধু মারফৎ বাবার জন্য দক্ষিণা পাঠাতো এবং সে সেটা দিতে ভুলে যেতো, তাহলে বাবা তাকে কোন-না-কোন ভাবে মনে করিয়ে দিয়ে সেটি নিয়ে নিতেন। কোন-কোন সময় দক্ষিণার রাশি থেকে কিছু অংশ ফিরিয়ে দিতেন এবং সেটা সামলে বা পূজোর জায়গায় রাখতে বলতেন। ভক্তর তাতে খুব লাভ হতো। যদি কেউ নিজের ইচ্ছের চেয়ে বেশী অর্পণ করতো ত সেই বাড়তি রাশিটা ফিরিয়ে দিতেন। আবার কারোকারো কাছে তিনি তার ইচ্ছের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষিণা চেয়ে বসতেন এবং যদি ওর কাছে সেটা না থাকত, তাহলে অন্যদের কাছ্ থেকে ধার নিতে বলতেন। কারো-কারো কাছে তো তিনি দিনে তিন চারবার দক্ষিণা চাইতেন।

দক্ষিণার টাকা থেকে বাবা নিজের জন্য খুব অল্প খরচ করতেন - শুধু তামাক ও ধুনির জন্য কাঠ কিনতেন। বাকি সমস্তটাই অন্যান্য লোকেদের বিভিন্ন অংশে বিরতণ করে দিতেন। শিরডী সংস্থানের সমস্ত সামগ্রী অবস্থাপন্ন ভক্তরা রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের প্রেরণায় একত্রিত করেছিল। খুব বেশী মূল্যের সামগ্রী যারা আনত, বাবা তাদের উপর খুব রাগ করতেন এবং বকাবকি করতেন। তিনি নানাসাহেব চাঁদোরকরকে বলেন- "আমার সম্পত্তি কেবল একটি কৌপীন ও একটা গেলাস। লোকেরা মিছিমিছি এত দামী জিনিষ এনে আমায় দুঃখ দেয়।" কামিনী ও কাঞ্চন আধ্যাত্মিক পথের দুটি প্রধান বাধা এবং তার জন্য বাবা দুটি 'পাঠশালা' খুলেছিলেন। দক্ষিণা গ্রহণ করে ও রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী পাঠিয়ে তিনি এইটাই পরীক্ষা করতেন যে তাঁর ভক্তরা এই দুটি আসক্তি হতে মুক্ত হতে পেরেছে কিনা। তাই যখন কেউ আসত, উনি দক্ষিণা চাইতেন ও 'শিক্ষালয়ে' (রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী) যেতে বলতেন। ওরা এই দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ এটা সিদ্ধ হলে যে কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি তারা উদাসীন, বাবার কৃপায় ও আশীর্বাদে ওদের আধ্যাত্মিক উন্নতি তরান্বিত হত। শ্রী দেব গীতা ও উপনিষদের ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন যে কোন তীর্থস্থানে কোন সন্তকে করা দান, দানীর জন্য খুব কল্যাণকারী হয়। শিরডী ও শিরডীর মুখ্য দেবতা শ্রী সাইবাবার চেয়ে পবিত্র আর কি বা কে হতে পারে?

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১৫

নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি, শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা, দুটো টিকটিকি।

পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে অধ্যায় ৬-তে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শিরডীতে রামনবমী উৎসব পালন করা হত। সেটি কি ভাবে আরম্ভ হলো এবং প্রথম বছরেই কীর্তন করার জন্য একজন ভালো হরিদাস পেতে কি-কি অসুবিধে হয়, তারও বর্ণনা সেখানে করা হয়েছে। এই অধ্যায়তে দাসগণুর কীর্তন পদ্ধতির বর্ণনা করা হবে।

নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি ঃ-

কীর্তন করার সময় হরিদাসরা একটা লম্বা চাপকান ও পুরো পোশাক পরে। ওরা মাথায় একটা ছোট্ট পাগড়ী বাঁধে ও একটা লম্বা কোট ও ভেতরে কামিজ, কাঁধে গামছা এবং একটা ধূতি পরে। গ্রামে কীর্তন করতে যাওয়ার সময় একবার দাসগণু উক্ত রীতিতে সেজে-গুজে বাবাকে প্রণাম করতে পৌঁছন। বাবা ওঁকে দেখে বলেন- "আচ্ছা, বর মশাই! এই ভেবে সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছো?" উত্তর পেলেন- "কীর্তন করতে।" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন- "কোট, গামছা ও ফেটা - এই সবের কি দরকার? এগুলো এক্ষুনি আমার সামনে খুলে ফেল। শরীরের উপর এগুলি পরার কোন দরকার নেই।" এরপর দাসগণু এই বস্ত্রগুলি কখনো পরেননি। উনি সর্বদা কোমর থেকে উপর পর্যন্ত শরীরটা খোলা রেখে হাতে করতাল এবং গলায় মালা পরে কীর্তন করতেন। এই পদ্ধতিটি যদিও হরিদাস পদ্ধতির অনুরূপ নয়, তবুও শুদ্ধ ও পবিত্র। কীর্তন পদ্ধতির জন্মদাতা নারদ মুনি কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত কোন বস্ত্র ধারণ করতেন না। উনি এক হাতে বীণা নিয়ে হরি কীর্তন করতে-করতে ত্রিলোকে ঘুরতেন।

শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা ঃ-

পুণা এবং আহমদনগর জেলায় বাবা সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের ব্যক্তিগত বার্তালাপ এবং দাসগণুর মধুর কীর্তনের মাধ্যমে বাবার কীর্তি বম্বে ও তার আশে-পাশের প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সমস্ত কৃতিত্ব দাসগণুকেই দেওয়া যেতে পারে। ভগবান যেন ওঁকে সদা সুখী রাখেন। উনি নিজের সুন্দর-সরল কীর্তনের মাধ্যমে বাবাকে বাড়ী-বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন। শ্রোতাদের তো বিভিন্ন রকমের

রুচি থাকে। কারো হরিদাসদের বিদ্বতা, কারো ভাব, কারো গান তো কারো বেদান্ত বিবচনের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু এমন লোক খুব কম দেখা যায়, যাদের সন্তলীলা শ্রবণ করে মনে প্রেম ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠেনা। শ্রী দাসগণুর কীর্তন শ্রোতাদের হৃদয়ে একটা স্থায়ী ছাপ ছেড়ে যেত। এমনি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক সময় ঠানের শ্রী কৌপীনেশ্বর মন্দিরে শ্রী দাসগণু কীর্তন ও শ্রী সাইবাবার লীলা গুণগান করছিলেন। ঠানে আদালতের চোলকার নামক এক অস্থায়ী কর্মচারী সেই সময় শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। দাসগণুর কীর্তন শুনে সে খুবই প্রভাবিত হয় এবং মনে মনে বাবাকে নমস্কার করে প্রার্থনা করে- "হে বাবা! আমি একজন গরীব মানুষ এবং নিজের পরিবারের ঠিকমত ভরন-পোষণও করতে পারি না। যদি আমি আপনার কৃপায় বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাই, তাহলে আপনার শ্রী চরণে এসে মিছরি প্রসাদ বিতরণ করব।" ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় ও চোলকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ওর চাকরীটিও স্থায়ী হয়ে যায়। "শুভস্য শীঘ্রম্।" শ্রী চোলকর গরীব তো ছিলেনই, তায় ওঁর পরিবারও বড় ছিল। অতএব শিরডী যাতায়াতের খরচা জোটাতে যথেষ্টই অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। কথায় বলে- "নাহ্নে ঘাট পার হওয়া যায়, 'সহ্যাদ্রি' পাহাড়ও অতিক্রম করা যায়, কিন্তু গরীব গৃহস্থের পক্ষে ঘরের চৌকাঠ পার হওয়াই শক্ত।" কিন্তু নিজের সংকল্পটাও অতি শীঘ্র পুরো করার জন্য উনি উৎসুক ছিলেন। উনি মিতব্যয়ী হয়ে নিজের খরচ কমিয়ে পয়সা বাঁচাবো বলে স্থির করেন। তাই উনি বিনা চিনির চা খাওয়া শুরু করেন এবং এই ভাবে কিছু টাকা জমিয়ে শিরডী পৌঁছন। বাবার দর্শন করে তাঁর শ্রীচরণে একটা নারকেল অর্পণ করেন। নিজের সংকল্পানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে মিছরি বিতরণ করেন। বাবাকে বলেন যে "আপনার দর্শন পেয়ে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত ইচ্ছে আপনার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সেদিনই পুরো হয়ে গিয়েছিল।" মস্‌জিদে শ্রী চোলকরের আতিথেয়তার দায়িত্ব যার উপর দেওয়া হয়েছিল, তিনিও (শ্রী বাপুসাহেব যোগ) সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। ওঁরা দুজন প্রস্থান করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বাবা যোগকে বলেন- "নিজের অতিথির চায়ে ভালোভাবে চিনি মিশিয়ে দিও।" এই অর্থপূর্ণ শব্দগুলি শুনে শ্রী চোলকরের হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে এবং ওঁর খুবই আশ্চর্য্য লাগে। ওঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং উনি প্রেমেবিহ্বল হয়ে বাবার চরণে লুটিয়ে পড়েন। এদিকে বাবার এই অদ্ভুত আদেশ- "বেশী চিনি দিয়ে অতিথিকে চা দাও" শুনে যোগেরও কৌতূহল হচ্ছিল যে, এর অর্থ কি হতে পারে? বাবা শ্রী চোলকরকে সংকেত দেন, যে তিনি ওঁর চিনি ছাড়ার প্রতিজ্ঞার কথা ভালভাবেই জানতেন।

বাবা সব সময় এই কথাই বলতেন- "যদি তুমি শ্রদ্ধাসহ আমার দিকে হাত বাড়াও তাহলে আমি সর্বদাই তোমার সাথে থাকব। যদিও আমি শারীরিক রূপে এখানে বিদ্যমান, তবুও সাত সমুদ্র পারেও যা ঘটে, সে সবই আমি জানি। আমি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান, তোমার অন্তরেই আছি। যাঁর তোমার ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের হৃদয়ে বাস, তাঁরই পূজো করো। সে-ই সৌভাগ্যশালী, যে আমার সর্বব্যাপী স্বরূপের সাথে পরিচিত।" বাবা শ্রী চোলকরকে কত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন।

দুটো টিকটিকির মিলন ঃ-

এবার আমরা দুটি টিকটিকির কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করব। একবার বাবা যখন মস্‌জিদে বসেছিলেন, সেই সময় একটা টিকটিকি টিক্-টিক্ আওয়াজ করতে শুরু করে। কৌতূহল বশতঃ একজন ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "টিকটিকির আওয়াজের কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? এটা শুভ না অশুভ?" বাবা উত্তর দেন- "এই টিকটিকির বোন আজ ঔরঙ্গাবাদ থেকে এখানে আসবে। তাই এ খুশীতে নেচে বেড়াচ্ছে।" ভক্তটি বাবার কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তাই সে চুপ করে সেখানেই বসে থাকে।

এমন সময় ঔরঙ্গাবাদ থেকে একটি লোক ঘোড়ায় চেপে বাবার দর্শন করতে আসে। লোকটি তো আরেকটু এগিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু ঘোড়া ক্ষিধের চোটে আর এগোয় না। তখন সে ছোলা আনার জন্য একটা থলে বার করে এবং ধুলো ঝাড়বার জন্য সেটা যেই মাটিতে ঝাড়ে, অমনি একটা টিকটিকি বেরিয়ে সবার সামনেই সোজা দেওয়াল বেয়ে উঠে যায়। যে ভক্তটি প্রশ্ন করেছিল বাবা তাকে ব্যপারটি মন দিয়ে দেখতে বলেন। টিকটিকিটি ইতিমধ্যেই তার বোনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দুই বোন অনেকক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। কোথায় শিরডী আর কোথায় ঔরঙ্গাবাদ? কি ভাবে একটা লোক ঘোড়ায় চেপে থলেতে টিকটিকি নিয়ে সেখানে আসে এবং বাবা তাদের সাক্ষাতের কথা কিভাবে জানতে পারেন - এই সব ঘটনাগুলি খুবই আশ্চর্য্যজনক ও বাবার সর্বব্যাপকতার উদাহরণস্বরূপ।

শিক্ষা ঃ-

যে এই অধ্যায়টি মন দিয়ে পড়বে ও মনন করবে, সাই কৃপাই তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং সে পূর্ণরূপে সুখী হয়ে শান্তি প্রাপ্ত করবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১৬-১৭

শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, তার জন্য যোগ্যতা, বাবার উপদেশ, বাবার বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব চর্চিত বিষয় ঃ-

শ্রী চোলকরের সংকল্প কিভাবে পূর্ণ রূপে ফলীভূত হয়, সেটা গত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ কাহিনীতে শ্রী সাইবাবা এমনটাই ইঙ্গিত করেন যে, যদি প্রেম ও ভক্তি সহ তুচ্ছ বস্তুও অর্পণ করা হয়, তাহলেও উনি সানন্দে সেটা স্বীকার করে নেন। কিন্তু যদি ঐ একই বস্তু উদ্ধত ভাবে অর্পণ করা হত তাহলে সেটি অস্বীকৃত হয়ে যেত। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ হওয়ার দরুণ তিনি বাহ্য আচার-বিচারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না এবং বিনম্র হয়ে ও শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়া জিনিষ ভালবেসে গ্রহণ করতেন।

সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার চেয়ে বেশী দয়ালু ও হিতৈষী এই সংসারে আর কে হতে পারে? সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে যে সেই চিন্তামণি বা কামধেনুর সঙ্গেও তাঁর তুলনা হতে পারে না। যে অমূল্য ধনের উপলব্ধি সদ্-গুরুর দ্বারা হতে পারে, সেটা আমাদের কল্পনারও অতীত।

এক মহাশয়কে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছে নিয়ে বাবার কাছে আসেন, বাবা কি উপদেশ দেন, এবার সেই কথা শুনুন। একজন ধনী ব্যক্তির (দুভার্গ্যবশতঃ তার নাম মূল গ্রন্থে দেওয়া নেই) কাছে অতুল সম্পত্তি, ঘোড়া, ভূমি ও অনেক দাস-দাসী ছিল। বাবার কীর্তি তার কানে যেতেই সে নিজের এক বন্ধুকে বলে- "আমার আর কোন বস্তুর ইচ্ছে বা অভিলাষ বাকী নেই। তাই এবার শিরডী গিয়ে বাবার থেকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। আর যদি কোন রূপে সেটা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমার চেয়ে সুখী আর কে হবে?" ওঁর বন্ধু ওঁকে বোঝায়- "ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা এত সহজ নয়, বিশেষ করে তোমার মত মোহগ্রস্ত লোকের পক্ষে যে সর্বদা স্ত্রী, সন্তান ও দ্রব্য উপার্জনের চক্রে জড়িয়ে থাকে। তুমি ভুলেও কাউকে এক নয়া পয়সা দান করো না - তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্খা কে পুরো করতে পারে?" কিন্তু সেই ধনী ব্যক্তি বন্ধুর কথা উপেক্ষা করে, একটা টাঙ্গায় চড়ে শিরডী আসে এবং সোজা মস্‌জিদে এসে পৌঁছয়। শ্রী বাবার দর্শন করে তাঁর চরণে বসে প্রার্থনা করে-

"এখানে আগত ভক্তদের আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়ে দেন। একথা শুনে আমি অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি ও বেশ ক্লান্তও হয়ে গেছি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে গেলে আমার কষ্ট সফল ও সার্থক হয়ে যাবে।"

বাবা বলেন- "প্রিয় বন্ধু! একটু সবুর কর। আমি খুব শীঘ্রই তোমায় ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দেব। আমার সব কাজ নগদই হয়, আমি ঋণ রাখি না। তাই অনেকেই ধন, স্বাস্থ্য, মান, উচ্চপদ ও অন্যান্য পদার্থের ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার কাছে আসে। ভৌতিক পদার্থের ইচ্ছে নিয়ে আসা লোকের এখানে অভাব নেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসুদের আগমন খুবই দুর্লভ। আমার জন্য এই মুহূর্তটি খুবই শুভ। তোমার মত মহানুভব আমায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করার জন্য জোর দিচ্ছে। আমি খুশী হয়ে তোমাকে ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দেব।"

এই বলে বাবা ওকে নিজের কাছে বসিয়ে এদিক-ওদিকের কথা বলতে শুরু করেন। ফলতঃ ও খাণিকক্ষণের জন্য নিজের প্রশ্নের কথা ভুলে যায়। বাবা এবার একটা ছেলেকে ডেকে নন্দু মারোয়াড়ীর কাছে পাঁচ টাকা ধার করে আনতে পাঠান। ছেলেটি ফিরে এসে জানায় যে নন্দুর তো কোন হদিস নেই এবং ওর বাড়ীতে তালা ঝুলছে। এবার বাবা ওকে আরেকটি দোকানদারের কাছে পাঠান। কিন্তু এবারও ছেলেটি টাকা আনতে ব্যর্থই হয়। এই রকম ভাবে তিন-চার বার চেষ্টা করেও টাকার জোগাড় হতে পারে না।

আমরা একথা খুব ভালো ভাবে জানি যে বাবা স্বয়ং সগুণ ব্রহ্মের অবতার ছিলেন। তাই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাঁচ টাকার মত তুচ্ছ রাশির তাঁর প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাঁর তো এই টাকার কোন প্রয়োজনই হওয়ার কথা নয়। এই নাটকটি তিনি কেবল আগন্তুকের পরীক্ষার্থে রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মহাশয়ের কাছে নোটের স্তূপ ছিল। সে যদি সত্য সত্যই ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য উৎসুক হতো তাহলে এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকত না। বাবা যখন হন্নে হয়ে টাকা ধার করার জন্য ছেলেটিকে এখানে-ওখানে ছোটাচ্ছিলেন, তখন সে শুধুমাত্র দর্শক হয়ে বসে থাকত না। মহাশয় ভালভাবেই জানতেন যে বাবা নিজের কথা অনুযায়ী ঋণ অবশ্যই শোধ করে দেবেন। যদিও বাবার চাওয়া রাশি খুবই অল্প ছিল, তবুও সে নিজে থেকে পাঁচ টাকা ধার দিতে সাহস করে উঠতে পারে নি। পাঠকগণ! একটু ভেবে দেখুন, এই ধরনের ব্যক্তি বাবার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের (যেটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বস্তু) প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত হয়। বাবাকে যে সত্যি-সত্যি ভালবাসে এমন ভক্ত শুধুমাত্র দর্শক না হয়ে, তক্ষুনি

পাঁচ টাকা দিয়ে দিত। কিন্তু এই মহাশয়ের দশা তো একেবারেই ভিন্ন। সে টাকাও দেয় না, আর শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতেও রাজী ছিল না। বরং তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টায় বাবাকে অধীর হয়ে বলে- "বাবা! দয়া করে তাড়াতাড়ি আমায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করুন।" বাবা উত্তর দেন- "ওহো, এই নাটকটি তো তোমার জন্যই ছিল। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারলে না? আমি তো তোমায় ব্রহ্মদর্শণ করাতেই চেষ্টা করছিলাম। শোন তবে, সংক্ষেপে এর তাৎপর্য্য বলি। ব্রহ্ম দর্শন প্রাপ্ত করার জন্য পাঁচটি বস্তু ত্যাগ করতে হয় - যথা **১) পাঁচ প্রাণ ২) পাঁচটি ইন্দ্রিয় ৩) মন ৪) বুদ্ধি ও ৫) অহংকার। এই হলো ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতির পথ তলোয়ারের ধারে চলার ন্যায় কঠিন।**

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানুভূতির যোগ্যতা ঃ-

সামান্য মানুষের প্রায় নিজের জীবনকালে ব্রহ্মদর্শন হয় না। তার প্রাপ্তির জন্য কিছু যোগ্যতা হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক।

১) মুমুক্ষুত্ব (মুক্তির তীব্র উৎকণ্ঠা)

যদি কেউ মনে করে যে, আমি বন্ধনে আছি এবং এই বন্ধন হতে মুক্তি চাই তাহলে তার নিজের লক্ষ্যের প্রাপ্তির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করতে থাকা উচিত। প্রত্যেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন লোকই আধ্যাত্মিক পথে চলার যোগ্য।

২) বিরক্তি

লোক-পরলোকের সমস্ত পদার্থের প্রতি উদাসীনতার ভাব। ঐহ্যিক বস্তুর লাভ এবং প্রতিষ্ঠা-যতক্ষণ এদের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন না হয়, ততক্ষন কেউ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার অধিকারী হতে পারে না।

৩) অন্তর্মুখীতা

ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির রচনা এমন ভাবে করেছেন যে, ওদের স্বাভাবিক বৃত্তি সর্বদা ওদের বাইরের দিকে আকৃষ্ট করে। আমরা সর্বদাই বাইরের জগতের ধ্যান করি। যারা আত্মদর্শন ও দৈবিক জীবনের প্রতি ইচ্ছুক, তাদের নিজেদের দৃষ্টি অন্তর মুখী করে আত্মলীন হয়ে থাকা উচিত।

৪) পাপ শুদ্ধি

যতক্ষন না মানুষ দুষ্টতা ত্যাগ করে, দুষ্কর্ম না ছাড়ে, ততক্ষণ সে পূর্ণ শান্তি পায় না আর তার মনও স্থির হয় না। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে জ্ঞানলাভ কখনোই হতে পারে না।

৫) সঠিক আচরণ

যতক্ষন মানুষ সত্যবাদী, ত্যাগী ও অন্তর্মুখী হয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে জীবনযাপন করে না, ততক্ষন তার আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়।

৬) সারবস্তু গ্রহণ করা

দুরকমের বস্তু হয় - নিত্য এবং অনিত্য। প্রথমটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টি সাংসারিক সম্বন্ধীয়। মানুষকে এই দুটিরই সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বিবেক দ্বারা কোন একটিকে বেছে নিতে হয়। বিদ্বান পুরুষ অনিত্য হতে নিত্য বস্তুকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। কিন্তু মূঢ়মতি জন আসক্তিতে পড়ে অনিত্যকেই শ্রেষ্ঠ জেনে, তদোনুরূপ আচরণ করে।

৭) মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ

শরীর একটা রথ। আত্মা তার স্বামী ও সারথি। মন তাঁর লাগাম এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার ঘোড়া। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণই তার পথ। যারা মন্দবুদ্ধি ও যাদের মন চঞ্চল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি রথের দুষ্টু ঘোড়ার মত, তারা নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকে। কিন্তু যারা বিবেকশীল, নিজেদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এবং যাদের ইন্দ্রিয় সারথির উত্তম ঘোড়ার মত নিয়ন্ত্রণে থাকে, তারাই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে অর্থাৎ তারা পরমপদ প্রাপ্ত করে এবং তাদের আর পুণর্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বশ করে নেয়, সে শেষে নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করে সেই সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণুর ধামে পৌঁছে যায়।

৮) মনের পবিত্রতা

যতক্ষন নিষ্কাম কর্ম না করা হয়, ততক্ষন মনের শুদ্ধি এবং আত্মদর্শন সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ মনেই বিবেক ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা আত্ম দর্শনের পথে উন্নতি সম্ভব। অহংকারশূণ্য না হয়ে তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়-বাসনা

আত্মানুভূতির পথে বিশেষ বাধক। এই ধারণা যে আমি একটি শরীর - ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তুমি নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করতে চাও, তাহলে এই ধারণা এবং আসক্তি ত্যাগ করো।

৯) গুরুর প্রয়োজনীয়তা

আত্মজ্ঞান এত গুঢ় ও রহস্যময় যে শুধুমাত্র নিজ চেষ্টায় তার প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তাই গুরুর (যাঁর আত্মনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে গেছে) সাহায্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট করেও অন্য লোকেরা কিবা দিতে পারে, যা এমন গুরুর কৃপায় সহজেই প্রাপ্ত হতে যায়? যিনি স্বয়ং সেই পথ অনুসরণ করে এসেছেন, তিনিই নিজের শিষ্যকে খুব সহজেই আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুভূতি প্রদান করে দেন। (তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। -গীতা ৪।। ৩৪)

১০) অবশেষে ঈশ্বর-কৃপা পরমাবশ্যক

ভগবান যখন কারো উপর কৃপা করেন, তখন তাকে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রদান করে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেন। এইরূপ আত্মানুভূতি নানা প্রকারের বিদ্যা-বুদ্ধি বা শুষ্ক বেদাধ্যয়ণ দ্বারা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। এটি তো যাঁকে এই আত্মা বরণ করে, সে-ই প্রাপ্ত করতে পারে এবং তার সামনেই আত্মা নিজের স্বরূপ প্রকট করে - কঠোপনিষদে এই কথাই লেখা আছে।

বাবার উপদেশ ঃ-

বাবার এই উপদেশ যখন শেষ হল তখন বাবা ঐ মহাশয়কে বললেন- "আচ্ছা মহাশয়! আপনার পকেটে পাঁচ টাকার পঞ্চাশ গুণ (টাকার রূপে) ব্রহ্ম আছে, সেটিকে দয়া করে বাইরে বার করুন।" উনি টাকাগুলি বার করেন এবং সবার দেখে খুব আশ্চর্য্য লাগে যে মোট দশ-দশ টাকার পঁচিশটা নোট ছিল। বাবার সর্বজ্ঞতা দেখে ভদ্রলোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান এবং বাবার পায়ে পড়ে আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন। তখন বাবা বলেন- "নিজের ব্রহ্মের (নোটের) বোঁচকা গুটিয়ে নাও। যতক্ষন তুমি ঈর্ষা ও লোভ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হবে না, ততক্ষন ব্রহ্মের সত্য স্বরূপকে জানতে পারবে না। যার মন ধন, সন্তান ও ঐশ্বর্য্যেই পড়ে থাকে, সে এই আসক্তিগুলি ত্যাগ না করে ব্রহ্মকে জানবার কি করে আশা করতে পারে? আসক্তির ভ্রম ও ধন তৃষ্ণা দুঃখের এক ঘূর্ণি। তাতে অহংকার ও ঈর্ষারূপী কুমীরেরা কিলবিল করে। শুধু ইচ্ছামুক্ত

মানুষই ভবসাগর পার করতে পারে। তৃষ্ণা ও ব্রহ্মের এই রকমই সম্বন্ধ এবং এই দুটি পারস্পরিক শত্রু।

তুলসীদাস বলেছেন -

যেথায় রাম সেথায় নাই কাম, যেথায় কাম সেথায় নাই রাম।
তুলসী, কভু হয় নাই রবি-রজনী এক ধাম।।

যেখানে লোভ, সেখানে ব্রহ্মের ধ্যান বা চিন্তনের কোন অবকাশ থাকে না। তবে লোভী পুরুষ বৈরাগ্য ও মোক্ষ কি ভাবে প্রাপ্ত করতে পারে? সে কখনো শান্তি ও সন্তোষ পায় না। আর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞও হতে পারে না। যদি এক কণা লোভও মনে থেকে যায়, তাহলে বোঝা উচিত যে, সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদি একজন উত্তম সাধক ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছে বা নিজের কর্তব্যের প্রতিফল পাওয়ার মনোভাব দূর না করতে পারে এবং যদি তাদের প্রতি ওর মনে অরুচি উৎপন্ন না হয় - তাহলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। সে আত্মানুভূতি প্রাপ্ত করতে সফল হয় না। যারা অহংকারী এবং সর্বদা বিষয়-চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাদের উপর গুরুর উপদেশ বা শিক্ষার কোন প্রভাব পড়ে না। অতএব মনের পবিত্রতা অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ এর অভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার কোন গুরুত্ব নেই। সেটা শুধু দম্ভ মাত্র। অতএব যে পথটা সরল ভাবে বুঝতে পারা যায়, সেটাই অবলম্বন করা হোক। আমার ভরা ভাণ্ডার এবং আমি প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। কিন্তু পাত্রের যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাও আমায় চিন্তা করতে হয়। আমার কথা যদি তুমি মন দিয়ে শোন তাহলে তোমার নিশ্চয়ই লাভ হবে। এই মস্‌জিদে বসে আমি কখনো অসত্য ভাষণ করি না।" বাড়ীতে কোন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হলে তার সাথে তার পরিবার, বন্ধু আত্মীয়-স্বজনকেও ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। ধনী মহাশয়কে দেওয়া বাবার এই জ্ঞানভোজে মস্‌জিদে উপস্থিত সবাই সম্মিলিত হয়। বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ঐ মহাশয় ও অন্যান্য সবাই নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

বাবার বৈশিষ্ট্য ঃ–

এমন অনেক সাধু-সন্ত আছেন, যাঁরা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে জঙ্গলে পর্ণকুটীতে বা গুহায় একান্তে বাস করে নিজের মুক্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেন। তাঁরা অন্যের জন্য চিন্তা না করে সর্বদা ধ্যানস্থ থাকেন। শ্রী সাইবাবা কিন্তু এই প্রকৃতির ছিলেন না। যদিও তাঁর কোন ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান নিকট বা দূরের সম্বন্ধী বলে কেউ

ছিল না, তবুও তিনি সমাজেই বাস করতেন। তিনি শুধু চার-পাঁচটা বাড়ী থেকে ভিক্ষে করে সর্বদা নিম বৃক্ষের নীচে বসে থাকতেন। সাংসারিক কাজ করে যেতেন এবং লোকেদের শিক্ষা দিতেন সংসারে থেকে তাদের কিরকম ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের সাধু বা সন্ত খুবই কম দেখা যায়, যাঁরা ভগবদ্দর্শনের পর লোকেদের কল্যাণার্থে সচেষ্ট হন। শ্রী সাইবাবা তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তাই হেমাডপন্ত বলেছেন ঃ-

"সেই দেশ ধন্য, সেই পরিবার ধন্য এবং সেই মাতা-পিতা ধন্য, যেখানে সাইবাবার রূপে এই অসাধারণ, পরম শ্রেষ্ঠ, অমূল্য রত্ন জন্ম গ্রহণ করে।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ১৮-১৯

শ্রী হেমাডপন্তের উপর বাবার কৃপা কিভাবে হয়, শ্রী সাঠে ও শ্রীমতি দেশমুখের গল্প, উত্তম বিচারকে উৎসাহ প্রদান, উপদেশে নবীনতা, নিন্দে সম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরিশ্রমের জন্য মজুরী।

ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য লালায়িত এক ধনী ব্যক্তির সাথে বাবা কিরূপ ব্যবহার করেন, তার বর্ণনা হেমাডপন্ত গত দুই অধ্যায়ে দিয়েছেন। এবার হেমাডপন্তের উপর বাবা কিরূপ অনুগ্রহ করেন, উত্তম বিচারকে উৎসাহ দিয়ে সেগুলি ফলীভূত করেন এবং আত্মোন্নতি ও পরিশ্রমের প্রতিফলের সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ দেন - সেই সব কথাই এই দুটি অধ্যায়তে বর্ণনা করা হবে।

পূর্ব বিষয় ঃ-

এ কথা তো সবাই জানে যে, সদ্‌গুরু সব সময় নিজের শিষ্যের যোগ্যতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। তিনি উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে আত্মানুভূতির দিকে শিষ্যদের এগিয়ে দেন, যাতে ওদের মন একটুও দোলাচলে না থাকে। এই বিষয়ে কিছু লোকের এই রকম মতও শোনা যায় যে, যে শিক্ষা বা উপদেশ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় সেটা অন্যদের মাঝে প্রসারিত করা উচিত নয়। ওদের এই ধারণা যে, সেটি প্রকাশ করলে তার গুরুত্ব কম হয়ে যায়। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সংকুচিত। সদ্‌গুরু বর্ষা ঋতুর মেঘের মত সর্বত্র একরকম বর্ষণ করেন, অর্থাৎ তিনি নিজের অমৃততুল্য উপদেশ বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত করেন। প্রথমে ওর সারতত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত, তারপর সংকীর্ণতা ত্যাগ করে অন্য লোকেদের মাঝেও সেটা প্রচার করা উচিত। এই নিয়ম জাগ্রত ও স্বপ্নে-দুই অবস্থাতেই প্রাপ্ত উপদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ - বুদ্ধকৌশিক ঋষি স্বপ্নে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ 'রাম রক্ষা স্তোত্র' সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য প্রকট করে দেন। এক দয়াময়ী মা প্রয়োজনে যেরূপ ছেলেকে তেঁতো ওষুধ জোর করে খাওয়ান, সেই রকমই শ্রী সাইবাবাও নিজের ভক্তদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি নিজের পদ্ধতি গুপ্ত না রেখে সম্পূর্ণ স্পষ্টতাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাই যে ভক্তরা তাঁর উপদেশগুলি পূর্ণ রূপে পালন করত, তারা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করতে সফল হয়েছে। **শ্রী সাইবাবার ন্যায় সদ্‌গুরুই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়ে আত্মার**

দিব্যতা অনুভব করিয়ে দিতে সর্বসমর্থ। বিষয়-বাসনার প্রতি আসক্তি নষ্ট করে তিনি ভক্তদের ইচ্ছেগুলি পুরণ করেন যার ফলস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় ও জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। এই সব শুধু তখনই সম্ভব, যখন আমরা সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত করে তাঁর সেবা করার পর তাঁর প্রেম অর্জন করতে পারি। তখন ভক্তকামকল্পতরু ভগবানও আমাদের সাহায্য করেন। তিনি আমাদের কষ্ট ও দুঃখ হতে মুক্ত করে সুখী করেন। এই রকম উন্নতি কেবল সদ্‌গুরুর কৃপার দ্বারাই সম্ভব, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক। তাই আমাদের সব সময় সদ্‌গুরুরই খোঁজ করা উচিত। এবার আমরা মুখ্য বিষয়ের দিকে আসি।

শ্রী সাঠে ঃ-

অনেক বছর আগে ক্রুফর্ডের শাসন কালে শ্রী সাঠে নামে এক ভদ্রলোক কিছু খ্যাতি প্রাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু এই শাসন বম্বের লর্ড রে দমন করে দেন। শ্রী সাঠের ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার দরুণ ওঁর বেশ ধাক্কা লাগে। উনি অত্যন্ত দুঃখী ও নিরাশ হয়ে পড়েন ও বাড়ী ছেড়ে একান্তে কোন স্থানে বাস করার ইচ্ছে ওনার মনে জাগে। বেশীর ভাগ সময় মানুষ বিপদে এবং দুর্দিনেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসও এই সময়ই বাড়ে। আমরা কষ্ট দূর করার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। যদি আমাদের পাপ কর্ম অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে ঈশ্বরও আমাদের সাক্ষাৎ কোন সন্তপুরুষের সাথে করিয়ে দেন, যিনি আমাদের কল্যাণার্থে সঠিক পথ দেখান। ঠিক এমনটাই শ্রী সাঠের জীবনেও ঘটে। ওঁর এক বন্ধু ওঁকে শিরডী যাওয়ার পরামর্শ দেন। মনের শান্তির জন্য এবং ইচ্ছাপূর্তির নিমিত্তে সেখানে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে লোকের দল আসত ও আজও আসে। শ্রী সাঠের এই পরামর্শটি খুবই ভালো লাগে এবং ১৯১৭ সালে উনি শিরডী যান। বাবার সনাতন, পূর্ণব্রহ্ম, স্বয়ং দীপ্তিমান, নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বরূপ দর্শন করে ওঁর মনের সমস্ত ব্যগ্রতা নষ্ট হয়ে চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়ে যায়। উনি ভাবেন- "গত জন্মের সঞ্চিত শুভ কর্মের ফল স্বরূপই আজ আমি শ্রী সাইবাবার পবিত্র চরণে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি।" শ্রী সাঠে ছিলেন দৃঢ়চিত্ত পুরুষ। তাই উনি শীঘ্রই 'গুরু চরিত্র'-র অধ্যয়ণ শুরু করে দেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই যখন 'চরিত্র'-র প্রথম অধ্যয়ণ শেষ হয়ে যায়, তখন বাবা সেই রাতেই ওঁকে একটি স্বপ্ন দেন। স্বপ্নটি এইরূপ ছিল -

বাবা নিজের হাতে 'চরিত্র'-টি ধরে আছেন ও শ্রী সাঠেকে কোন একটি বিষয় বোঝাচ্ছেন। শ্রী সাঠে সামনে বসে মন দিয়ে শুনছেন। ঘুম ভাঙ্গতেই স্বপ্নের কথা

মনে করে ওঁর খুব আনন্দ হয়। উনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে এটা তো বাবার পরম কৃপা যে এইরূপ অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা প্রাণীদের জাগিয়ে তাদের গুরু চরিত্রর অমৃত পান করার সৌভাগ্য প্রদান করেন। উনি এই স্বপ্নটির কথা কাকা সাহেব দীক্ষিতকেও বলেন। তাঁকে শ্রী সাইবাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন- "এর অর্থ কি - এক সপ্তাহের পাঠ কি পর্য্যাপ্ত না আবার আরেকটি পাঠ শুরু করা উচিত?" শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত উচিত সুযোগ দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "হে দেব! এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আপনি শ্রী সাঠেকে কি উপদেশ দিতে চাইছেন? উনি কি পাঠ বন্ধ করবেন নাকি চালিয়ে যাবেন? উনি এক সরল হৃদয়ের ভক্ত। তাই আপনি ওঁর মনোকামনা পূরণ করুন। হে দেব! কৃপা করে ওঁকে এই স্বপ্নের যথার্থ অর্থ বুঝিয়ে দিন।" তখন বাবা বলেন- "ওঁর গুরুচরিত্র আরেক সপ্তাহ পড়া উচিত। যদি উনি মন দিয়ে পাঠ করেন, তাহলে ওঁর মন শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং শীঘ্রই ওঁর কল্যাণ হবে। ঈশ্বরও প্রসন্ন হয়ে ওঁকে এই সংসারের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে দেবেন।" এই সময় শ্রী হেমাডপন্তও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বাবার চরণ সেবা করছিলেন। বাবার কথা শুনে ওঁর মনে হয় যে 'সাঠে কেবল এক সপ্তাহের পাঠেই মনোবাঞ্ছিত ফল পেয়ে গেলেন, আর আমি গত চল্লিশ বছর ধরে 'গুরু চরিত্রে', পাঠ করছি যার পরিণাম আজ পর্যন্ত পেলাম না। ওঁর কেবল সাত দিনের শিরডী অবস্থান সফল হয়ে গেল আর আমার গত সাত বছরের (১৯১০-১৭) বাস কি ব্যর্থ হয়ে গেল? চাতক পাখীর মত আমি সর্বদা ঐ কৃপা ঘন মেঘের (বাবা) পথ চেয়ে বসে থাকি, যে কখন তিনি আমার উপর অমৃত বর্ষণ করবেন। তিনি কখন আমায় উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করবেন?' এই কথা ওঁর মনে উঠতে না উঠতেই বাবা সেগুলি তক্ষুনি জেনে গেলেন। এমনটি অনেক ভক্তরাই অনুভব করেছে যে তাদের মনের সমস্ত গতিবিধি জেনে বাবা তক্ষুনি কুবিচার দমন করে উত্তম বিচারগুলিকে উৎসাহিত করতেন। হেমাডপন্তের এই রকম মনোভাব দেখে বাবা তক্ষুণি তাঁকে শামার কাছে গিয়ে তার সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতে ও তার কাছ থেকে পনেরো টাকা দক্ষিণা আনতে আদেশ দেন। তাঁর কথা অবজ্ঞা করে, এমন সাহস কার থাকতে পারে? শ্রী হেমাডপন্ত অবিলম্বে শামার বাড়ী গিয়ে পৌঁছন। সেই সময় শামা স্নান করে ধুতি পরছিলেন। উনি বেরিয়ে এসে হেমাডপন্তকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি এখানে কি করে? মনে হচ্ছে আপনি মস্‌জিদ থেকে আসছেন। এত উদাস কেন? আপনি একলা কেন? আসুন, বসুন এবং একটু বিশ্রাম করুন। ততক্ষনে আমি পূজো ইত্যাদি সেরে নিই। পান ইত্যাদি গ্রহণ করুন। তার পর আমরা আনন্দ সহকারে কথাবার্তা বলব।" এই বলে উনি ভেতরে চলে

যান। বারান্দায় বসে-বসে হেমাডপন্তের দৃষ্টি জানলার উপরে রাখা 'নাথ ভাগবতের' উপর পড়ে। 'নাথ ভাগবৎ' শ্রী একনাথ দ্বারা রচিত মহাভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মারাঠী ভাষায় লেখা একটি প্রসিদ্ধ টীকা। শ্রী সাইবাবার আজ্ঞানুসারে শ্রী বাপুসাহেব যোগ এবং শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত শিরডীতে নিত্য ভগবতগীতা (মারাঠী টীকা যার নাম ভাবার্থ দীপিকা, সহিত) বা জ্ঞানেশ্বরী (কৃষ্ণ ও ভক্ত অর্জুন কথোপকথন), নাথ ভাগবৎ (শ্রীকৃষ্ণ - উদ্ধব কথোপকথন) এবং একনাথের মহান গ্রন্থ 'ভাবার্থ রামায়ণ' পড়তেন। ভক্তগণ বাবাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে কখনো তিনি আংশিক উত্তর দিতেন এবং কখনো ওদের ভাগবৎ তথা প্রমুখ গ্রন্থগুলি শ্রবণ করতে বলতেন। সেগুলি শুনে ভক্তরা নিজেদের প্রশ্নের পূর্ণরূপে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যেত। শ্রী হেমাডপন্ত 'নাথ ভগবৎ'-এর কিছু অংশ প্রতি দিন পড়তেন।

আজ ভোরবেলা মস্‌জিদে যাওয়ার সময় কিছু ভক্তদের সৎসঙ্গের দরুণ উনি নিজের পাঠ অসম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। জানলা থেকে গ্রন্থটি উঠিয়ে সেটি খুলতেই, নিজের অপূর্ণ পাঠের পৃষ্ঠাটি দেখে ওঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। উনি ভাবেন- "বাবা বোধহয় এই কারণেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি নিজের শেষ পাঠটুকু সেরে নিতে পারি।" এই ভেবে উনি নিজের পাঠ শুরু করেন। পাঠ পুরো হতেই শামাও বেরিয়ে আসেন এবং ওদের দুজনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়। হেমাডপন্ত বলেন- "আমি বাবার একটি বার্তা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। উনি আমাকে আপনার কাছ থেকে ১৫ টাকা দক্ষিণা আনতে ও কিছুক্ষণ আপনার সাথে কথাবার্তা বলে আপনাকে আমার সাথে মস্‌জিদে ফিরে যেতে বলেছেন।" শামা অবাক হয়ে বলেন- "আমার কাছে তো এক নয়া পয়সাও নেই। তাই আপনি টাকার বদলে দক্ষিণায় আমার পনেরোটি নমস্কার নিয়ে যান।" তখন হেমাডপন্ত বলেন- "ঠিক আছে, আমি আপনার পনেরোটা নমস্কার স্বীকার করলাম। আসুন, এবার আমরা কিছু গল্প-গুজব করি, এবং কৃপা করে বাবার কিছু লীলা আমায় শোনান, যাতে আমার পাপ নষ্ট হয়।" শামা বললেন- "তাহলে একটু বসুন! এই ঈশ্বরের লীলা অদ্ভুত। কোথায় আমি একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ আর আপনি কত বিদ্বান ব্যক্তি। এখানে আসার পর আপনি বাবার অনেক লীলা দেখেছেন। সেগুলি আপনার সামনে কি করেই বা বর্ণনা করি? আচ্ছা, এই পান-সুপুরী খান, ততক্ষণ আমি কাপড়টা পরে নিই।"

একটু পরে শামা ফিরে আসেন এবং তারপর দুজনের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন শুরু হয়-

শামা বললেন- "এই পরমেশ্বরের (বাবা) লীলা অন্তহীন, যার কোন কূল নেই। তিনি তো লীলায় অলিপ্ত থেকে সদাই বিনোদ করেন। সেগুলি আমরা চাষারা কি বা বুঝতে পারবে? বাবা স্বয়ংই কেন বললেন না? আপনার মত বিদ্বানকে আমার মত মূর্খের কাছে কেন পাঠালেন? তাঁর কার্য্যপ্রণালী বোঝা কঠিন। আমি শুধু এতটাই বলতে পারি সেগুলি লৌকিক নয়।" এই রূপ ভূমিকার সাথে-সাথেই শামা বলেন- "এবার আমার একটা ঘটনা মনে পড়েছে, যেটা আমি ব্যক্তিগত রূপে জানি। **যেমন ভক্তদের নিষ্ঠা ও ভাব হয়, বাবাও সে মতই তাদের সাহায্য করেন। কখনো-কখনো তো বাবা ভক্তের কঠিন পরীক্ষা নেওয়ার পরই তাকে উপদেশ দেন।"** 'উপদেশ' শব্দটি শুনে সাঠের গুরু চরিত্র পাঠের ঘটনাটি তক্ষুনি মনে পড়ায় হেমাডপন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। উনি ভাবেন- "বাবা বোধহয় আমার মনের অস্থিরতা দূর করার জন্যই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।" তবুও নিজের মনের কথা প্রকাশ না করে, শামার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। সেই সব কাহিনীগুলির কেবল একটাই বক্তব্য দেখা যাচ্ছিল যে, বাবার মন নিজের ভক্তদের প্রতি গভীর দয়া ও স্নেহে ভরা। লীলাগুলি শ্রবণ করে হেমাডপন্ত আন্তরিক উল্লাস অনুভব করছিলেন। এবার শামা নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন -

শ্রীমতি রাধাবাঈ দেশমুখ ঃ-

একসময় এক বৃদ্ধা. শ্রীমতি রাধাবাই দেশমুখ - খাশাবা দেশমুখের মা-বাবার নাম শুনে সঙ্গমনরের কিছু লোকেদের সাথে শিরডী আসেন। বাবার শ্রীদর্শন পেয়ে উনি অতি প্রসন্ন হন। শ্রী সাই চরণে ওঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। তাই উনি স্থির করেন যে, বাবার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন। আমরণ অনশনের দৃঢ় নিশ্চয় করে উনি নিজের বিশ্রাম গৃহে এসে অন্ন-জল ত্যাগ করেন। এই ভাবে তিন দিন কেটে যায়। আমি এই বৃদ্ধার অগ্নিপরীক্ষা দেখে ভয় পেয়ে যাই এবং বাবাকে এইরূপ প্রার্থনা করি- "দেব! আপনি আবার এটা কি শুরু করেছেন? কত লোকেদেরই তো আপনি এখানে টেনে আনেন। আপনি তো ঐ বৃদ্ধ মহিলাকে চেনেন। যদি আপনি ওঁকে কৃপা করে উপদেশ না দেন আর দুভার্গ্যবশতঃ ওঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে লোকেরা অকারণে আপনাকেই দোষ দেবে। সবাই বলবে বাবার কাছে উপদেশ না পাওয়ার জন্যই ওর মৃত্যু হয়েছে। তাই দয়া করে ওকে আশীষ ও উপদেশ দিন।" বৃদ্ধার এই রূপ দৃঢ় সংকল্প দেখে বাবা ওকে ডেকে পাঠান। মধুর উপদেশ দিয়ে ওর মনোবৃত্তি পরিবর্তিত করে বলেন- "মা! কেন মিছিমিছি তুমি যাতনা সহ্য করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন

করতে চাইছ? তুমি আমার মা এবং আমি তোমার পুত্র। তুমি আমার উপর দয়া করো এবং আমি যা বলছি সেটা মন দিয়ে শোন, আমি স্বয়ং নিজের কাহিনী তোমায় শোনাচ্ছি এবং তুমি যদি মন দিয়ে সেটা শোনো, তাহলে তুমি অবশ্যই পরম শান্তি লাভ করবে। আমার গুরুর, আমার উপর খুব দয়া ভাব ছিল। তিনি অতি উচ্চকোটীর সাধু ছিলেন। দীর্ঘকাল আমি তাঁর সেবা করি, তবুও তিনি আমার কানে কোন মন্ত্র দেননি। আমি তাঁর থেকে কখনো দূরে যেতে চাইতাম না। আমার প্রবল উৎকণ্ঠা ছিল যে, তাঁর সেবা করে যেভাবেই সম্ভব হোক, মন্ত্র প্রাপ্ত করি। কিন্তু তাঁর রীতি অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথমে আমার মাথা নেড়া করে আমার কাছে দু পয়সা দক্ষিণা চান, যেটা আমি তক্ষুনি দিয়ে দিই। যদি তুমি প্রশ্ন করো যে, আমার গুরু তো পূর্ণ নিষ্কাম ছিলেন - তবে পয়সা চাওয়াটা কি তাঁর পক্ষে শোভণীয় মানা যেতে পারে? এবং তাহলে তাঁকে সর্বরূপে বৈরাগীও বা কিভাবে বলা যেতে পারে? এর উত্তর শুধু মাত্র এইটাই যে, কাঞ্চণকে তিনি সরিয়ে দিতেন, স্বপ্নেও তাঁর এসবের প্রয়োজন ছিল না। ঐ দু পয়সার অর্থ হলো - ১) দৃঢ় নিষ্ঠা ২) ধৈর্য্য। যখন আমি এ দুটি বস্তু তাঁকে অর্পণ করে দিই, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। আমি বারোটি বছর তাঁর শ্রীচরণের সেবায় কাটাই। তিনি আমার ভরন-পোষণ করেন। অতএব আমার ভোজন বা বস্ত্রের কোন অভাব হয়নি। তিনি প্রেমের মূর্তি ছিলেন। অথবা বলা যেতে পারে যে, তিনি প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন। আমি তাঁর সঠিক বর্ণনাই বা কিভাবে করতে পারি? আমার প্রতি তাঁর খুব বেশী স্নেহ ছিল এবং এই রকম গুরু খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে মনে হতো যেন তিনি গম্ভীর মুদ্রায় ধ্যান-মগ্ন আছেন ও তখন আমরা দুজনেই আনন্দে বিভোর হয়ে উঠতাম। অষ্ট প্রহর তাঁর শ্রীমুখের দিকে এক পলকে চেয়ে থাকতাম। আমি ক্ষুধা বা তৃষ্ণার বোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁর দর্শন না পেলে আমি অশান্ত হয়ে উঠতাম। আমার তো সর্বদা তাঁর কথাই মনে হত - তাঁর চিন্তাতেই ধ্যানমগ্ন থাকতাম। অতএব আমার মন তাঁর চরণকমলেই লীন হয়ে যায়। এটা হলো এক পয়সার দক্ষিণা। ধৈর্য্য হলো দ্বিতীয় পয়সা। আমি ধৈর্য্য ধরে বহুকাল গুরুসেবা করি। এই ধৈর্য্যই তোমাকেও ভবসাগরে পার করিয়ে দেবে। ধৈর্য্যই তো মানুষের মনুষত্ব। ধৈর্য্য ধারণ করলেই সমস্ত পাপ এবং মোহ নষ্ট হয়ে সব রকমের বিপদ দূর হয় ও ভয় শেষ হয়ে যায়। এই ভাবে তুমিও নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারবে। ধৈর্য্য তো সমস্ত গুণের খনি এবং সৎবিচারের জননী। নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য যেন দুটি যমজ বোন, যাদের মধ্যে দেখা যায় প্রগাঢ় প্রেম।

"আমার গুরু আমার কাছে কোন কিছু আশা করতেন না। তিনি কখনো আমায়

অবহেলা করেননি, বরং তিনি আমাকে সর্বদা রক্ষাই করেছেন। যদিও আমি সব সময় তাঁর চরণের কাছেই থাকতাম, তবুও কদাচিত অন্য জায়গায় গেলেও তাঁর প্রতি আমার প্রেম কম হয়নি। তাঁর কৃপাদৃষ্টি সর্বদা আমার উপর বর্ষিত হত। যেরূপ কচ্ছপী নিজের প্রেম দৃষ্টি দিয়ে নিজের বাচ্চাদের লালন-পালন করে, তারা নদীর এপারে হোক অথবা ওপারে। তাই মা, আমার গুরু তো আমায় কোন মন্ত্র শেখাননি, আমি কি করে তোমার কানে মন্ত্র দিই ? কেবল এইটাই মনে রেখো যে, কচ্ছপ-মায়ের মত শুধু গুরুর প্রেমদৃষ্টির সাহায্যে আমরা সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করতে পারি। তাই **শুধু-শুধু কারো থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করার চেষ্টা কোর না। আমাকেই নিজের বিচারের ও কর্মের লক্ষ্য মানো এবং তখনই তুমি নিঃসন্দেহে পরমার্থ লাভ করবে। আমার দিকে অনন্য ভাবে দেখলে আমিও তোমার দিকে সে ভাবেই দেখব। এই মস্‌জিদে বসে আমি সত্য কথাই বলি। কোন সাধনা বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দরকার নেই। কেবল গুরুর কথায় বিশ্বাসই পর্যাপ্ত। সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখো যে, গুরুই কর্তা। সে মানুষই ধন্য, যে গুরুর মহানতা বা গুরুত্ব বুঝে তাঁকেই হরি, হর ও ব্রহ্মার (ত্রিমূর্তি) অবতার মানে।**" এই ভাবে বোঝানোর পর বৃদ্ধা মহিলা সান্ত্বনা পান ও বাবাকে প্রণাম করে উপবাস ত্যাগ করেন। এই কাহিনীটি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে এবং তার উপযুক্ত অর্থটির বিষয় বিচার করে হেমাডপন্তের খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। ওঁর মন ভরে ওঠে ও উনি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত আনন্দ-বিভোর হয়ে ওঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। ওঁর এইরূপ অবস্থা দেখে শামা জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি এই ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছেন কেন? বাবার এই ধরনের লীলা তো অনেক আছে, সেগুলির বর্ণনা আমি কোন মুখ দিয়ে করি?"

ঠিক সেই সময় মস্‌জিদে ঘন্টা বাজতে শুরু করে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন পূজো ও আরতি প্রারম্ভ হওয়ার সংকেত। তখন শামা ও হেমাডপন্ত শীঘ্রই মস্‌জিদের দিকে রওনা হন। বাপুসাহেব যোগ পূজো সবে আরম্ভ করেছেন; মহিলারা উপরে দাঁড়িয়েছিল ও পুরুষেরা নীচে মণ্ডপে। সবাই উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্রের সাথে আরতি গাইছিল। তখনই হেমাডপন্তের হাত ধরে শামা উপরে উঠে যান। উনি বাবার ডান দিকে ও হেমাডপন্ত বাবার সামনে গিয়ে বসেন। ওঁদের দেখে বাবা শামার দক্ষিণাটি চান। তখন হেমাডপন্ত উত্তর দেন- "টাকার বদলে শামা আপনাকে পনেরোটা নমস্কার পাঠিয়েছেন এবং স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন।" বাবা বললেন- "আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমায় বলো তোমরা নিজেদের মধ্যে কি বিষয়ে আলোচনা করছিলে?" তখন ঘন্টা, ঢোল ও সামূহিক গানের

আওয়াজের দিকে কান না দিয়ে হেমাডপন্ত উৎকণ্ঠাপূর্বক সেই বার্তালাপ শোনাতে শুরু করেন। বাবাও সমান উৎসাহী। তাই বালিশে হেলান ছেড়ে, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেলেন। হেমাডপন্ত বলেন- "আলোচনাটি খুবই সুখদায়ক ছিল, বিশেষ করে ঐ বৃদ্ধা মহিলাটির কাহিনী খুব অদ্ভুত লাগল। সেটি শুনে আমার মনে হলো যে, আপনার লীলা অন্তহীন এবং এই কাহিনীটির মাধ্যমে আপনি আমার উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।" তখন বাবা বললেন- "এ তো বড় আশ্চর্য্যর কথা! আমার কৃপা তোমার উপর কি করে হলো, খুলে বলত শুনি।" তখন একটু আগে শোনা ঘটনাটি, যেটি ওঁর হৃদয় পটলে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, বাবাকে শুনিয়ে ফেললেন। বাবা গল্পটি শুনে অতি প্রসন্ন হয়ে বলেন- "এর অর্থটাও কি তুমি বুঝতে পেরেছ?" তখন হেমাডপন্ত উত্তর দেন- "আজ্ঞে বাবা, বুঝতে পেরেছি। তাই আমার মনের চঞ্চলতা নষ্ট হয়ে গেছে। এবার যথার্থরূপে আমি বাস্তবিক শান্তি ও সুখ অনুভব করছি এবং আমি সত্য পথটি জেনে গেছি।" তখন বাবা বলেন- "শোন, আমার পদ্ধতিও অদ্বিতীয়। যদি এই গল্পটা মনে রাখো তাহলে তোমার খুবই লাভ হবে। **আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য ধ্যান অত্যন্ত আবশ্যক** এবং যদি তুমি এটির নিরন্তর অভ্যাস করো তাহলে কুপ্রবৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যাবে। আসক্তিশূণ্য হয়ে সর্বদাই তোমার ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। তিনি সব প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপ্ত এবং এইরূপ মন একাগ্র হয়ে গেলে তুমি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আমার নিরাকার সচিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করো। যদি তা না পারো, তবে তুমি আমায় এখানে দিন-রাত যেমনটি দেখো সেই রূপই ধ্যান করো। এই ভাবে তোমার বৃত্তিগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে যাবে এবং ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়ের পৃথকত্ব নষ্ট হয়ে, ধ্যাতা চৈতন্যের সাথে একত্ব প্রাপ্ত করে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে। কচ্ছপী নদীর এপারে থাকে ও তার বাচ্চারা ওপারে। ও তাদের দুধ খাওয়ায় না আর বুকের সাথে জড়িয়েও রাখে না। শুধু তার প্রেম-দৃষ্টি দিয়েই তাদের লালন-পালন হয়ে যায়। বাচ্চাগুলিও কিছু না করে শুধু মা'-র কথাই স্মরণ করতে থাকে। কচ্ছপ-মা শুধু তার হিতকর ও স্নেহদৃষ্টি দিয়েই ঐ ছোট-ছোট শিশুগুলিকে অমৃততুল্য আহার ও আনন্দ প্রদান করে। এমনি হচ্ছে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ।" বাবা এই শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করা মাত্রই আরতি শেষ হয়ে যায়। সবাই উচ্চস্বরে বলে ওঠে- "শ্রী সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু সাইনাথ মহারাজের জয়।" প্রিয় পাঠকগণ! কল্পনা করুন যে, আমরা সবাই এই সময় ঐ ভীড়ের ও জয়জয়কার ধ্বনির মাঝে সম্মিলিত আছি।

আরতি শেষ হওয়ার পর প্রসাদ বিতরণ হয়। বাপু সাহেব যোগ রোজকার মতন এগিয়ে আসেন এবং বাবাকে প্রণাম করে কিছু মিছরি দেন। বাবা এই মিছরি

হেমাডপন্তকে দিয়ে বলেন- "যদি তুমি এই কাহিনীটি ভাল ভাবে সব সময় মনে রাখো, তাহলে তোমার অবস্থাও এই মিছরির ন্যায় মিষ্টি হয়ে তোমার সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তুমি চিরসুখী হবে।" হেমাডপন্ত বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্তুতি করেন- "প্রভু! দয়া করে এই ভাবে সদৈব আমায় রক্ষা করবেন।" তখন বাবা হেমাডপন্তকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন যে ওঁর বাবার কথাগুলি শ্রবণ করে নিত্য মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বকে গ্রহণ করা উচিত। তখন ঈশ্বরের এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মরণ ও ধ্যানের ফলস্বরূপ তিনি স্বয়ং হেমাডপন্তের সামনে নিজের স্বরূপকে প্রকট করবেন। প্রিয় পাঠকগণ, হেমাডপন্ত সেই সময় মিছরির প্রসাদ পেয়েছিলেন, তাই আজ আমরা এই কথামৃত পান করার সুযোগ পেয়েছি। আসুন, আমরাও ঐ কথা মনন করি এবং তার সারতত্ত্ব গ্রহণ করে বাবার কৃপায় সুস্থ ও সুখী হই।

১৯ অধ্যায়ের শেষে হেমাডপন্ত কিছু আরো ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, যেগুলি এখানে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের ব্যবহারের বিষয় বাবার উপদেশ ঃ-

নিম্নলিখিত অমূল্য বচন সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং যদি সেগুলি মনে রেখে আচরণ করা হয় তো সর্বদা কল্যাণ হবে। যতক্ষন কারো সাথে পূর্ব সম্পর্ক বা সম্বন্ধ না হয়, ততক্ষন কেউ কারো সম্মুখীন হয় না। যদি কোন মানুষ বা প্রাণী তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার সাথে অভদ্রতা করো না। ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মানজনক ব্যবহার কোর।

যদি তৃষ্ণার্তকে জল, ক্ষুধার্তকে ভোজন, নগ্নকে বস্ত্র এবং আগন্তুককে নিজের দালানটি বিশ্রাম করার জন্য দাও তাহলে ভগবান শ্রীহরি তোমার উপর নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। যদি কেউ তোমার কাছে কোন জিনিষ চায় ও তোমার দেওয়ার ইচ্ছে না থাকে তো দিও না, কিন্তু তার সাথে অভদ্র ব্যবহার কোর না। সে যতই তোমার নিন্দে করুক, তবুও কটু উত্তর দিয়ে তুমি তার উপর রাগ কোর না। এই ভাবে এই ধবনের প্রসঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে চললে, তুমি নিশ্চিতই সুখী হবে। পৃথিবী ওলট্-পালট্ হয়ে যাক, কিন্তু তোমার স্থির থাকা উচিত। সব সময় নিজের স্থানে স্থির থেকে গতিমান দৃশ্যটি শান্ত হয়ে দেখো। একে-অন্যকে আলাদা করে যে ভেদ ভাবের (দ্বৈত) দেওয়াল, সেটা নষ্ট করে দাও যাতে আমাদের মিলন সহজতম হয়ে যায়। দ্বৈত ভাবই (অর্থাৎ আমি আর তুমির ভেদ-বৃত্তি) শিষ্যকে নিজের গুরুর থেকে পৃথক করে দেয়।

তাই যতক্ষন এটি ধ্বংস না হয়ে যায় ততক্ষন অভিন্নতা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। "আল্লাহ মালিক" অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান এবং তিনি ছাড়া সংরক্ষকও আর কেউ নেই। তাঁর কার্য্যপ্রণালী অলৌকিক, অতুলণীয় ও কল্পনার অতীত। তাঁর ইচ্ছেতেই সব কাজ হয়। তিনিই পথ প্রদর্শন করে সব ইচ্ছে পুরণ করে দেন। ঋনানুবন্ধের কারণেই আমাদের সাক্ষাৎ বা সঙ্গম হয়। তাই পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব নিয়ে একে-অন্যের সেবা করে সব সময় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে নিজের জীবনের লক্ষ্য (ঈশ্বর দর্শন) প্রাপ্ত করে নিয়েছে, সেই ধন্য ও সুখী। অন্যরা তো নাম মাত্রে যতক্ষন প্রাণ আছে, ততক্ষণ জীবিত থাকে।

উত্তম বিচারকে উৎসাহদান ঃ-

শ্রী সাইবাবা সর্বদা উত্তম বিচারকে উৎসাহিত করতেন। তাই আমরা যদি প্রেম ও ভক্তি ভরে অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যাই তাহলে সহজেই অনুভব করতে পারব যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আমাদের কি ভাবে সাহায্য করেন। এক সাধুর উক্তি অনুসারে, ভোরবেলা যদি তোমার মনে কোন শ্রেষ্ঠ বিচার জাগে এবং সারাদিন সেটাই স্মরণ করলে, তোমার বিবেক অত্যন্ত বিকশিত হয়ে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। হেমাডপন্ত এই উক্তিটির সত্যতা অনুভব করতে চাইতেন। তাই এই পবিত্র শিরডী ভূমিতে পরের দিনটি (বৃহস্পতিবার) নামস্মরণ ও কীর্তন করে কাটাবেন এইরূপ মনোস্থির করে শুয়ে পড়েন। পরের দিন ভোরবেলা ওঠার সময় অনায়াসেই রাম নাম মুখে এসে যায় এবং তিনি খুবই প্রফুল্ল হন। নিত্যকর্ম সেরে কিছু ফুল নিয়ে বাবার দর্শন করতে যান। দীক্ষিত 'ওয়াড়া' পার করে বুটী 'ওয়াড়া'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মধুর ভজনের আওয়াজ শুনতে পান। এক নাথের এই ভজনটি ঔরাঙ্গাবাদকর মধুর সুরে বাবার সামনে গাইছিলেন -

গুরু-কৃপার ছায়া পেয়েছি ভাই।
রাম ছাড়া তো কিছুই নাই।
অন্তরে রাম, বাহিরে রাম,
স্বপ্নেও দেখি সীতারাম।।
জাগরনে রাম, শয়নে রাম।
যেদিকে দেখি, সেদিকেই রাম।।

ভজন তো অনেক আছে, কিন্তু বিশেষ করে এই ভজনটাই ঔরাঙ্গাবাদকর কেন

বেছে নিলেন? এটা বাবারদ্বারাই পরিকল্পিত বিচিত্র যোগাযোগ নয় কি? সবাই রামনামের জপকে প্রভাবসম্পন্ন এবং ভক্তদের ইচ্ছাপূর্তি ও কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অব্যর্থ উপায় বলেন। এ বিষয়ে সব সন্তদেরও একই মত।

নিন্দেসম্বন্ধীয় উপদেশ

উপদেশ দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ সময় বা স্থানের প্রতীক্ষা না করে বাবা যথাযোগ্য সময়েই উপদেশ দিতেন। একবার এক ভক্ত বাবার অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেদের সামনে নিজের ভাইয়ের নিন্দাবাদ করছিল ও নিজের ভাইদের ওপর দোষারোপ করে এমন কটু বাক্য ব্যবহার করে যে, সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের ঘৃণা হতে লাগল। প্রায়ই দেখা গেছে যে, লোকেরা মিছিমিছি অন্যদের নিন্দে করে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সাধুপুরুষেরা পরের দোষকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। তাদের বক্তব্য যে, শুদ্ধিকরণের নানা বিধি আছে, যেমন- মাটি, জল ও সাবান ইত্যাদি, কিন্তু নিন্দুকের ধারা একেবারে ভিন্ন। ওরা অন্যদের দোষগুলিকে শুধু নিজেদের জিভ দিয়েই দূর করে দেয় এবং এই ভাবে অন্যদের নিন্দে করে তাদের উপকারই করে। তাই তারা নিশ্চিতই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নিন্দুককে ঠিক পথে আনার জন্য সাইবাবার কার্য্যপদ্ধতি একেবারেই অন্যরকম ছিল। তিনি তো সর্বজ্ঞ, তাই সেই মহাশয়ের কার্য্যকলাপ অবিলম্বেই জেনে যান। দুপুরবেলা যখন লেণ্ডীর কাছে সেই মহাশয়ের সাথে দেখা হয়, তখন তিনি একটি শূয়োরের (যে বিষ্ঠা খাচ্ছিল) দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন- "দেখ, ও কত আনন্দ সহকারে বিষ্ঠা খাচ্ছে। তুমি মন ভরে নিজের ভাইদের বিষয়ে অপশব্দ বলে বেড়াচ্ছ এবং তোমার এই আচরণটাও ঠিক ওরই সমান। **অনেক শুভকর্মের পরিণাম স্বরূপই তুমি এই মানব দেহ পেয়েছ এবং তাও যদি তুমি এই ধরনের আচরণ করো তো শিরডী তোমায় কি ভাবেই বা সাহায্য করতে পারবে?"** ভক্তটি এই উপদেশটি গ্রহণ করে সেখান থেকে চলে যায়। এইরূপ প্রসঙ্গ অনুসারেই তিনি উপদেশ দিতেন। যদি সেগুলি মনে রেখে নিত্য পালন করা হয় তাহলে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বেশী দূরে থাকে না। একটা প্রবাদ আছে যে - "যদি হরি থাকে, তাহলে খাটিয়ার উপরে খাবার মেলে।" এই কথাটি খাওয়া ও পরার ব্যাপারে সত্য হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এই কথার উপর নির্ভর করে অলস হয়ে বসে থাকে, তাহলে সে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোনই উন্নতি করতে পারবে না বরং পতনের ঘোর অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই আত্মা-অনুভূতি প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের অনবরত পরিশ্রম করা উচিত। যত চেষ্টা সে করবে, ততই সেটা তার জন্য লাভদায়ক হবে।

বাবা বলতেন- "আমি তো সর্বব্যাপী। সর্বভূতে ও চরাচরে ব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি অনন্ত।" যাদের দৃষ্টিতে তিনি সাড়ে তিন হাতের মানুষ, তাদের ভ্রম দূর করার জন্যই স্বয়ং সগুণ রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই যে ভক্তরা অনন্য ভাবে তাঁর ধ্যান করে তারা তাঁর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত করে, যেমন মাধুর্য্য ও মিছরি, ঢেউ ও সমুদ্র এবং চোখ ও কান্তির মধ্যে অভিন্নতা দেখা যায়। যারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি চায়, তাদের শান্ত এবং স্থির হয়ে ধার্মিক জীবনযাপন করা উচিত। অনাবশ্যক কটু শব্দ ব্যবহার করে কাউকে দুঃখ না দিয়ে সর্বদা ভালো কাজে ও কর্তব্যে সংলগ্ন থেকে, ভয় মুক্ত হয়ে অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যাওয়া উচিত। যারা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর লীলাগুলি শ্রবণ করে মনন করবে এবং অন্যান্য বস্তুর চিন্তা ছেড়ে দেবে, তারা নিঃসন্দেহে আত্ম-অনুভূতি প্রাপ্ত করবে। তিনি অনেককেই নাম জপ করে তাঁর শরণাগত হতে বলেছিলেন। 'আমি কে?' এই তত্ত্বটি জানবার জন্য যারা উৎসুক ছিল, বাবা তাদেরও লীলা শ্রবণ ও মনন করতে পরামর্শ দেন। কাউকে ভগবত লীলার শ্রবণ, কাউকে ভগবৎ পাদ পূজন, তো কাউকে আধ্যাত্মরামায়ণ ও জ্ঞানেশ্বরী বা অন্য ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ ও অধ্যয়ন করতে বলতেন। কাউকে রাখতেন নিজের চরণের কাছে, তো কাউকে পাঠাতেন খণ্ডোবা মন্দিরে। কাউকে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে বলতেন তো কাউকে উপনিষদ বা গীতার অধ্যয়ণ করতে বলতেন। তাঁর উপদেশের কোন সীমা ছিল না। তিনি কাউকে প্রত্যক্ষ তো কাউকে স্বপ্নে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একবার তিনি এক মদ্যপের স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার বুকে চড়ে বসেন। যখন সে মদ পান ত্যাগ করার শপথ নেয়, তখন গিয়ে বাবা তাকে ছাঁড়েন। কাউকে মন্ত্র যেমন "গুরুব্রহ্মা" আদি মন্ত্রের অর্থ স্বপ্নে বোঝান এবং কিছু হঠযোগীদের হঠযোগ ছেড়ে চুপচাপ বসে ধৈর্য্য রাখতে নির্দেশ দেন। তাঁর সহজতম পথ ও বিধির বর্ণনা করা অসম্ভব। সাধারণ সাংসারিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে অনেক উদাহরণ দিতেন। তারই একটি নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

পরিশ্রমের জন্য মজুরী ঃ-

একদিন বাবা শ্রীমতি রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ীর সামনে এসে একটা সিঁড়ি আনতে বলেন। সিঁড়িটি এনে বাবার আদেশ অনুযায়ী সেটা বামন গোঁদকরের (পাশের বাড়ীটি) বাড়ীতে লাগানো হয়। বাবা বাড়ীর উপরে চড়ে যান এবং রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের ছাদের উপর দিয়ে হয়ে অন্য দিক্ দিয়ে নীচে নেমে আসেন। বাবার অভিপ্রায়টি কেউ বুঝতে পারে না। রাধাকৃষ্ণমাঈ সে সময়ে জ্বরে কাঁপছিলেন। হতে পারে যে, ওঁর জ্বর ঠিক

করার জন্যই তিনি এইরকমটি করেন। নীচে নেমে যে লোকটি সিঁড়ি এনেছিল, তাকে তিনি দুটাকা পারিশ্রমিক দেন। তখন একজন একটু সাহস করে জিজ্ঞাসা করে যে, এতটা টাকা দেওয়ার কি মানে হয়? বাবা উত্তরে জানান যে মূল্য না দিয়ে কাউকে দিয়ে পরিশ্রম করানো উচিত নয় এবং কর্মীকে শীঘ্রই তার শ্রম অনুসারে উদার হৃদয়ে মজুরী দিয়ে দেওয়া উচিত।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২০

শ্রী কাকাসাহেবের ঝি করে শ্রী দাসগণুর সমস্যার বিলক্ষণ সমাধান, অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি, ঈশোপনিষদের শিক্ষা।

শ্রী কাকাসাহেবের ঝিয়ের দ্বারা শ্রী দাসগণুর সমস্যার কিভাবে নিষ্পত্তি হয়, তারই বর্ণনা হেমাডপন্ত এই অধ্যায়তে দিয়েছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

শ্রী সাই (ভগবান) মূলতঃ নিরাকার। কিন্তু ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়েই সাকার রূপে আবির্ভূত হন। মায়ারূপী অভিনেত্রীর সাহায্যে এই বিশ্বের বৃহৎ নাট্যশালায় তিনি এক মহান অভিনেতার ন্যায় অভিনয় করেন। আসুন, শ্রী সাইবাবার ধ্যান এবং নামস্মরণ করি ও তারপর শিরডী গিয়ে মন দিয়ে মধ্যাহ্ন আরতির পরের কার্যক্রম দেখি। আরতি শেষ হওয়ার পর শ্রী সাইবাবা মস্‌জিদের বাইরে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে অতি করুণা ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ভক্তদের উদী বিতরণ করছেন। ভক্তরাও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে চরণ ছোঁয়ার ও উদী বিতরণের আনন্দ উপভোগ করছে। বাবা দু'হাত দিয়ে ভক্তদের উদী দিতেন এবং নিজের হাতে ওদের মাথায় টিপ লাগাতেন। বাবার হৃদয়ে ভক্তদের জন্য অসীম প্রেম ছিল। তিনি ভক্তদের ভালবেসে বলতেন- "ও ভাউ! এবার যাও, খাবার খাও! অন্না! তুমিও বাড়ী যাও। বাপু! তুইও যা, গিয়ে ভাত খা!" এই ভাবে উনি প্রত্যেক ভক্তের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের বাড়ী ফিরে যেতে বলতেন। আহা! কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি। সেই যে একবার অস্ত হলো আর ফিরে পাওয়া গেল না। যদি তুমি কল্পনা করো সেই দিনগুলির কথা, তাহলে এখনো আনন্দ অনুভব করতে পারবে। এবার আমরা শ্রী সাইয়ের আনন্দময়ী মূর্তির ধ্যান করে, নম্র হয়ে, প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁর চরণ বন্দনা করে এই অধ্যায়ের কাহিনীটি আরম্ভ করছি।

ঈশোপনিষদ ঃ-

এক সময় শ্রী দাসগণু ঈশোপনিষদের উপর একটি টীকা ('ঈশাবাস্য' - ভাবার্থবোধিনী) লেখা আরম্ভ করেন। আগে এই উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বৈদিক

সংহিতার মন্ত্রের সমাবেশ থাকার দরুণ এটিকে 'মন্ত্রোপনিষদ'- ও বলা হয় এবং এতে যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায়ের অংশ সম্মিলিত হওয়ার দরুণ এটি 'রাজসনেয়ী (যজুঃ) সংহিতোপনিষদ' নামেও প্রসিদ্ধ। বৈদিক সংহিতার সমাবেশ হওয়ার জন্যই এটিকে অন্য উপনিষদের চেয়ে উচ্চতর মানা হয়। শুধু তাই নয়, অন্য উপনিষদগুলি কেবল ঈশোপনিষদে বর্ণিত গূঢ় তত্ত্বগুলির উপরই অবলম্বিত টীকা। পণ্ডিত সাতওয়লেকর দ্বারা রচিত বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ঈশোপনিষদের টীকা প্রচলিত টীকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

প্রোফেসর আর. ডি. রানাড়ের মতে ঈশোপনিষদ একটি লঘু উপনিষদ হওয়া সত্ত্বেও, তাতে অনেক বিষয়ের সমাবেশ আছে, যেটি একটি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ১৮ই শ্লোকে আত্মতত্ত্বের, একটি আদর্শ সন্তের জীবনী- যে আকর্ষণ এবং কষ্টের সংসর্গেও অচল থাকে, কর্মযোগের সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবিম্ব - যেগুলির পরে সূত্রীকরণ করা হয় এবং জ্ঞান ও কর্তব্যের পোষক তত্ত্বগুলি বর্ণিত আছে। সবশেষে এতে নীতিশিক্ষা, চমৎকারিতা ও আত্মসম্বন্ধী গূঢ় তত্ত্বের সংগ্রহ পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাধ্যমে এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটির দেশীয় ভাষায় বাস্তবিক অর্থ সহিত অনুবাদ করা কতটা দুষ্কর কাজ। শ্রীদাসগণু 'ওবী' (মারাঠী ছন্দ) ছন্দে অনুবাদ তো করেন, কিন্তু তার সার তত্ত্বটি গ্রহণ না করতে পারার দরুণ ওঁর নিজের কার্য্য উপলব্ধিতে সন্তুষ্টি হয় না। এইরূপ অসন্তুষ্ট মনে উনি অন্য অনেক বিদ্বানদের সঙ্গে শঙ্কা নিবারণের জন্য পরামর্শ ও যুক্তিতর্ক করেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান পাওয়া পান না। শ্রী দাসগণু খুবই বিচলিত হয়ে ওঠেন।

কেবল গুরুই অর্থ বোঝাতে সক্ষম ঃ-

এই উপনিষদটি বেদের মহান বিবরণাত্মক সার। এই অস্ত্রটি ব্যবহারের ফলে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীদাসগণু স্থির করেন যে, যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, একমাত্র তিনিই এই উপনিষদের বাস্তবিক অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারেন। তাই উনি শেষে শিরডী পৌঁছে বাবার দর্শন ও চরণ বন্দনা করে উপনিষদের বিষয় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটা উল্লেখ করেন এবং তার সমাধানের জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রী সাইবাবা আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, "চিন্তা কোর না, এতে মুস্কিল কি আছে? ফেরার পথে ভিলে পার্লে'তে কাকাদীক্ষিতের ঝি তোমার শঙ্কা দূর করে দেবে।" এই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত লোকেরা ভাবে

যে, বাবা কেবল ঠাট্টা করছেন এবং নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে- "এও কি সম্ভব যে একটি অশিক্ষিত ঝি এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে?" কিন্তু দাসগণুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবার কথা কখনো অসত্য হয় না কারণ তাঁর কথা বা উক্তি তো সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য।

কাকার চাকরাণী ঃ-

বাবার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উনি ভিলে পার্লে (বম্বের উপনগরী) পৌঁছে কাকাসাহেব দীক্ষিতের বাড়ীতে ওঠেন। পরের দিন দাসগণু ভোরের মৃদু নিদ্রার আনন্দ উপভোগ করছিলেন, এমন সময় একটি গরীব মেয়ের সুন্দর গান শুনতে পান। গানের মূল ভাবটি এইরূপ - একটি লাল পেড়ে শাড়ী, সেটি কত সুন্দর লাগছে, ওর জরীর আঁচলটি কত সুন্দর, ওর পাড়টি কত সুন্দর ইত্যাদি। দাসগণুর এই গানটি খুবই পছন্দ হয়। বাইরে এসে দেখেন যে নাম্‌য়ার (কাকাসাহেব দীক্ষিতের ঝি) বোন ঐ গানটি গাইছিল। মেয়েটি বাসন মাজছিল এবং ওর পরনের শাড়ীটা বেশ ছেঁড়া ছিল। এত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও ওর প্রসন্নতা দেখে শ্রী দাসগণুর মনে দয়া জাগে এবং পরের দিনই উনি শ্রী এম. ভি. প্রধানকে ঐ মেয়েটিকে একটি শাড়ী দিতে অনুরোধ করেন। রাও বাহাদুর মেয়েটিকে একটা শাড়ী কিনে দিলেন। ঠিক যেমন কোন ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তি ভাগ্যবশে মধুর খাবার পেয়ে আত্মহারা হয়ে যায়, তেমনি শাড়ীটা পেয়ে মেয়েটিরও আনন্দের সীমা রইল না। পরের দিন নতুন শাড়ীটি পরে নেচে নেচে অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। তারপরের দিন নতুন শাড়ীটি বাক্সে সামলে রেখে আগের মতই ছেঁড়া কাপড় পরে কাজ করতে আসে এবং ওর মুখে আগের মতনই প্রসন্নতার ভাব। তাই দেখে শ্রী দাসগণুর দয়া বিস্ময়ে পরিণত হয়। ওঁর এইরূপ ধারণা ছিল যে, গরীব হওয়ার দরুণই মেয়েটিকে ছেঁড়া কাপড় পরতে হতো। কিন্তু এখন ওর কাছে নতুন শাড়ী থাকতেও সেটা খুব সামলে রেখে দিয়ে ছেঁড়া কাপড়েই গর্ব ও আনন্দ অনুভব করছিল। ওর মুখে দুঃখ বা নিরাশার কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। শ্রী দাসগণু বুঝতে পারলেন যে, দুঃখ বা সুখের অনুভূতি কেবল মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই ঘটনাটি গম্ভীর ভাবে বিচার করার পর উনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভগবান যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত এবং যে ধরণের পরিস্থিতি তাঁর দয়ায় প্রাপ্ত হয়, সেটাই আমাদের জন্য লাভপ্রদ হবে। এই বিশেষ ঘটনাতে বালিকার নির্ধনাবস্থা, ওর ছেঁড়া-পুরনো কাপড়, নতুন শাড়ী দান করার লোক এবং তার স্বীকৃতি দেওয়ার লোক, এই সব ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই হয়েছিল। শ্রী দাসগণু

উপনিষদ পাঠের প্রত্যক্ষ শিক্ষা পেয়ে যান- যা কিছু আমাদের কাছে আছে, তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সারতত্ত্ব এই যে, যা কিছু হয়, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব তাতে সন্তুষ্ট থাকলেই আমাদের কল্যাণ হয়।

অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি ঃ-

উপরিউক্ত ঘটনাটির মাধ্যমে পাঠকগণ ভালভাবেই বুঝতে পারছেন যে, বাবার শিক্ষাদানের পদ্ধতি অদ্বিতীয় এবং অপূর্ব। বাবা শিরডীর বাইরে কখনো যাননি, তবুও তিনি কাউকে মচ্ছিন্দ্রগড়, তো কাউকে কোলহাপুর বা সোলাপুরে সাধনা করতে পাঠান। তিনি কাউকে দিনে তো কাউকে রাতে দর্শন দিতেন। কাউকে কাজের মধ্যে আর কাউকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন দিয়ে ওদের ইচ্ছে পূরণ করতেন। ভক্তদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কোন্-কোন্ যুক্তি ব্যবহার করেন, সেটা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই বিশিষ্ট ঘটনায় তিনি শ্রীদাসগণুকে ভিলে পার্লে পাঠিয়ে সেখানে এক ঝিকে দিয়ে তার সন্দেহ দূর করেন। যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, শ্রী দাসগণুকে বাইরে পাঠাবার কি দরকার ছিল- তিনি কি নিজে বোঝাতে পারতেন না। তাঁদের জন্য আমার উত্তর এই যে, বাবা ঠিক পথই অবলম্বন করেছিলেন। নতুবা শ্রী দাসগণু কিভাবেই বা একটি অমূল্য শিক্ষা ঐ গরীব ঝি ও তার শাড়ীর মাধ্যমে প্রাপ্ত করতেন। সমগ্র ঘটনাটি স্বয়ং সাইবাবাই রচনা করেছিলেন।

ঈশোপনিষদের শিক্ষা ঃ-

ঈশোপনিষদ মূখ্য ভাবে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উপদেশগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আনন্দের কথা এই যে এই উপনিষদের নীতি নিশ্চিত রূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর আশ্রিত, যেগুলি বিস্তৃত রূপে এতে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদের আরম্ভই এখান থেকে হয় যে, সমস্ত বস্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই আত্ম-বিষয়ক নির্দ্দেশের একটি উপসিদ্ধান্ত আছে। যে নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ তার থেকে গ্রহণ করার যোগ্য সেটা হলো যে, যা কিছু ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত হয়, তাতেই আনন্দ পাওয়া উচিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত যে ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান। তিনি যা দিয়েছেন, সেটাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। অন্যের ধনের প্রতি তৃষ্ণার প্রবৃত্তিকে শেষ করা উচিত। সারাংশ এই যে, নিজের কাছে যতটুকু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, কারণ এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছে। চরিত্র সম্বন্ধে দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কর্তব্যকে ঈশ্বর ইচ্ছা জেনে জীবন কাটানো উচিত- বিশেষতঃ সেই কর্মগুলি যেগুলি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে

উপনিষদের এই মত যে, আলস্যে আত্মার পতন ঘটে। শেষে এই বলা হয়েছে যে, যার জন্য সমস্ত প্রাণী ও পদার্থ আত্মস্বরূপ হয়ে গেছে, তাঁর মধ্যে মোহ কি ভাবে উৎপন্ন হতে পারে? এই ধরণের ব্যক্তির দুঃখের কোন কারণ থাকে না।

সর্বভূতে আত্মদর্শন না করতে পারার ফলেই নানা রকমের শোকে, অজ্ঞানতা ও ঘৃণা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সর্বত্র যাঁর 'অদ্বৈত' দৃষ্টি খুলে গেছে, সাধারণ মানবিক দুর্বলতা থেকে তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই মুক্ত হয়ে গেছেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২১

১) শ্রী বি. এইচ. ঠাকুর

২) শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর ও

৩) পন্ঢরপুরের উকিলের কাহিনী -

এই অধ্যায়ে হেমাডপন্ত শ্রী বিনায়ক হরিশচন্দ্র ঠাকুর, শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর, পুণে নিবাসী ও পন্ঢরপুরের এক উকিলের কথা বর্ণনা করেছেন। এই সব কথাগুলি অতি মনোরঞ্জক। পাঠকগণ যদি এগুলির সারাংশ ঠিক মত গ্রহণ করে নিজেদের আচরণে সেগুলি অনুসরণ করেন তাহলে তাঁরা আধ্যাত্মিক পথে অবশ্যই অগ্রসর হতে পারবেন।

প্রারম্ভ ঃ-

এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই আমরা সাধু সান্নিধ্য ও তাঁদের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হই। উদাহরণস্বরূপ হেমাডপন্ত স্বয়ং নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উনি অনেক বছর বম্বের উপনগরী বান্দ্রায় স্থানীয় ন্যায়াধীশ ছিলেন। পীর মৌলনা নামক এক মুসলমান সন্ত সেখানে থাকতেন। হেমাডপন্তের পুরোহিত ওঁকে মৌলানা সাহেবের দর্শন করতে বলেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ উনি দেখা করতে যেতে পারেন না। অনেক বছর পর যখন ওঁর শুভ সময় আসে, তখন উনি শিরডী পৌছন এবং বাবার দরবারে স্থায়ী রূপে সম্মিলিত হয়ে যান। ভাগ্যহীনদের সন্ত সমাগম কিভাবে হতে পারে? কেবল তাঁরাই সৌভাগ্যবান, যাঁরা এ ধরনের সুযোগ পান।

সন্তদের দ্বারা লোকশিক্ষা ঃ-

সন্তদের দ্বারা লোকশিক্ষার কাজ চিরকাল থেকেই বিশ্বে সম্পাদিত হয়ে আসছে। সব সন্তরাই বিভিন্ন স্থানে কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য-পূর্তি হেতু স্বয়ং প্রকট হন। যদিও তাঁদের কার্য্যস্থল পৃথক হয়, তবুও মূলতঃ রূপে একই। তাঁরা সকলেই ঐ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সঞ্চালন শক্তির অন্তর্গত মিলিত ভাবেই কাজ করেন। একে অন্যের কাজের

বিষয় অবগত থেকে প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরের সাহায্য করেন। এর প্রমাণ নিম্নলিখিত ঘটনায় পাওয়া যায়।

শ্রী ঠাকুর ঃ-

শ্রী বি. এইচ. ঠাকুর (বি. এ) রেভিনিউ বিভাগে কর্মচারী ছিলেন। উনি একবার ভূমি মাপক দলের সাথে কোন কাজে বেলাগ্রামের কাছে বডগাঁও নামক গ্রামে পৌছন। ওখানে উনি এক কানড়ী সন্তের (আপ্পা) দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। আপ্পা তখন ভক্তদের নিশ্চলদাস কৃত 'বিচার সাগর' নামক গ্রন্থের (যেটি বেদান্তের বিষয় রচিত) ভাবার্থ বোঝাচ্ছিলেন। শ্রী ঠাকুর যখন তাঁর কাছে রওনা হওয়ার অনুমতি নিতে যান, তখন তিনি বলেন- "তোমার এই গ্রন্থটি অধ্যায়ন অবশ্যই করা উচিত এবং এমনটি করলে তোমার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। যখন কালান্তরে কর্মসূত্রে তুমি উত্তর-পশ্চিম দিশায় যাবে, তখন সৌভাগ্যবশতঃ তোমার এক মহান সন্তের সাথে দেখা হবে, যিনি তোমাকে পথ প্রদর্শন করে হৃদয়ে শান্তি এবং সুখ প্রদান করবেন।"

পরে শ্রী ঠাকুরের স্থানান্তরণ জুন্নরে হয়, যেখানে নাণে ঘাট পার হয়ে যেতে হত। এই ঘাটটি খুবই দুর্গম ও পার হওয়া কঠিন বলে মানা হয়। তাই ওঁকে মোষের পিঠে চড়ে ঘাটটি পার করতে হয়। বলা বাহুল্য, তাতে ওঁর খুবই অসুবিধে ও কষ্ট হয়। এরপর কল্যাণে উনি এক উচ্চ পদে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে নানাসাহেব চাঁদোরকরের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়। ওঁর কাছে শ্রী ঠাকুর শ্রী সাইবাবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন এবং তার সাথে-সাথে ওঁর বাবাকে দর্শন করার তীব্র উৎকণ্ঠা জাগে। পরের দিনই নানাসাহেবের শিরডী রওনা হওয়ার কথা। উনি শ্রী ঠাকুরকেও শিরডী যেতে বলেন। কিন্তু ঠানের আদালতে একটা মামলার কাজে ওঁর উপস্থিতি অনিবার্য হওয়ার দরুণ উনি নানাসাহেবের সাথে যেতে পারেন না। তাই নানাসাহেব একলাই রওনা হন। এদিকে শ্রী ঠাকুর আদালতে পৌছে জানতে পারেন যে, মোকদ্দমার তারিখ পিছিয়ে গেছে। তখন নানাসাহেবের কথা না শোনার জন্য ওঁর খুব অনুতাপ হয়। এরপর উনি একাই শিরডী পৌছন এবং জানতে পারেন যে, নানাসাহেব তার আগের দিনই ফিরে গেছেন। উনি কয়েকজন বন্ধুর সাথে শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করতে যান। বাবার দর্শন পেয়ে ও তাঁর চরণে প্রণিপাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ত্রিকালদর্শী বাবা ওঁদের দেখে বলেন- "এখানকার রাস্তা অত সহজ নয়, যতটা কানড়ী সন্ত অপ্পার উপদেশ বা নাণে ঘাটে মোষের পিঠে যাত্রা। আধ্যাত্মিক পথে চলার জন্য ঘোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ এটি অত্যন্ত

কঠিন পথ।" শ্রী ঠাকুর এই শব্দগুলি শুনে, যার অর্থ উনি ছাড়া আর কেউ জানলেন না, আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন এবং ওঁর কানড়ী সন্তের কথা মনে পড়ে যায়। তখন উনি দুটি হাত জুড়ে, বাবার পায়ে নিজের মাথাটি রেখে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন যে- "প্রভু, আমার উপর কৃপা করুন এবং এই অনাথকে নিজের চরণের শীতল ছায়ায় স্থান দিন।" তখন বাবা বলেন- "যা কিছু আপ্পা বলেছিলেন সে সবই সত্য। সেগুলি নিত্য অভ্যাস করে, সেই অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। মিছি-মিছি বসে থেকে কোন লাভ হবে না। যা কিছু তুমি পড়ো, সেটা আচরণের মাধ্যমে অনুসরণ করো, নাহলে তার উপযোগিতাটাই বা কি? গুরু-কৃপা ছাড়া গ্রন্থাবলোকন ও আত্মানুভূতি নিরর্থক।" শ্রী ঠাকুর এযাবৎ 'বিচার সাগর' গ্রন্থে কেবল সিদ্ধান্তিক প্রকরণই পড়েছিলেন, তার বাস্তব প্রয়োগের রাস্তা উনি শিরডীতে জানতে পারলেন। আরেকটি ঘটনা এই সত্যের আরো বলিষ্ঠ প্রমাণ দেয়।

শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর ঃ-

পুণের এক মহাশয় শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর শ্রী সাইবাবার দর্শনাভিলাষী ছিলেন। শিরডী এসে বাবার দর্শন করে ওঁর নেত্র শীতল হয় ও মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। যথোচিত পুজো করে উনি বাবার চরণ ছুঁয়ে বলেন- "আমি অনেক কিছু পড়েছি। বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদও অধ্যায়ণ করেছি এবং পুরাণও শ্রবণ করেছি, তবুও মনের শান্তি পাইনি। তাই আমার শাস্ত্রপাঠ বৃথাই হল। একটি বিশুদ্ধ, নিরক্ষর ভক্ত আমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। যতক্ষন মনের শান্তি না পাওয়া যায়, ততক্ষন গ্রন্থাবলোকন বা বইপড়া বিদ্যেতে কোন লাভ নেই। আমি শুনেছি যে, আপনি কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টির ও মনোজ্ঞ বচন দ্বারা লোকেদের মনে সহজেই শান্তি স্থাপনা করে দেন। তাই শুনে আমিও এখানে এসেছি। কৃপা করে এই দাসকেও আশীর্বাদ দিন।" তখন বাবা নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন-

ঘোড়ার নাদির নটা গুলি (নবধা ভক্তি) ঃ-

"এক সময় এক সদাগর এখানে আসে। ওর সামনেই একটি ঘোটকী গোবর নির্গত করে। জিজ্ঞাসু সদাগর নিজের ধুতির এক কোণ বিছিয়ে তাতে নাদির ন'টা গুলি রেখে নেয় এবং এইভাবে ওর মন শান্ত হয়।" শ্রী পাটন্‌কর এই কাহিনীটির কোনই অর্থ বুঝতে পারেন না। তাই উনি শ্রী গণেশ দামোদর ওরফে দাদা কেলকরকে জিজ্ঞাসা করেন- "বাবার কথার অভিপ্রায় কি হতে পারে?" কেলকর বলেন- "বাবা

যা কিছু বলেন, সেটা আমি নিজেও ভালোভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু তাঁরই প্রেরণায় আমি যা বুঝতে পেরেছি, সেটা তোমায় বলছি। ঘোটকী হলো ঈশ্বর-কৃপা এবং ন'টি গুলি হচ্ছে নবধা ভক্তি। ১) শ্রবণ ২) কীর্তন ৩) নামস্মরণ ৪) পাদসেবন ৫) অর্চণ ৬) বন্দন ৭) দাস্যতা ৮) সখ্যতা ৯) আত্মনিবেদন- এইগুলি হলো ভক্তির নটি প্রকার। এর মধ্যে থেকে যদি একটাও নির্ভূল ভাবে বা যথার্থরূপে অনুসরণ করা হয়, তাহলে ভগবান শ্রীহরি অতি প্রসন্ন হয়ে ভক্তের বাড়ীতে প্রকট হবেন। সমস্ত সাধন, যেমন- জপ, তপ, যোগাভ্যাস এবং বেদ পাঠ যতক্ষন ভক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, ততক্ষন সব কিছু শুষ্কই থেকে যায়। ভক্তি ভাবের অভাবে বেদজ্ঞানী বা ব্রহ্মাজ্ঞানীর খ্যাতি নিরর্থকই মানা উচিত। প্রয়োজন কেবল পূর্ণ ভক্তির। নিজেকেও ঐ সদাগরের ন্যায় মনে করে উৎকণ্ঠাপূর্বক সত্যের খোঁজ করে ন' প্রকারের ভক্তি প্রাপ্ত করো। তখন তুমি দৃঢ়তা ও মানসিক শান্তি লাভ করবে।" পরের দিন যখন শ্রী পাটন্‌কর বাবাকে প্রণাম করতে যান, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি, তুমি নাদির নটা গুলি জোগাড় করলে?" উনি জবাব দেন যে তিনি অতি দীন। বাবার কৃপা ছাড়া তাঁর পক্ষে সেগুলি সহজে একত্রিত করা সম্ভব নয়। বাবা তখন ওঁকে আশীর্বাদ দিয়ে সান্ত্বনা দেন- "তুমি সুখ ও শান্তি লাভ করবে।" এই কথা শুনে শ্রী পাটন্‌করের আনন্দের সীমা রইল না।

পণ্ঢরপুরের উকিল ঃ-

ভক্তদের দোষ দূর করে বাবা তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতেন। এই বিষয়ে তাঁর ত্রিকালজ্ঞতার একটি ছোট কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে। এক সময় পণ্ঢরপুর থেকে এক উকিল শিরডী আসেন। বাবাকে দর্শন করে প্রণাম করেন। কিছু দক্ষিণা দিয়ে এক কোণে বসে কথাবার্তা শুনছিলেন। বাবা ওঁর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেন- "লোকেরা কত ধূর্ত! এখানে এসে পা ছোঁয় আর দক্ষিণা দেয়, কিন্তু আড়ালে গাল দেয়। কি আশ্চর্য্যের কথা, তাই না?" এই কথাটি উকিলকে ইঙ্গিত করে বলেন এবং ওঁকে সেটা হজম করতে হয়। আর কেউ এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু উকীল সাহেব এর গুঢ়ার্থ বুঝতে পারেন এবং নতশির হয়ে সেখানে বসে থাকেন। 'ওয়াড়া'য় ফিরে উকিল মহাশয় কাকাসাহেব দীক্ষিতকে বলেন- "বাবা যে কথাটি আমার দিকে লক্ষ্য করে বলেন, সেটা সত্যই। তিনি আমায় সতর্ক করেন যে, আমার কারো নিন্দে করা উচিত নয়। একবার উপন্যায়াধীশ শ্রী নুলকর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পণ্ঢরপুর থেকে শিরডী আসেন। এই নিয়ে বাররুমে ওঁর সম্বন্ধে বেশ আলোচনা

হয়। সমালোচনার বিষয় ছিল- যে রোগে উনি ভুগছেন সেটা কি ওষুধ না খেয়ে কেবল শ্রী সাইবাবার শরণে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে? এবং শ্রী নুলকরের মতো একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কি এই ধরনের পথ অবলম্বন করা উচিত? ঐ সময় শ্রী নুলকরের সাথে-সাথে শ্রী সাইবাবারও উপহাস করা হয়। আমিও সেই আলোচনায় যোগ দিই। শ্রী সাইবাবা আমার সেই দূষিত আচরণের উপর আলোকপাত্ করলেন। এইটি আমার উপহাস নয়, বরং উপকার। তিনি আমায় উপদেশ দিলেন যে অযথা পরচর্চা বা পরনিন্দা করা উচিত নয়। অন্যদের কাজে বাধা দিয়ে কোন লাভ হয় না।"

শিরডী ও পণ্ঢরপুরের মধ্যে প্রায় ৩০০ মাইলের দূরত্ব। তবুও বাবা তাঁর সর্বজ্ঞতার প্রভাবে 'বাররুমে' যা কিছু ঘটেছিল সেটা ভালো ভাবেই জানতেন। রাস্তায় নদী, জঙ্গল বা পাহাড় তাঁর সর্বজ্ঞতায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি সবার হৃদয়ের গুহ্য কথা জানতেন এবং তাঁর কাছে কিছুই লুকানো থাকে নি। কাছের বা দূরের বস্তু তাঁর কাছে দিনের আলোর ন্যায় জাজ্বল্যমান ছিল এবং তাঁর সর্বব্যাপক দৃষ্টি হতে কিছু আড়াল থাকতে পারত না। এই ঘটনার দ্বারা উকিল মহাশয় এই শিক্ষা পান যে, কখনও কারো ছিদ্রান্বেষণ এবং নিন্দে করা উচিত নয়। এই ঘটনাটি শুধু উকিল সাহেবের জন্যই নয় বরং সবার জন্য শিক্ষাপ্রদ। শ্রী সাইবাবার মহানতা কেউই মাপতে পারেনি, আর তাঁর অদ্ভুত লীলার কোন সীমাও খুঁজে পায়নি। তাঁর জীবনীও তদোনুরূপই, কারণ তিনি স্বয়ং পরমব্রহ্ম।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ তৃতীয় বিশ্রাম

অধ্যায় - ২২

সর্প-দংশন হতে রক্ষা- ১) শ্রী বালাসাহেব মিরীকর, ২) শ্রী বাপুসাহেব বুটী, ৩) শ্রী আমীর শক্কর; শ্রী হেমাডপন্ত, বাবার মতামত

সাপ মারার বিষয়ে বাবার পরামর্শ ঃ-

শ্রী সাইবাবার ধ্যান কি ভাবে করা যেতে পারে? ঐ সর্বশক্তিমানের প্রকৃতি বা স্বরূপ অত্যন্ত গভীর - যার বর্ণনা করতে বেদ এবং সহস্রমুখী অনন্তনাগও নিজেকে অক্ষম মনে করেন। ভক্তদের অনুরাগ তাঁর স্বরূপ বর্ণনায় তৃপ্ত হয় না। ওদের ত দৃঢ় ধারণা যে, কেবল বাবার শ্রীচরণেই আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। তাঁর চরণের ধ্যান ছাড়া জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যপ্রাপ্তির অন্য কোন পথ তাদের জানা নেই। হেমাডপন্ত ভক্তি ও ধ্যানের এক অতি সরল পথ উল্লেখ করছেন -

কৃষ্ণ পক্ষ আরম্ভ হতেই চন্দ্রমা প্রতি দিন ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে এবং তার প্রকাশও ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। শেষে অমাবস্যার দিন চাঁদ সম্পূর্ণ বিলীন থাকার দরুণ চারিদিকে রাতের ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শুক্লপক্ষ শুরু হতেই সবাই চন্দ্রদর্শনের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। এরপর দ্বিতীয়ায় চাঁদ যখন স্পষ্ট দেখা যায় না, তখন লোকেদের গাছের দুটি শাখার মাঝখান থেকে চাঁদ দেখতে বলা হয়। যখন এই ভাবে শাখাগুলির মাঝখান থেকে মন দিয়ে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হয়, তখন দূরে আকাশে ছোট্ট চন্দ্র রেখা দৃষ্টিগোচর হতেই মন অতি প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেই আমাদের বাবার শ্রীদর্শনের চেষ্টা করা উচিত। বাবার ছবির দিকে দেখো! আহা, কত সুন্দর। তিনি পা মুড়ে বসে আছেন এবং ডান পা টি বাঁ হাঁটুর উপর রাখা। বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি ডান পায়ের উপর ছড়ান রয়েছে। তর্জনী ও মধ্যমার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল। এই ভঙ্গীমার দ্বারা বাবা বোঝাতে চাইছেন- যদি তুমি আমার আধ্যাত্মিকে দর্শন করতে ইচ্ছুক তাহলে অভিমানশূণ্য ও বিনম্র হয়ে উক্ত দুই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে আমার চরণের আঙ্গুলের ধ্যান করো। তবেই তুমি সেই সত্য-স্বরূপ দর্শন করতে সফল হবে। ভক্তি প্রাপ্ত করার এটা সব চেয়ে সরল পথ।" এবার আসুন, একটু শ্রী সাইবাবার জীবনী অবলোকন করি। শিরডী জায়গাটি বাবার অবস্থানের ফলস্বরূপই তীর্থস্থল হয়ে ওঠে। চারিদিক

দিয়ে লোকেদের ভীড় দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে এবং ধনী ও নির্ধন সবারহ কোন-না-কোন ভাবে লাভ হচ্ছে। বাবার অসীম প্রেম, তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান ভাণ্ডার এবং সর্বব্যাপকতার বর্ণনা করার সামর্থ্য কার আছে? ধন্য তো সে-ই, যে বাবার একটি বা সবকটি গুণের অনুভূতি পেয়েছে। কখনো-কখনো তিনি ব্রহ্মে লীন থাকার দরুণ দীর্ঘ সময় অবধি মৌন ধারন করে থাকতেন। আবার কোন-কোন সময় এই চৈতন্যধন ও আনন্দ-মূর্তি ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। কখনো দৃষ্টান্ত দিতেন তো কখন হাসি-ঠাট্টা করতেন। কখনো সরল-স্বাভাবিক চিত্তে থাকতেন তো কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর শ্রীমুখের দর্শন, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা এবং লীলা শোনবার ইচ্ছে সদা অতৃপ্তই থেকে যেত। তবুও আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। বৃষ্টির জলবিন্দুর গণনা হতে পারে, বাতাসকে চামড়ার থলিতে সঞ্চিত করা যায়, কিন্তু বাবার লীলার থৈ অথবা কূল-কিনারা কেউ পেতে পারবে না। এবার সেই লীলার একটি লীলা শ্রবণ করুন। ভক্তদের বিপদের কথা আগেই জেনে বাবা তাদের সময়মতো সতর্ক করে দিতেন। শ্রী বালাসাহেব মিরীকর (সরদার কাকাসাহেবের সুপুত্র ও কাপরগাঁও-য়ের মামলৎদার) একবার সরকারী কাজে চিত্‌লী যাচ্ছিলেন। সেই সময় পথে (শিরডীতে) শ্রী বাবার দর্শনার্থে উপস্থিত হন। মস্‌জিদে গিয়ে বাবার চরণ বন্দনা করেন এবং প্রতি বারের ন্যায় স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা শুরু হয়। বাবা ওঁকে সতর্ক করে বলেন-"তুমি যেখানে বসে আছো, সেটাই দ্বারকামাঈ। তিনি নিজের সন্তানদের সমস্ত দুঃখ এবং বিপদ আপদ দূর করে দেন। এই মস্‌জিদ মা পরম কৃপাময়ী। তিনি সরল হৃদয়ের ভক্তদের সমস্ত বিপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। তাঁর কোলে যে একবার বসে, তার সমস্ত কষ্ট দুর হয়ে যায়। যে তাঁর ছত্রছায়ায় বিশ্রাম করে, সে আনন্দিত ও সুখী হয়।" এর পর বাবা ওঁকে আশীর্বাদ দেন।

শ্রী বালাসাহেব রওনা হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে বাবা বলেন- " তুমি কি লম্বা বাবাকে (অর্থাৎ সাপ) চেনো?" এবং নিজের বাঁ মুঠো বন্ধ করে ডান কনুইয়ের কাছে এনে হাতটাকে সাপের মত নাড়িয়ে বললেন- "এ বড়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু দ্বারকামাঈয়ের সন্তানদের সে কি ক্ষতি করতে পারে? যখন স্বয়ং দ্বারকামাঈ ওদের রক্ষা করেন, তখন সাপের সামর্থ্যই বা কি?" সেখানে উপস্থিত লোকেরা এবং মিরীকর এই ভাবে সাবধান করার কারণ জানতে চাইতেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো ছিল না। বাবা শামাকে মিরীকরের সাথে চিতলী যেতে আদেশ দেন। বালাসাহেবকে শামা এই খবরটি দিতেই, বালাসাহেব বলেন- "পথে অনেক অসুবিধে হতে পারে। তাই শুধ-শুধু আপনার কষ্ট করার কি দরকার?" বালাসাহেবের মত শামা বাবাকে জানান। বাবা

বলেন- “আচ্ছা, ঠিক আছে, যেও না। যাতে ভালো হয় সেই রকম কাজই করা উচিত। যা ঘটবার, সে তো ঘটবেই।” এরপর বালাসাহেব খানিকক্ষণ চিন্তা করে শামাকে তাঁর সাথে চিত্‌লী যেতে অনুরোধ করেন। তখন আবার বাবার অনুমতি নিয়ে শামা বালাসাহেবের সাথে টাঙ্গায় রওনা হন। ওঁরা নটায় চিত্‌লী পৌছন ও মারুতি মন্দিরে গিয়ে ওঠেন। দপ্তরে কর্মচারীরা তখনও এসে পৌছয়নি বলে ওঁরা এদিক-ওদিককার কথা বলতে লাগলেন। বালাসাহেব মাদুরের উপর দৈনিক পত্র নিয়ে শান্ত হয়ে বসেছিলেন। ওঁর ধুতির উপরের অংশটি কোমরের কাছে পড়েছিল। তার এক ভাগের উপর একটা সাপ বসেছিল। কারো চোখ সেদিকে যায়নি। ওদিকে সাপ হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করতে-করতে এগিয়ে চলে। এই আওয়াজটা শুনে চাপড়াসীটা দৌড়ে আসে। সাপ দেখে সে ‘সাপ - সাপ’ বলে উচ্চস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। বালাসাহেব অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেন। শামাও হতবাক্‌ হয়ে যান। উনি ও অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা ধীরে-ধীরে সেখান থেকে সরে গিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হলেন। সাপটা ধীরে-ধীরে কোমর থেকে নীচে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে মেরে ফেলা হল। বাবা যে বিপদের ভবিষ্যবাণী করেছিলেন, সেটা এই ভাবে কেটে গেল। বলা বাহুল্য, সাই চরণে বালাসাহেবের প্রেম আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

বাপু সাহেব বুটী ঃ-

একদিন মহান জ্যোতিষী শ্রী নানাসাহেব ডেঙ্গলে বাপুসাহেব বুটীকে (যিনি সেই সময় শিরডীতেই ছিলেন) বলেন- “আজকের দিনটা তোমার জন্য অত্যন্ত অশুভ এবং তোমার জীবন সংকটাপন্ন।” এই কথা শুনে বাপু সাহেব অত্যন্ত অধীর হয়ে ওঠেন। প্রতিদিনের ন্যায় যখন উনি বাবার দর্শন করতে যান, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- “নানা কি বলছে? ও তোমার মৃত্যুর ভবিষ্যবাণী করছে? কিন্তু তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।” সন্ধ্যাবেলায় বুটীসাহেব নিজের শৌচ-গৃহে বা একটা সাপ দেখতে পান। ওঁর চাকরও সাপটা দেখতে পেয়ে সেটাকে মারবার জন্য একটা পাথর তুলে নেয়। বাপুসাহেব একটা লম্বা লাঠি আনতে পাঠান। কিন্তু লাঠি আনার আগেই সাপটা চলতে শুরু করে এবং শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবার অভয়বাণীর কথা স্মরণ করে বাপুসাহেব খুবই খুশী হন।

অমীর শক্কর ঃ-

কোরলে গ্রামের (তালুক কোপর গ্রাম) আমীর শক্কর নামে এক গ্রাম্য মুচি ছিল।

সে বান্দ্রাতে দালালীর কাজ করতো। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে তার গণনা করা হতো। একবার সে গেঁটে বাত রোগে কষ্ট পাচ্ছিল। যখন 'খোদা'র কথা মনে পড়ে, তখন সে কাজ-কর্ম ছেড়ে শিরডী চলে আসে এবং বাবার কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করে। তখন বাবা ওকে 'চাওড়ী'-তে থাকতে আজ্ঞা দেন। 'চাওড়ী' সে সময় একটি অস্বাস্থ্যজনক জায়গা হওয়ার দরুণ এই ধরনের রোগীদের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। গ্রামের অন্য যে কোন জায়গা তার জন্য বেশী ভালো হতে পারত। কিন্তু বাবার কথাই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ও মুখ্য ঔষধি। বাবা ওকে মস্‌জিদে আসতে দিতেন না ও 'চাওড়ী'-তেই থাকতে বলেন। সেখানে থেকে ওর খুব লাভ হয়। বাবা ভোরবেলা ও সন্ধ্যাবেলায় 'চাওড়ী'-র পাশ দিয়ে হয়ে যেতেন এবং একদিন অন্তর শোভাযাত্রার সাথে সেখানে আসতেন ও বিশ্রাম করতেন। তাই আমীর বাবার সান্নিধ্যও সহজেই পেয়ে যেত। আমীর সেখানে পুরো ন' মাস ছিল। কিন্তু এক সময় ওর কোন এক অন্য কারণে ওখানে থাকতে-থাকতে বিরক্তি ধরে যায়। তাই সেই জায়গাটি ছেড়ে চুপিচুপি সে কোপর গ্রামের এক ধর্মশালায় এসে ওঠে। সেখানে একটি ফকির ওর কাছে জল চায়। লোকটির প্রায় মরো মরো অবস্থা। আমীর তাকে জল দেয় এবং জলটা খেতেই সে মারা যায়। এবার আমীর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার মনে হয় - ধর্মশালার অধিকারীদের এ বিষয়ে খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে- "প্রথম ও একমাত্র সংবাদ দাতা হিসেবে আমিই ধরা পড়ব।" এইবার অনুমতি না নিয়ে শিরডী ছাড়ার জন্য আমীর সত্যি-সত্যিই অনুতপ্ত বোধ করছিল। বাবার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে ও বাবার নাম নিতে-নিতে সূর্য্য উদয় হওয়ার আগেই শিরডী পৌঁছে চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। তারপর ও 'চাওড়ী'তে বাবার ইচ্ছে ও আজ্ঞানুসারে থাকতে শুরু করে এবং শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে যায়। একবার মাঝ রাতে বাবা জোরে ডাক দেন- "ও আব্দুল! কোন দুষ্ট প্রাণী আমার বিছানায় উঠেছে।" আব্দুল লণ্ঠন নিয়ে বাবার বিছানা নিরীক্ষণ করে, কিন্তু সেখানে কিছু পাওয়া যায় না। বাবা ভালোভাবে সমস্ত জায়গাটি দেখতে বলেন। তিনি নিজের ডাণ্ডাটাও মেঝেতে ঠোকেন। বাবার এই লীলা দেখে আমীরের মনে হয় যে বাবা বোধহয় কোন সাপের আশঙ্কা করছেন।

দীর্ঘকাল বাবার সাথে থাকার দরুন আমীর বাবার কথা বা ইঙ্গিত বুঝতে পারত। হঠাৎ নিজের বিছানার কাছে ও কিছু একটা নড়তে দেখে। আব্দুলকে লণ্ঠনটা আনতে বল্লে। সেই আলোয় দেখা যায় যে, একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। তক্ষুনি সেটাকে মেরে ফেলা হয়। এই ভাবে বাবা সময় মতন সতর্ক করে আমীরের প্রাণ

রক্ষা করেন।

বিছে ও সাপ ঃ-

১) বাবার আজ্ঞানুসারে কাকাসাহেব দীক্ষিত শ্রী একনাথ মহারাজের দুটি গ্রন্থ - ভাগবৎ ও ভাবার্থ রামায়ণ নিত্য পাঠ করতেন। একবার যখন কাকাসাহেব রামায়ণ পাঠ করছিলেন সেই সময় হেমাডপন্তও শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। নিজের মা'য়ের আদেশানুসার হনুমান কিভাবে শ্রীরামের শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা নেন - এই প্রসঙ্গ চলছিল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল ও হেমাডপন্তেরও অবস্থা একই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিছে ওঁর কাঁধের উপর এসে বসে, কিন্তু সেদিকে ওঁর কোনই খেয়াল ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরকে স্বয়ং শ্রোতাদের রক্ষা করতে হয়। হঠাৎ ওঁর চোখ কাঁধের উপর পড়ে এবং তখন উনি বিছেটাকে দেখতে পান। তাকে দেখে মৃতপ্রায় মনে হচ্ছিল - যেন সেও কথার আনন্দে তন্ময় হয়ে গেছে। হরি ইচ্ছা জেনে ও পাঠে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করে, হেমাডপন্ত বিছেটাকে নিজের ধুতির দুই আগায় জড়িয়ে দূরে বাগান ফেলে আসেন।

২) আরেকবার সন্ধ্যার সময় কাকাসাহেব নিজের 'ওয়াড়া'তে বসে ছিলেন। ঠিক সেই সময় গর্তের মধ্যে দিয়ে একটা সাপ সেখানে ঢুকে গুটিয়ে রইল। আলো আনাতে প্রথমটায় একটু চমকে যায়, কিন্তু পরে সেখানেই চুপটি করে বসে থাকে। অনেকেই লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ছুটে আসে, কিন্তু সে এমন একটা সুরক্ষিত স্থানে বসেছিল যে, সেখানে কারো মারের কোন লাভ হত না। লোকেদের হৈ-চৈ শুনে সাপটা শীঘ্রই সেই গর্তটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । তারপর সবাই একটু শান্তি পেলো।

বাবার মতামত ঃ-

একজন ভক্ত, মুক্তারাম বলল- "যাক্, ভালোই হল। একটি প্রাণীর প্রাণ তো বাঁচল।" শ্রী হেমাডপন্ত তার কথা অবজ্ঞা করে বলেন- "সাপ জাতীয় জীবদের মেরে ফেলাই উচিত।" এই ভাবে এই বিষয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। এক দলের মত সাপ ও তার মত জন্তুদের মেরে ফেলাই উচিত। অন্য দলের মত এর ঠিক বিপরীত। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল, তাই কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই বিবাদ স্থগিত করতে হলো। পরের দিন এই প্রশ্নটি বাবার সামনে তোলা হয়। তখন বাবা স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন- "সব জীব ও প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন - তা সে সাপ হোক্ বা বিছে। তিনিই এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কর্তা এবং প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন সাপ, বিছে,

ইত্যাদি ওঁর আজ্ঞাই পালন করে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না। তাই আমাদের সব প্রাণীদের ভালোবাসা উচিত, করুণা করা উচিত। সংঘর্ষ ও বৈষম্য বা মারামারি ছেড়ে শান্ত মনে জীবন যাপন করা উচিত। ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করেন।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ২৩

যোগ ও পেঁয়াজ, শামার সর্পদংশন থেকে আরোগ্যলাভ, বিসুচিকা (কলেরা) নিবারণার্থে নিয়মের উল্লংঘন, গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা।

প্রস্তাবনা ঃ-

বস্তুতঃ মানুষ ত্রিগুণময় (তিন গুণ অর্থাৎ সত্ব-রজ-তম) এবং মায়ার প্রভাবে তার এই ধরনের ধারণা হয় যে 'আমি শরীর বা দেহ'। দৈহিক বুদ্ধির আবরণে এইরূপ ধারণা হয় যে, 'আমি কর্তা ও ভোগী'। এইভাবে মানুষ অনেক রকম কষ্টে নিজেকে জড়িয়ে নেয়। তারপর আর মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না। **মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে গুরুর শ্রীচরণে অটল প্রেম ও ভক্তি।** মহানায়ক ভগবান সাই ভক্তদের পূর্ণ আনন্দ প্রদান করে নিজ স্বরূপের তাদের রূপান্তরিত করেছিলেন। **উক্ত কারণে আমরা শ্রী সাইবাবাকে ঈশ্বরেরই অবতার মানি।** কিন্তু তিনি সর্বদা বলতেন যে- "আমি তো ঈশ্বরের এক দাস।" ঈশ্বর-অবতার হওয়া সত্ত্বেও মানুষদের কিরূপ আচরণ করা উচিত এবং নিজের বর্ণের কর্তব্যগুলি কিভাবে পালন করা উচিত, তারই উদাহারণ তিনি লোকেদের সামনে প্রস্তুত করেন। তিনি কারো সাথে কোন রকমের স্পর্ধা করেননি আর কারো কোন ক্ষতিও করেননি। যিনি সব জড় ও চেতন পদার্থে ঈশ্বরকেই দর্শন করতেন, তাঁর পক্ষে বিনম্র হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি কাউকে উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করেন নি, সদাই বলতেন- "আমি ঈশ্বরের এক দাস।" **"অল্লাহ মালিক", এটিই সর্বক্ষণ উচ্চারন করতেন।** আমরা অন্যান্য সন্তদের সাথে পরিচিত নই আর এও জানি না যে তাঁরা কি রূপ আচরণ করতেন অথবা তাঁদের দিনচর্যা ইত্যাদি কি ছিল? ঈশ্বর কৃপায় শুধু এতটাই জানি যে, তাঁরা অজ্ঞান ও বদ্ধ জীবদের জন্য অবতীর্ণ হন। **শুভ কর্মের ফলস্বরূপই আমাদের সন্ত কথা এবং লীলা শ্রবণ করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাছাড়া নয়।** এবার আমরা মুখ্য কাহিনীর দিকে আসি।

যোগ এবং পেঁয়াজ ঃ-

একবার একজন যোগাভ্যাসী নানাসাহেব চাঁদেরকরের সাথে শিরডী আসেন। উনি পাতঞ্জলি যোগসূত্র ও যোগশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থও বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন,

কিন্তু ব্যবহারিক অনুভব হতে বঞ্চিত ছিলেন। মন একাগ্র না হওয়ার দরুণ অল্পক্ষণের জন্যও ধ্যানের মাধ্যমে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারতেন না। যদি বাবার কৃপা হয়, তাহলে তাঁর কাছে দীর্ঘ সমাধি অবস্থা প্রাপ্তির বিধি জানা যেতে পারে, এই ধারণা নিয়ে উনি শিরডী আসেন। মস্‌জিদে পৌঁছে দেখেন যে, বাবা রুটি আর পেঁয়াজ খাচ্ছেন। এই দেখে ওঁর মনে হয় যে, বাসি রুটি আর কাঁচা পেঁয়াজ খান যিনি, এমন ব্যক্তি আমার সমস্যা কি ভাবে দূর করবে?" বাবা অন্তর্জ্ঞান দিয়ে ওঁর মনের কথা জেনে তক্ষুনি নানাসাহেবকে বলেন- "ও নানা, যার পেঁয়াজ হজম করার শক্তি আছে, তাকেই সেটা খাওয়া উচিত, অন্যদের নয়।" এই শব্দগুলি শুনে যোগী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বাবার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শুদ্ধ ও নিষ্কপট ভাবে নিজের সমস্যাগুলি বাবার সামনে রেখে তাদের সমাধান প্রাপ্ত করেন। এই ভাবে সন্তুষ্ট ও সুখী হয়ে বাবার দর্শন করে ও উদী নিয়ে তিনি শিরডী থেকে প্রস্থান করেন।

সর্পদংশন থেকে শামার আরোগ্যলাভ ঃ-

কাহিনীটি শুরু করার আগে হেমাডপন্ত লিখছেন যে, জীবের তুলনা পোষা টিয়া পাখীর সাথে করা যায়। কারণ দুজনই বদ্ধ। একজন শরীরে তো অন্যজন খাঁচায়। দুজনেই নিজের বদ্ধ অবস্থাকে উত্তম মনে করে। কিন্তু হরিকৃপায় যদি তারা কোন খাঁটি গুরুর শরণাপন্ন হতে পারে তাহলে তিনি তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে বন্ধনমুক্ত করে দেন। তখন তাদের জীবনের স্তর অনেক উঁচু হয়ে যায়, যার তুলনায় আগের সংকীর্ণ অবস্থা একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়।

গত অধ্যায়ে শ্রী মিরিকরের উপর আসন্ন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে কি ভাবে বাবা তাঁকে বাঁচিয়ে নেন - সেটাই বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ এবার ঐ রকমেরই আরেকটি কথা শ্রবণ করুন। একবার শামাকে একটা বিষধর সাপ কামড়ে দেয়। সমস্ত শরীরে বিষ প্রসারিত হওয়ার দরুণ উনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন এবং আর্তনাদ করে বলছিলেন- "আমি আর বাঁচব না।" ওঁর বন্ধুরা ওঁকে ভগবান বিঠোবার মন্দিরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। এই ধরনের রোগীদের প্রায় সেখানেই নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু শামা মস্‌জিদের দিকে দৌড়ন, নিজের বিঠোবা শ্রী সাইবাবার কাছে। বাবা ওঁকে দূর থেকে দেখে অপশব্দ বলতে শুরু করেন। প্রচণ্ড রাগে বলতে লাগলেন- "যা, দূর হ', নীচে নাম।" শ্রী সাইবাবাকে এইরূপ রাগ করতে দেখে শামা অত্যন্ত বিপদে পড়ে যান এবং নিরাশ মনে ভাবেন- "কেবল মস্‌জিদই ত আমার বাড়ী এবং বাবা অসহায়ের আশ্রয়দাতা। যখন তিনিই আমাকে এখান থেকে এই ভাবে তাড়াচ্ছেন, তখন আর

আমি কার শরণে যাই?" উনি নিজের জীবনের আশা ছেড়ে ওখানেই শান্ত হয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণ পর বাবার রাগ যখন শান্ত হয়, তখন শামা উপরে উঠে বাবার কাছে গিয়ে বসেন। তখন বাবা বলেন- "ভয় পেও না, বিন্দুমাত্র চিন্তা করো না। দয়ালু ফকির তোমার রক্ষা নিশ্চয়ই করবেন। বাড়ী গিয়ে শান্ত হয়ে বসো এবং বাইরে বেরিও না। আমার উপর ভরসা রেখে নির্ভয় হয়ে চিন্তা ছেড়ে দাও।" ওঁকে বাড়ী পাঠিয়ে, তাত্য়া ও কাকাসাহেব দীক্ষিতকে দিয়ে বলে পাঠান- ও যা ইচ্ছে হয় খাক, কিন্তু শোয়ে না যেন।" বলা বাহুল্য, এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শামা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই বিষয়ে কেবল এতটাই মনে রাখার যোগ্য যে, বাবা শব্দগুলি (পঞ্চক্ষরীয়, যা দূর হ', নীচে নাম) শামাকে লক্ষ্য করে বলেননি। এই আদেশটা দেন সাপটা ও তার বিষকে (অর্থাৎ শামার শরীরে বিষ না ছড়ায়, সেই আজ্ঞাই দিচ্ছিলেন)। অন্যান্য মন্ত্রশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মতো মন্ত্র বা মন্ত্রোক্ত চাল বা জল ইত্যাদি ব্যবহার করেননি।

এই ঘটনাটি এবং এই ধরনের ঘটনা শুনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায় যে, যদি মায়াযুক্ত সংসার পার করতে চাও তাহলে হৃদয়ে শুধু সাইচরণ ধ্যান করো।

বিসুচিকা মহামারী ঃ-

একবার শিরডী বিসুচিকার প্রকোপে কেঁপে ওঠে ও গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে ওঠে। ওরা অন্য গ্রামের লোকেদের সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধ বন্ধ করে দিল। গ্রামের পঞ্চায়েৎ দুটো আদেশ জারী করে। প্রথম - কাঠ বোঝাই করা কোন গাড়ী গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়- কেউ ছাগল বলি দেবে না। এই আদেশ যে অমান্য করবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। বাবা ত জানতেনই যে এসব কেবল অন্ধ বিশ্বাস। তাই এই আদেশগুলির দিকে কান দেন না। আইন বলবৎ থাকাকালে একদিন এক জ্বালানী কাঠের গাড়ী গ্রামে ঢুকতে চাইল। সবাই জানত যে, গ্রামে কাঠের প্রচণ্ড অভাব ও প্রয়োজন। তবুও লোকেরা ঐ গাড়ীওয়ালাকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিতে লাগল। বাবা এই কথাটা জানতে পেরে স্বয়ং সেখানে এসে গাড়ীওয়ালাকে গাড়ীটা মস্‌জিদে নিয়ে যেতে বলেন। বাবার বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারল না। আসলে ধুনির জন্য তাঁর কাঠের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি গাড়ীর সমস্ত কাঠ কিনে নেন। একজন মহান অগ্নিহোত্রীর ন্যায় তিনি জীবন ভোর ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখেন এবং তাই কাঠ জোগাড় করে রাখতেন।

বাবার বাড়ী অর্থাৎ মস্‌জিদ সবার জন্য খোলা থাকত। তার জন্য কোন তালা-চাবির দরকার ছিল না। গ্রামের গরীব লোকেরা বাবার ভাণ্ডার থেকে নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য কাঠ বার করে নিয়েও যেত, কিন্তু বাবা তাতে কখনো কোন আপত্তি করেননি। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে ঈশ্বরেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত দেখতেন। তাই তাঁর মনে কারো প্রতি কোন ঘৃণা বা শত্রুতার ভাব ছিল না। পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এক সাধারণ গৃহস্থের উদাহরণ লোকেদের সামনে তুলে ধরেন।

গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা ঃ-

এবার দেখা যাক, দ্বিতীয় আদেশটির বাবা কিরূপ দুর্দশা করেন। ঐ সময় মস্‌জিদে কেউ একজন একটা পাঁঠা বলি দেওয়ার জন্য আনে। পাঁঠাটার মৃতপ্রায় অবস্থা। এই সময় মালেগাঁও এর ফকির, পীর মোহম্মদ অর্থাৎ 'বড়ে বাবা'ও বাবার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবা ওকে পাঁঠাটা কেটে বলি দিতে বলেন। শ্রী সাইবাবা 'বড়ে বাবা'কে খুব সম্মান করতেন। তাই উনি সব সময় বাবার ডানদিকে বসতেন। সবার আগে বড়ে বাবা ছিলিম পান করতেন, তারপর বাবাকে দিতেন। তার পর ভক্তরা পেত। দুপুরে যখন খাবার বাড়া হতো, তখন বাবা 'বড়ে বাবা'কে আদর করে নিজের ডান দিকে বসাতেন এবং তখন বাকী সবাই খেতে শুরু করত। বাবার কাছে যতটা দক্ষিণা একত্রিত হতো তার থেকে তিনি রোজ ৫০ টাকা 'বড়ে বাবা'-কে দিতেন। যখন 'বড়ে বাবা' ফিরে যেতেন, বাবা ওঁকে খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আসতেন। এত সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও যখন ওঁকে বাবা পাঁঠা কাটতে বলেন, তখন 'বড়ে বাবা' সোজাসুজি মানা করে দেন এবং স্পষ্ট শব্দে বলেন যে 'বলি দেওয়া ব্যর্থই হবে।' তখন বাবা শামাকে বলি দিতে বলেন। উনি রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী থেকে একটা ছুরি নিয়ে আসেন এবং সেটা বাবার সামনে রেখে দেন। রাধাকৃষ্ণমাঈ কারণটা জানতে পেরে ছুরিটা ফেরত চেয়ে পাঠান। শামা তখন আরেকটা ছুরির খোঁজে বেরোন ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মস্‌জিদে ফেরেন না। এবার কাকাসাহেব দীক্ষিতের পালা। এই সোনা তো খাঁটি ছিল কিন্তু তার পরখ হয়াও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। বাবা ওঁকে ছুরি এনে পাঁঠাটা কাটতে বলেন। কাকাসাহেব সাঠে 'ওয়াড়া' থেকে একটা ছুরি নিয়ে আসেন এবং বাবার আজ্ঞা পাওয়ামাত্র বলি দিতে প্রস্তুত হন। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হওয়ায় কাকাসাহেব জীবনে বলিকৃত্য জানতেন না। যদিও হিংসাবৃত্তি নিন্দনীয় তবুও উনি পাঁঠা কাটতে প্রস্তুত ছিলেন। সবাই আশ্চর্য্য হয় যে, 'বড়ে বাবা' মুসলমান হয়েও বলি দিতে রাজী হলেন না আর ইনি সনাতন ব্রাহ্মণ হয়ে বলি দিতে রাজী হয়ে গেলেন। এদিকে কাকাসাহেব

ধুতি উপরে করে, ছুরি নিয়ে, হাত উপরে উঠিয়ে বাবার অন্তিম আদেশের প্রতীক্ষা করছিলেন। বাবা বলেন- "আর কি ভাবছ? ঠিক আছে, মারো।" কাকাসাহেব যেই কোপটা বসাতে যাবেন, এমন সময়বাবা বললেন- "দাঁড়াও, তুমি কত দুষ্ট হে! ব্রাহ্মণ হয়ে পাঁঠা বলি দিচ্ছ?" কাকাসাহেব ছুরিটা নীচে রেখে বাবাকে বলেন- "আপনার আদেশই আমাদের জন্য সর্বস্ব, আমরা অন্য আইন কি জানি? আমরা তো সর্বদা আপনার কথাই স্মরণ করি এবং দিন-রাত আপনারই আজ্ঞা পালন করি। এই বিচার করে কি লাভ যে পাঁঠা মারা উচিত না অনুচিত। আর নাই আমরা তার কারণ জানতে ইচ্ছুক। গুরুর আজ্ঞা নিঃসংকোচে ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই আমাদের কর্তব্য ও ধর্ম।" তখন বাবা কাকাসাহেবকে বলেন- "আমি নিজেই বলি দেওয়ার কাজটি করব।" তখন এই স্থির হয় যে একটু দূরে (যেখানে অনেকগুলি ফকির বসেছিল) গিয়ে বলি দেওয়া হবে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই পাঁঠাটা মারা যায়।

ভক্তদের শ্রেণীর বর্ণনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন। ভক্ত তিন ধরনের হয় - ১) উত্তম ২) মধ্যম ৩) সাধারণ। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা হয়, যাঁরা নিজের গুরুর ইচ্ছে আগে থেকেই বুঝে, সেটা কর্তব্য জেনে আদেশের অপেক্ষা না করে সেবা করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা গুরুর আজ্ঞা পেয়েই তক্ষুনি সেটি পালন করেন। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্ত তাঁরা, যাঁরা গুরুর আজ্ঞা পালন করতে সব সময় বিলম্ব করেন এবং পদে-পদে ভুল করেন। ভক্তরা যদি নিজেদের বুদ্ধি জাগ্রত ও ধৈর্য্য ধারণ করে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বেশী দূরে থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ, হঠযোগ বা অন্য কঠিন সাধনার কোন দরকার হয় না। শিষ্যর মধ্যে যখন উক্ত গুণগুলির বিকাশ হয় এবং পরবর্তী উপদেশের জন্য ভূমিকা তৈরী হয়ে যায়, তখন গুরু স্বয়ং প্রকট হয়ে তাকে পূর্ণতার (আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা) দিকে নিয়ে যান। পরের অধ্যায়ে বাবার মনোরঞ্জক হাসি-ঠাট্টার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ২৪

শ্রী বাবার হাস্যবিনোদ, ভাজা ছোলার লীলা (হেমাডপন্ত), সুদামার কাহিনী, আন্না চিঞ্চনীকর এবং মৌসীবাঈ'-য়ের গল্প, বাবার ভক্তপরায়ণতা।

প্রারম্ভ ঃ-

পরবর্তী অধ্যায়তে অমুক-অমুক বিষয় বর্ণনা করা হবে, এরকম বলাটাও এক রকমের অহংকার। যতক্ষন অহংকার গুরুচরণে অর্পণ না করা হয়, ততক্ষন সত্যস্বরূপের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। নিরভিমানী হলে সফলতা নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত করতে পারব।

শ্রী সাইবাবার প্রতি ভক্তির পথে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দুই পদার্থরই প্রাপ্তি হয় এবং আমরা নিজেদের মূল প্রকৃতিতে স্থিরতা লাভ করে শান্তি ও সুখের অধিকারী হয়ে যাই। তাই নিজেদের মঙ্গল যারা সাধন করতে চান, শ্রী সাইবাবার লীলা শ্রবণ করে সেগুলি মনন করাটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। যদি এই রূপ প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদের জীবন লক্ষ্য ও পরমানন্দ সহজেই প্রাপ্ত হবে।

প্রায় সবাই-ই হাসি-ঠাট্টা ভালবাসে, কিন্তু হাসির পাত্র স্বয়ং কেউ হতে চায় না। এই বিষয়ে বাবার রীতি বিচিত্রই ছিল। ভাবপূর্ণ হয়ে যখন তিনি কৌতুক করতেন তখন খুবই মজার ও শিক্ষাপ্রদ হত। তাই ভক্তদের স্বয়ং ঠাট্টার পাত্র হতে হলে তারা কোন আপত্তি করত না। শ্রী হেমাডপন্ত এই ধরনের নিজের একটি অভিজ্ঞতা পাঠকদের শোনাচ্ছেন।

ভাজা ছোলার লীলা ঃ-

শিরডীতে প্রতি রবিবার বাজার বসত। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে লোকেরা ওখানে এসে রাস্তার উপর দোকান লাগাত এবং জিনিষ বিক্রী করত। এমনিতেই দুপুর বেলা মস্‌জিদে লোকেদের অসম্ভব ভীড় হত। কিন্তু রবিবারের দিন লোকেদের এত বেশী ভীড় হত যে, প্রায় দম বন্ধ হয়ে যেত। এমনই এক রবিবারে শ্রী হেমাডপন্ত বাবার চরণ সেবা করছিলেন। শামা বাবার বাঁদিকে এবং বমন রাও বাবার ডান দিকে বসে ছিলেন। শ্রীমান বুটী এবং কাকাসাহেব দীক্ষিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন শামা

হেসে আন্নাসাহেবকে বলেন, "দেখো তো, তোমার কোটের আস্তিনে মনে হচ্ছে কয়েকটা ছোলার দানা লেগে আছে" -এই বলে ওঁর আস্তিন স্পর্শ করতেই সেখানে কয়েকটা ছোলার দানা পেলেন।

হেমাডপন্ত নিজের বাঁ হাতটা ঝাড়তেই ছোলার কিছু দানা নীচে গড়িয়ে পড়ল। সেখানে উপস্থিত লোকেরা সেগুলি উঠিয়ে নিলেন। ভক্তরা ঠাট্টার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং সবাই আশ্চর্য্য হয়ে নানা রকমের অনুমান করতে শুরু করেন, কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারে না যে ছোলার দানা গুলি ওখানে কি ভাবে 'আবির্ভূত' হল এবং অতক্ষণ অবধি ওখানে কিভাবে আটকে ছিল। সকলেই রহস্য-উদ্ধ্যারে ব্যস্ত কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর কারো কাছে ছিল না। তখন বাবা বলতে শুরু করেন- "এই মহাশয়ের (আন্নাসাহেব) একান্তে খাওয়ার বদভ্যাস আছে। আজ হাটের দিন, ছোলা চিবুতে চিবুতে এসেছে। ছোলার দানাগুলি তার প্রমাণ। তাই আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?" হেমাডপন্ত বলেন- "বাবা, আমার একলা খাওয়ার একেবারেই অভ্যাস নেই, তবে এই ধরনের দোষারোপ কেন করছেন? আমি এখনো শিরডীর হাট দেখিনি। আজকের দিনে তো ভুলেও বাজারে যাইনা, তাই ছোলা খাওয়ার কথাই ওঠে না। খাবার সময় যারা আমার কাছে থাকে, তাদের না দিয়ে আমি কখনো খাই না।" বাবা বললেন "তুমি ঠিক বলছো। যদি তোমার কাছে কেউ নাই থাকে তাহলে তুমি বা আমি কি করতে পারি? আচ্ছা, বলো তো খাবার খাওয়ার আগে তোমার কখনো আমার কথা কি মনে পড়ে? আমি কি তোমার সঙ্গে সর্বদা নেই? তাই, তুমি কি আগে আমায় অন্ন অর্পন করে তারপর সেটা গ্রহণ করো?"

শিক্ষা ঃ-

এই ঘটনাটির মাধ্যমে বাবা কি শিক্ষা প্রদান করছেন, একটু সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এর সারাংশ এই যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কোন পদার্থের রসাস্বাদন করার আগে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর স্মরণই অর্পণের বিধি। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় চিন্তন না করে থাকতে পারে না। তাই বস্তুগুলি উপভোগ করার আগে ঈশ্বরার্পণ করে দিলে তাদের প্রতি আসক্তি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এই ভাবে সমস্ত ইচ্ছে, ক্রোধ ও তৃষ্ণা ইত্যাদি কু-প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বরার্পণ করে গুরুর দিকে চালিত করা উচিত। এটির যদি নিত্য অভ্যাস করো, তাহলে পরমেশ্বর কু-প্রবৃত্তিকে দমন করায় তোমার সহায়ক হবেন। বিষয়ের রসাস্বাদন করার আগে সেখানে বাবার উপস্থিতির খেয়াল অবশ্যই রাখা উচিত। তখন বিষয় উপভোগ উপযুক্ত কিনা, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আচরণে

পরিবর্তণ আসবে। এর ফলস্বরূপ গুরু প্রেমে বৃদ্ধি হয়ে শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। যখন এই ধরনের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তখন দৈহিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে আমাদের বুদ্ধি চৈতন্যধনে লীন হয়ে যায়। বস্তুতঃ গুরু ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং যে তাঁদের ভিন্ন মনে করে, তার ঈশ্বর দর্শন হওয়া দুর্লভ। তাই সমস্ত ভেদ বুদ্ধি ছেড়ে গুরু ও ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করা উচিত। এই ভাবে গুরু সেবা করলে ঈশ্বরকৃপা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবে এবং তখন তিনি আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করে আত্মনুভূতি প্রদান করবেন। সারাংশ এই যে, ঈশ্বর বা গুরুকে অর্পণ না করে আমাদের কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের রসাস্বাদন করা উচিত নয়। এইরূপ অভ্যাস করলে ভক্তিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। তারপর শ্রী সাইয়ের মনোহর সগুণ মূর্তি সর্বদা আমাদের চোখের সামনে থাকবে। তখন ভক্তি, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ আমাদের আয়ত্তে আসবে। ধ্যান প্রগাঢ় হলে সাংসারিক অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং সাংসারিক বিষয়ের আকর্ষণ নিজে-নিজেই নষ্ট হয়ে চিত্ত সুখ ও শান্তি অনুভব করবে।

সুদামার কাহিনী ঃ-

উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে-করতে হেমাডপন্তের স্বাভাবিক ভাবেই সুদামার কাহিনী মনে পড়ে যায়, যেটি উপরে বর্ণিত নিয়মটির পুষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের বড় ভাই বলরাম ও এক সহপাঠী সুদামার সাথে সন্দীপনি ঋষির আশ্রমে বিদ্যাধ্যয়ন করতেন। একবার কৃষ্ণ ও বলরাম কাঠ আনবার জন্য বনে যান। ঋষি-পত্নী সুদামাকেও ঐ কাজের নিমিত্তে বনে পাঠান এবং তার হাতে তিনজনের জন্য কিছু ছোলাভাজাও দেন। বনের মধ্যে কৃষ্ণ সুদামাকে বলেন- "দাদা, আমায় একটু জল দাও, খুব তেষ্টা পাচ্ছে।" সুদামা জবাব দেন- "খালি পেটে জল খেতে নেই, ক্ষতি হয়। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।" সুদামা ভাজা ছোলার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না এবং কৃষ্ণকে তার ভাগও দেন না। কৃষ্ণ ক্লান্ত তো ছিলেনই, তাই সুদামার কোলে মাথা রাখতেই ঘুমিয়ে পড়েন। তখন সুদামা সুযোগ পেয়ে ছোলা চিবুতে শুরু করেন। হঠাৎ কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসেন- "দাদা, তুমি কি খাচ্ছো? এই আওয়াজ কিসের?" সুদামা উত্তর দেন- "খাওয়ার মত এখানে আছে টাই বা কি? আমি তো ঠান্ডায় কাঁপছি। তাই দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছে। দেখ, আমি ঠিক করে বিষ্ণুসহস্রনামও উচ্চারণ করতে পারছি না।" এই কথা শুনে অন্তর্যামী কৃষ্ণ বলেন- "দাদা, আমি এখুনি স্বপ্ন দেখলাম একটি লোক অন্যের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। ওকে যখন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে উত্তর দেয়- 'ছাইপাঁশ খাচ্ছি।' তখন প্রশ্নকর্তা বলেন- 'বেশ, তাই

যেন হয় (এবমস্তু)।' দাদা এটা তো একটা স্বপ্ন মাত্র। আমি তো জানি যে তুমি আমায় ছেড়ে অন্নর এক দানাও মুখে দাও না। স্বপ্নের ঘোরেই এমন প্রশ্ন করে ফেললাম।" কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতার বিষয়ে যদি সুদামার কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান থাকত, তাহলে উনি এই ধরনের আচরণ করতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সুদামা খানিকটা জীবন দারিদ্রতায় কাটান। কিন্তু শুধুমাত্র এক মুঠো চিঁড়ে, যেটা ওঁর স্ত্রী অনেক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছিল, শ্রী কৃষ্ণকে দিতেই তিনি অতি প্রসন্ন হন এবং তার বদলে স্বর্ণনগরী প্রদান করেন। যারা অন্যদের না দিয়ে একান্তে খায়, তাদের এই কাহিনীটি সব সময় মনে রাখা উচিত। "শ্রুতি"তে এই শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমে ঈশ্বরকে অর্পণ করে পরে তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করা উচিত। এই শিক্ষাই বাবা হাসি-ঠাট্টার ছলে দেন।

আন্না চিঞ্চনীকর এবং মৌসীবাঈ ঃ-

এবার শ্রী হেমাডপন্ত দ্বিতীয় হাস্যপূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করছেন। এই গল্পটি বাবার এক ভক্ত, দামোদর ঘনশ্যাম বাবরে, ওরফে আন্না চিঞ্চনীকরের। উনি ছিলেন- নির্ভীক, সরল এবং খানিকটা কঠোর স্বভাবের। উনি কাউকে পরোয়া করতেন না এবং সোজাসুজি কথা বলতেন। বৈষয়িক ব্যাপারে সব নগদে কারবার করতেন। যদিও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ওঁকে একটু রুক্ষ ও অসহিষ্ণু মনে হত, কিন্তু অন্তঃকরণে উনি নিষ্কপট ছিলেন। তাই বাবা ওঁকে বিশেষ ভালবাসতেন। ভক্তরা নিজের নিজের ইচ্ছানুসারে বাবার সেবা করতেন। একদিন দুপুরবেলা আন্না উপুড় হয়ে রেলিং-এর উপর রাখা বাবার বাঁ হাতটি মালিশ করছিলেন। অন্যদিকে একটি বৃদ্ধা বিধবা মহিলা বাবার পেটে হাত বুলাচ্ছিলেন। নাম বেণুবাঈ কোজলগী। বাবা ওঁকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং অন্যান্য লোকেরা বলত 'মৌসীবাঈ'। মৌসীবাঈ ছিলেন শুদ্ধ চরিত্রা বয়স্কা মহিলা। তিনি সেসময় বাবার পেট এত জোরে মালিশ করছিলেন যে বাবার পেট ও পিঠ প্রায় এক হয়ে যাওয়ার দশা। তার ফলে বাবা এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করছিলেন। আন্না ওদিকে সেবায় ব্যস্ত। হাতের পরিচালন ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মৌসীবাইয়ের মাথা উপর-নীচে হচ্ছিল। এইরূপ যখন দুজনেই সেবায় জুটে ছিলেন সেই সময় অনায়াসেই মৌসীবাঈয়ের মুখ আন্নার মুখের খুব কাছে এসে যায়। মৌসীবাঈ একটু বিনোদ করতে ভালবাসতেন, তাই একটু বিদ্রুপ করে বলেন, "এই আন্না খুব বদ। ও আমায় চুমু খেতে চায়। চুল পেকে গেছে কিন্তু আমায় চুমু খেতে লজ্জা হচ্ছে না।" এই কথা শুনে অন্না ভয়ঙ্কর রেগে যান ও বলেন, "কি? আমি বুড়ো ও বদ লোক? আমি

কি বোকা? তুমি নিজেই দুষ্টুমি করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ।" ওখানে উপস্থিত সবাই এই বিবাদে আনন্দ উপভোগ করছিল। বাবা দুজনকেই স্নেহ করতেন। তাই তিনি কৌশলে এই বিবাদটা মিটিয়ে দেন। তিনি সস্নেহে বলেন, "আরে আন্না, মিছিমিছি কেন ঝগড়া করছ? আমি এটা বুঝতে পারছিনা যে মাকে চুমু খাওয়াতে দোষ কোথায়?" বাবার কথা শুনে দুজনেই শান্ত হয় এবং উপস্থিত সবাই মন ভরে বাবার বিনোদ পদ্ধতির আনন্দ উপভোগ করে।

বাবার ভক্ত পরায়ণতা ঃ-

বাবা ভক্তদের তাদের ইচ্ছানুসারে তাঁর সেবা করতে দিতেন এবং এ বিষয় কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতেন না। অন্য একদিন মৌসীবাঈ বাবার পেট খুব জোর দিয়ে মালিশ করছিলেন। তা দেখে ভক্তরা ব্যগ্র হয়ে মৌসীবাঈকে বলে- "একটু আস্তে টিপুন। এত জোরে চাপ দিলে নাড়ী-ভুঁড়ি ফেটে যাবে।" এমনটি যেই না বলা, বাবা তক্ষুনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ও রাগে চোখ দুটি আগুণের মত লাল হয়ে যায়। কার সাহস যে কেউ কিছু বলে? তিনি দুটো হাত দিয়ে নিজের ডান্ডার এক দিকটা নাভির সঙ্গে লাগিয়ে এবং অন্য দিকটা মাটির উপর রেখে সেটা পেট দিয়ে চাপ দিতে শুরু করেন। দু-তিন ফুট লম্বা ডান্ডাটি মনে হচ্ছিল পেটে ঢুকে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে পেট ফাটিয়ে দেবে। সকলে বিস্ময়ে এবং ভয়ে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ওরা তো মৌসীবাঈকে শুধু এতটাই ইঙ্গিত করতে চাইছিল যে, একটু সহজ ভাবে সেবা করলে ভালো হয়। বাবাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে কারোই ছিল না। সদ্ভাবনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই ওরা একথা বলে। তাতে যে এই রূপ দুর্গতি হবে সেটা কে জানত? কিন্তু বাবা নিজের কাজে এতটুকু হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া তাদের আর কিছু করার রইল না। কিছুক্ষণ পর বাবার রাগ শান্ত হয় এবং তিনি ডান্ডা ছেড়ে নিজের আসনে গিয়ে বসেন। এই ঘটনার দ্বারা এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, অন্যদের ব্যপারে কখনো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছা মতো বাবার সেবা করার অধিকার আছে। শুধু বাবাই সেবার মূল্যাঙ্কন করতে সক্ষম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৫

১) দামু আন্না কাসার - আহমদনগরের তুলো ও ধানের ব্যবসা
২) আম্রলীলা, প্রার্থনা।

যিনি অকারণেই অন্যদের উপর দয়া করেন, সমস্ত প্রাণীদের জীবন ও আশ্রয়দাতা এবং যিনি পরমব্রহ্মের পূর্ণ অবতার- সেই মহান যোগীরাজের চরণে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এবার এই অধ্যায় আরম্ভ করছি।

শ্রীসাইয়ের জয় হোক্। তিনি সন্ত চূড়ামণি, সমস্ত শুভ কার্য্যের উদ্‌গম স্থান, আমাদের আত্মারাম ও ভক্তদের আশ্রয়দাতা। আমরা শ্রীসাইনাথের চরণ বন্দনা করি, যিনি নিজের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য প্রাপ্ত করে নিয়েছিলেন।

শ্রী সাইবাবা সর্বদাই করুণায় পরিপূর্ণ। আমাদের শুধু তাঁর চরণকমলে দৃঢ় ভক্তি অর্পণ করা উচিত। যখন ভক্তের বিশ্বাস দৃঢ় ও ভক্তি পরিপক্ক হয়, তখন তার মনোরথও শীঘ্রই পুরণ হয়ে পড়ে। হেমাডপন্তের যখন 'সাই চরিত্র' ও সাই লীলা রচনা করার তীব্র উৎকন্ঠা হয়, তখন বাবা তক্ষুনি সেটা পূরণ করে দেন। ওঁকে স্মৃতি-পত্র ইত্যাদি একত্রিত করতে বলা হতেই হেমাডপন্তের মধ্যে স্ফূর্তি, বুদ্ধি, শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা আপনা-আপনিই উদয় হয়। উনি নিজেই স্বীকার করে বলেছেন- "সম্পূর্ণ অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রী সাইয়ের শুভাশীর্বাদ ফলেই এই কঠিন কাজটি পুরো করতে সমর্থ হতে পেরেছি। তাই এই পবিত্র গ্রন্থ 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' আপনারা পেয়েছেন।" এটি একটি নির্মল স্রোত বা চন্দ্রকান্তমণির ন্যায়, যার থেকে সর্বদা সাই-লীলারূপী অমৃত ঝরছে, যাতে পাঠকগণ মন ভরে সেটা পান করতে পারেন। যখন ভক্ত পূর্ণ অন্তঃকরণ দিয়ে শ্রী সাইবাবাকে ভক্তি করতে শুরু করে, তখন বাবা তার সমস্ত কষ্ট এবং দুর্ভাগ্য দূর করে স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন। আহমদনগরের শ্রী দামোদর সাঁওলরাম রাসনে কাসারের নিম্নলিখিত কাহিনী এই সত্যেরই প্রমাণ।

দামু আন্না ঃ-

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, এই মহাশয়ের কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিরডীতে রাম নবমী উৎসবের প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি ১৮৯৬ সাল নাগাদ শিরডী আসেন। সে সময় রামনবমীর উৎসব সবে শুরু হয়েছিল। তবে থেকেই উনি

একটি জরির সুন্দর ধ্বজা এই উপলক্ষে উপহার রূপে দিতেন এবং ভিখিরীদের ভোজন করাতেন।

দামু আন্নার ব্যবসা ঃ-

১) তুলোর ব্যবসা -

দামু আন্নাকে বম্বের ওঁর এক বন্ধু লেখেন যে আন্নার সাথে উনি তুলোর ব্যবসা (ভাগের কারবার) করতে চান, যাতে প্রায় দুলক্ষ টাকার লাভ হওয়ার আশা আছে। ১৯৭৫ সালে শ্রী নরসিংহ স্বামীকে দেওয়া এক বক্তব্যে দামু আন্না জানান যে, বম্বের এক দালাল তুলোর এই ব্যবসার প্রস্তাব রাখে এবং পরে অংশীদারত্ব থেকে হাত ঝেড়ে ওঁর উপরই সব ভার দেওয়ার ফন্দিতে ছিল ('ভক্তদের অভিজ্ঞতা' ভাগ ১১ পৃষ্ঠ ৭৫ অনুসারে)। দালালটি লিখে ছিল যে, ব্যবসাটা অতি উত্তম এবং ক্ষতি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই- এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত থেকে যেতে দেওয়া উচিত নয়। দামু আন্নার মন দু দিকেই দুলতে লাগল। স্বয়ং কোন কিছু নির্ণয় করার সাহস তাঁর হচ্ছিল না। তাই বাবার ভক্ত হওয়ার দরুণ সমস্ত বিবরণ দিয়ে শামাকে একটা চিঠি লিখে পাঠান, যাতে বাবাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করেন। চিঠিটি শামা পরের দিন পান এবং দুপুরে মস্‌জিদে বাবার সামনে রাখেন। শামার কাছে বাবা চিঠির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। উত্তরে শামা বলেন- "আহমদনগরের দামু আন্না কাসার আপনার অনুমতি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "ও এই চিঠিতে কি লিখছে? ওর পরিকল্পনাটা কি? আমার তো মনে হচ্ছে ও আকাশ ছুঁতে চাইছে। যা কিছু ও ভগবৎ কৃপায় পেয়েছে তাতে ও সন্তুষ্ট নয়। আচ্ছা, চিঠিটা পড়ে শোনাও।" শামা বলেন- "আপনি এক্ষুনি যা-যা বললেন, সেটাই চিঠিতে লেখা আছে। হে দেব! আপনি এখানে শান্ত ও স্থির হয়ে বসে থাকেন আর ওদিকে ভক্তদের উদ্বিগ্ন করে তোলেন। ওরা যখন অশান্ত হয়ে ওঠে, তখন আপনি ওদের আকর্ষিত করে কাউকে প্রত্যক্ষরূপে তো কাউকে পত্র দ্বারা এখানে টেনে আনেন। আপনি যখন চিঠির তাৎপর্য্য জানেনই, তখন আমায় সেটা পড়তে চাপ দিচ্ছেন কেন?" বাবা তখন বলেন- "শামা তুমি চিঠিটা তো পড়ো। আমি তো যা-তা বলি। আমায় কে বিশ্বাস করে?" তখন শামা চিঠিটা পড়েন এবং বাবা সেটা মন দিয়ে শুনে চিন্তিত হয়ে বলেন- "আমার মনে হচ্ছে যে শেঠ (দামু আন্না) পাগল হয়ে গেছে। ওকে লিখে দাও যে, ওর বাড়ীতে কোন অভাব নেই। তাই অর্দ্ধেক রুটিতেই সন্তুষ্ট হয়ে লাখের চক্কর থেকে ওঁর দূরে থাকা উচিত।" শামা উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেন। বলা বাহুল্য, দামু আন্না খুবই উৎসুক

হয়ে লাখ টাকা কামানোর যে স্বপ্ন দেখছিলেন সেটা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হল। ওঁর তখন একবার এও মনে হয় যে, বাবার কাছে পরামর্শ চেয়ে উনি ভুল করলেন। শামা চিঠিতে ইঙ্গিত করেছিলেন যে- "দেখা ও শোনাতে তফাৎ আছে। তাই ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই শিরডী এসে বাবার সঙ্গে দেখা করো।" তাই ব্যক্তিগত ভাবে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য উনি শিরডী আসেন। বাবার দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। কিন্তু বাবার সামনে ব্যবসার কথা তুলতে সাহস হচ্ছিল না। উনি মনে-মনে স্থির করেন- "যদি বাবা কৃপা করেন তাহলে লাভের থেকে খানিকটা অংশ বাবাকে অর্পণ করব।" যদিও এই কথাটি দামু আন্না বড়ই গুপ্ত ভাবে নিজের মনেই রেখেছিলেন, তবুও ত্রিকালদর্শী বাবার কাছে কিছু লুকোন থাকতে পারে কি? বাচ্চা তো মিষ্টি চায় কিন্তু মা ওকে তেঁতো ওষুধ দেন, কারণ মিষ্টি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য মা তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তেঁতো ওষুধই খাইয়ে দেন। বাবাও এক দয়ালু মায়ের মতন। তিনি নিজের ভক্তের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত জানতেন। তাই তিনি দামু আন্নার মনের কথা বুঝে বলেন, "বাপু, আমি নিজেকে এই বৈষয়িক ব্যাপারে জড়াতে চাই না।" বাবার অনিচ্ছা জেনে দামু আন্না এই পরিকল্পনাটি ত্যাগ করেন।

২) শষ্যের ব্যবসা -

এরপর উনি গম, চাল ইত্যাদির ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন। বাবা ওনার এই পরিকল্পনার কথা জেনে ওঁকে বলেন- "তুমি টাকায় ৫ সের কিনে ৭ সের বিক্রী করবে।" তাই উনি এই ব্যবসার মৎলবও ছেড়ে দেন। কিছু সময় পর্যন্ত তো অন্নের দাম বাড়তে থাকে এবং মনে হয় যে বাবার ভবিষ্যবাণী বোধহয় ভুল হল। কিন্তু দু-এক মাস পরই সব জায়গায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, ফলে অন্যের দাম হঠাৎ পড়ে যায় এবং যারা অন্ন সংগ্রহ করে রেখেছিল তাদের যথেষ্ঠ ক্ষতি হয়। কিন্তু দামু আন্না এই বিপদ থেকে বেঁচে যান। বলা বাহুল্য যে, ঐ দালালটি অন্য একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তুলোর ব্যবসায় নামেন এবং তাতে তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বাবা দুবার ওঁকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন দেখে দামু আন্নার সাই চরণে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বাবার দেহরক্ষা কাল পর্যন্ত এবং তারপরও দামু আন্না একজন সত্যকার ভক্ত হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন।

আম্রলীলা ঃ-

একবার গোয়ার এক মামলৎদার (নাম - রালে) শামার নামে প্রায় ৩০০ টা-

আমের পার্শেল শিরডী পাঠান। পার্শেল খোলাতে প্রায় সব আমই ভালো বেরোয়। ভক্তদের এগুলি বিতরণ করার দায়িত্ব শামাকে দেওয়া হয়। তার মধ্যে থেকে বাবা চারটে আম দামু আন্নার জন্য আলাদা করে বার করে রেখে দেন। দামু আন্নার তিনটি স্ত্রী ছিল। কিন্তু দামু আন্না নিজের বক্তব্যে জানিয়েছেন যে তাঁর দুটিই স্ত্রী ছিল। সন্তানহীন হওয়ার দরুণ অনেক জ্যোতিষীদের কাছে এই সমস্যার সমাধানের খোঁজে যান। নিজেও জ্যোতিষ বিদ্যা অধ্যয়ন করে জানতে পারেন যে, ওঁর কুষ্ঠীতে এক পাপ গ্রহ থাকার দরুণ এই জীবনে ওঁর সন্তানসুখের কোন যোগ নেই। কিন্তু বাবার চরণে তো ওঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। পার্শেল পাওয়ার প্রায় দু-ঘন্টা পর বাবার পূজো-অর্চনা করার জন্য উনি মস্‌জিদে আসেন। ওঁকে দেখে বাবা বলেন- "লোকেরা আমের জন্য ঘোরা-ঘুরি করছে, কিন্তু এগুলি তো দামুর। ওই খাবে আর মরবে।" এই শব্দগুলি শুনে দামু আন্নার হৃদয়ের উপর যেন বজ্রাপাত হয়। কিন্তু মহালসা পতি (বাবার এক ভক্ত) দামু আন্নাকে বোঝান যে এখানে মৃত্যুর তাৎপর্য্য হল অহংকারের বিনাশ এবং বাবার চরণে হলে এইটি হবে পরম আশীর্বাদ। তখন উনি আম ক'টি খেতে রাজী হন। তাতে বাবা বলেন- "এগুলি তুমি খেও না, বরং তোমার ছোট বউকে খেতে বলো। এই আমের প্রভাবে উনি চারটি পুত্র ও চারটি কন্যা জন্ম দেবেন।" এই আজ্ঞায় শিরোধার্য্য করে দামু ঐ আম নিয়ে গিয়ে নিজের ছোট বৌকে দেন। শ্রী সাইবাবার লীলা ধন্য, যিনি ভাগ্য বিধান পাল্টে সন্তান-সুখ প্রদান করেন। বাবার সত্য হয়, জ্যোতিষীদের নয়। মহান আশ্চর্য্যের কথা এই যে সমাধিস্থ হওয়ার পরও তাঁর প্রভাব আগের মতনই আছে। বাবা বলেছিলেন- **"আমি চলে গেলেও, আমার হাড় তোমাদের আশা ও বিশ্বাস জোগাবে। শুধু আমিই নয় আমার সমাধিও কথাবার্তা বলবে, চলবে ফিরবে এবং যারা অনন্যভাবে আমার শরণাগত হবে তাদের মনের আশা পূরণ করবে। আমি তোমাদের ছেড়ে দূরে চলে যাবো ভেবে নিরাশ হয়ো না। আমার হাড়ও ভক্তদের কল্যাণ চিন্তা করবে। হৃদয় দিয়ে আমায় বিশ্বাস করো, তবেই তোমাদের লাভ হবে।"**

প্রার্থনা ঃ-

একটি প্রার্থনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায় সমাপ্ত করছেন।

"হে সাই সদ্‌গুরু। আপনার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, আমরা যেন কখনো আপনার অভয় চরণ না ভুলি। আপনার শ্রীচরণ কখনো যেন আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়। আমরা এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে এই সংসারে অত্যধিক দুঃখী।

এবার দয়া করে আমাদের এই চক্র থেকে শীঘ্র উদ্ধার করুন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-পদার্থের দিকে আকর্ষিত হয়। সেগুলিকে বাহ্য প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে, অন্তর্মুখী করে আমাদের আত্ম-দর্শনের যোগ্য করে তুলুন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী প্রবৃত্তি এবং চঞ্চল মনের উপর অঙ্কুশ না থাকলে আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব নয়। শেষ সময় আমাদের পুত্র-মিত্র কেউ কোন কাজে আসবে না। হে সাই! আমাদের তো একমাত্র আপনিই সহায় যিনি আমাদের মোক্ষ ও আনন্দ প্রদান করবেন। হে প্রভু! আমাদের যুক্তি-তর্কের বদ অভ্যাস এবং অন্য কু-প্রবৃত্তি গুলিকে নষ্ট করে দিন। আমাদের জিভ যেন সব সময় আপনার নাম স্মরণেরই স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। হে প্রভু, আমাদের ভালো-মন্দের সব বিচার নষ্ট করে দিন। এমন কিছু করুন যাতে আমাদের শরীর ও গৃহের প্রতি আসক্তি না থাকে। আমাদের অহংকার যেন নির্মূল হয়ে যায় ও আপনার নাম ছাড়া আর বাকী সব যেন বিস্মৃত হয়ে যায়। আমাদের মনের অশান্তি দূর করে তাকে স্থির ও শান্ত করুন। হে সাই! আপনি যদি আমাদের হাত নিজের হাতে নিয়ে নেন তাহলে অজ্ঞানরূপী রাতের আবরণ শীঘ্রই সরে যাবে এবং আপনার জ্ঞানের আলোয় আমাদের জীবন আনন্দে ভরে উঠবে। এই যে আপনার লীলামৃত পান করার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি এবং যেটি আমাদের অখণ্ড নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে দিয়েছে - এ আপনারই কৃপা ও আমাদের গত জন্মের শুভ কর্মের ফল।"

বিশেষ ঃ- এই প্রসঙ্গে শ্রী দামু আন্নার লিখিত বিবৃতি থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে- 'একবার যখন আমি অন্য লোকেদের সাথে বাবার শ্রীচরণে বসেছিলাম, আমার মনে দুটো প্রশ্ন ওঠে। বাবা দুটিরই জবাব দিয়েছিলেন।"

১) যে জনসমূদায় শ্রী সাইয়ের দর্শন করতে শিরডী আসে, তারা সবাই-ই কি লাভান্বিত হয়? এর উত্তরে বাবা বলেন- "ঐ আম গাছের দিকে তাকিয়ে দেখো- কত মুকুল। যদি সব আমের মুকুলগুলিই ফল হত তাহলে তো আমের গণনাই হতে পারবে না। কিন্তু তা হয় কি? কিছু যদি বা ফল হয় তো তার মধ্যে থেকে কতকগুলি ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং এই ভাবে অল্প কিছু ফলই গাছে পাকতে পারে।

২) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমার নিজের বিষয় ছিল। বাবার নির্বাণের পর আমি একেবারেই নিরাশ্রিত হয়ে যাবো, তখন আমার কি হবে? এর উত্তরে বাবা বলেন, **"যখন এবং যেখানে তুমি আমায় স্মরণ করবে, আমাকে তোমার কাছেই পাবে।"** এই শপথ উনি ১৯১৮ সালের আগেও রেখেছেন এবং পরেও রেখেছেন- আজও রেখে যাচ্ছেন। এই কথা ক'টি বলেছিলেন ১৯১০-১১ সালে। সেই সময় আমার ভাই আমার থেকে

আলাদা হয়ে যায় এবং আমার বোন মারা যায়। আমার বাড়ীতে চুরি হয় ও পুলিশ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছিল। এই সব ঘটনাগুলি আমায় পাগল করে দিয়েছিল।"

"আমার বোনের মৃত্যু আমায় শোকাকুল করে তোলে। বাবার কাছে যেতে তিনি আমায় নিজের মধুর উপদেশ দিয়ে শান্ত করেন। আপ্পা কুলকর্ণীর বাড়ীতে 'পুরণপোলী' খেতে পাঠান এবং আমার কপালে চন্দন লাগিয়ে দেন।"

"গয়নার সিন্দুক থেকে আমার বৌয়ের 'মঙ্গলসূত্র', 'নথ' ইত্যাদি আমারই তিরিশ বছর পুরানো বন্ধু চুরি করে। আমি বাবার ছবির সামনে খুব কাঁদি। তার পরের দিনই সেই লোকটি স্বয়ং গয়নার সিন্দুক আমায় ফিরিয়ে ক্ষমা চায়।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ২৬

১) ভক্ত পন্ত ২) হরিশচন্দ্র পিতলে ও ৩) গোপাল আম্বেদকরের কাহিনী

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতন ও জড় ইত্যাদি যা কিছু দেখা যায়, সে সব একই ব্রহ্ম এবং এই এক ও অদ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মকে আমরা বিভিন্ন নামে সম্বোধিত করি এবং ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখি। আমরা যেমন অন্ধকারে পড়ে থাকা একটা দড়ি বা মালাকে ভুলবশতঃ সাপ বলে মনে করি, ঠিক সে ভাবেই সমস্ত পদার্থের কেবল বাহ্য রূপটিই দেখে, তাদের সত্য স্বরূপটি ভুলে যাই। একমাত্র সদ্‌গুরুরই আমাদের দৃষ্টি থেকে মায়ার আবরণ সরিয়ে বস্তুগুলির সত্য স্বরূপের যথার্থ দর্শন করাতে পারেন। তাই আসুন, আমরা শ্রী সদ্‌গুরু সাই মহারাজের উপাসনা করে তাঁকে সত্যর দর্শন করাবার জন্য প্রার্থনা করি, যিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন।

আন্তরিক পূজন ঃ-

শ্রী হেমাডপন্ত উপাসনার এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি উল্লেখ করছেন। উনি বলেন যে, সদ্‌গুরুর পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্তে আনন্দাশ্রুর উষ্ণ জল ব্যবহার করো। তাঁকে শুদ্ধ প্রেমরূপী চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে, দৃঢ় বিশ্বাস রূপী বস্ত্র পরাও। অষ্ট সাত্বিক ভাব রূপী আটটি পদ্মফুল ও একাগ্র চিতরূপী ফল তাঁকে অর্পণ করো। নিষ্ঠারূপী অভ্রচূর্ণ তাঁর কপালে লাগিয়ে ভক্তির ধুতি পরিয়ে, নিজের মাথা তাঁর চরণতলে রাখো। এই ভাবে শ্রী সাইকে সমস্ত আভরণে ভূষিত করে, তাঁকে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দাও। উষ্ণতা দূর করার জন্য সর্বদা ভক্তির চামর দোলাও। এই ভাবে সানন্দে পূজো করে প্রার্থনা করো-

"হে সাই! আমাদের প্রবৃত্তি অন্তর্মুখী করে দাও। সত্য এবং অসত্যের বিবেক দাও এবং সাংসারিক পদার্থ থেকে আসক্তি দূর করে আমাদের আত্মানুভূতি প্রদান করো। আমরা নিজেদের দেহ ও প্রাণ আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করছি। হে সাই! আমাদের দৃষ্টি তুমি নিজের করে নাও, যাতে আমাদের আর সুখ-দুঃখ অনুভব না হয়। হে সাই! আমার শরীর ও মনকে তুমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে চালাও ও আমার চঞ্চল মনকে

তোমার পদতলে বিশ্রাম করার জায়গা দাও।”

এবার আমরা এই অধ্যায়ের কাহিনীগুলির দিকে আসি।

ভক্ত পন্ত ঃ-

একবার পন্ত নামক এক ভক্তের, যিনি অন্য একজন সদ্‌গুরুর শিষ্য ছিলেন, শিরডী আসার সৌভাগ্য হয়। ওঁর শিরডী আসার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু 'মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক'। একদিন ট্রেনে অনেক বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে হঠাৎ ওঁর দেখা হয়। ওঁরা সকলেই শিরডী যাচ্ছিলেন। পন্তকে ওঁদের সাথে শিরডী যেতে অনুরোধ করেন। পন্ত এই প্রস্তাব অস্বীকার করতে পারেন না। অন্যান্য সকলে বম্বেতে নামেন কিন্তু পন্ত বিরারে নেমে নিজের গুরুর কাছে শিরডী প্রস্থান করার অনুমতি নেন এবং আবশ্যক খরচা আদির ব্যবস্থা করে সবার সাথে শিরডী রওনা হন। প্রাতঃকালে শিরডী পৌঁছে বেলা ১১টা নাগাদ মস্‌জিদে যান। ওখানে পূজোর জন্য একত্রিত ভক্তদের সমূহ দেখে সবাই খুব প্রসন্ন হন কিন্তু পন্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন সবাই ওঁকে সুস্থ করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বাবার কৃপায় ও মাথায় জলের ছিটে দেওয়ায় উনি সুস্থ হয়ে উঠে বসেন, যেন কেউ ঘুম থেকে উঠে বসেছে। উনি অন্য গুরুর শিষ্য, একথা জানার পর ত্রৈকালজ্ঞ বাবা ওঁকে অভয় দান করে ওঁর গুরুর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে বলেন- “যাই ঘটুক না কেন, নিজের স্তম্ভকে দৃঢ় ভাবে ধরে রেখো। সর্বদা স্থির হয়ে তাঁর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত করো।” পন্ত তক্ষুনি এই শব্দগুলির অর্থ বুঝে যান এবং ওঁর নিজের সদ্‌গুরুর কথা মনে পড়ে। বাবার এই করুণার কথা ওঁর জীবনভোর মনে থাকে।

শ্রী হরিশচন্দ্র পিত্‌লে ঃ-

হরিশচন্দ্র পিত্‌লে বম্বেতে থাকতেন। ওঁর ছেলে মৃগী রোগে ভুগছিল। অনেক রকমের দেশী ও বিদেশী চিকিৎসা করিয়েও কোন লাভ হয় না। এবার শুধু একটা উপায়ই বাকী ছিল - কোন মহাপুরুষের চরণের আশ্রয় নেওয়া। ১৫ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রী দাসগণুর সুমধুর কীর্তনের মাধ্যমে শ্রী সাইবাবার কীর্তি বম্বেতে ভালই ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালে পিত্‌লে বাবার কীর্তন শোনেন ও উনি জানতে পারেন যে, শ্রী সাইবাবার করস্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারাই অসাধ্য রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওঁর মনেও শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করার তীব্র ইচ্ছে জাগে। যাত্রার ব্যবস্থা করে, উপহার দেওয়ার জন্য ফলের ঝুড়ি হাতে করে বৌ ও বাচ্চাদের নিয়ে উনি শিরডী

আসেন। মস্‌জিদে পৌঁছে চরণ বন্দনা করে নিজের রোগী পুত্রকে বাবার চরণতলে রাখলেন। বাবার দৃষ্টি ওর উপর পড়তেই ওর মধ্যে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। ছেলেটির চোখ দুটি ঘুরতে লাগল। ওর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোতে লাগলো ও শরীর ঘামে ভিজে গেল। মনে হচ্ছিল যেন এবার প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে। ওর বাবা-মা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েন। ছেলেটি মাঝে-মাঝে অজ্ঞান তো হত কিন্তু এবার যেন বেশীক্ষনের জন্য মূর্চ্ছা গেল। মায়ের চোখ থেকে ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল। দুঃখে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন- "আমি এমন অবস্থায় পড়েছি যেন কেউ চোরের ভয়ে যে বাড়ীতে প্রবেশ করল সেই বাড়ীটাই তার উপর ভেঙ্গে পড়ল; যেন কোন গরু বাঘের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে কসাই এর হাতে পড়ল; রৌদ্রদগ্ধ পথিক শীতল ছায়ার আশায় গাছতলায় দাঁড়ালে সেই গাছই তার মাথায় পড়ল।" তখন বাবা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- "এমন বিলাপ কোর না। ধৈর্য্য ধরো। ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে যাও। আধ ঘন্টার মধ্যেই এর জ্ঞান ফিরে আসবে।" বাবার আদেশ ওঁরা তৎক্ষনাত পালন করেন। বাবার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। ছেলেটি সুস্থ হয়ে ওঠে। পিত্‌লে পরিবার ও অন্যান্য সবাই অতিশয় প্রীত হন। ওঁদের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গিয়েছিল। শ্রী পিত্‌লে সস্ত্রীক বাবার দর্শন করতে আসেন এবং অতি বিনম্র হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক বাবার চরণ বন্দনা করেন। বাবাকে মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। তখন বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করেন- "তোমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও সংশয় কেটে গেছে তো? যাঁদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস আছে, তাঁদের শ্রীহরি রক্ষা করেন।" শ্রী পিত্‌লে ছিলেন অবস্থাপন্ন লোক। তাই উনি ঢালাওভাবে মিষ্টি বিতরণ করেন এবং চমৎকার ফল ও পান বাবাকে অর্পণ করেন। শ্রীমতি পিত্‌লে সাত্বিক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। ওঁর চোখ থেকে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের অশ্রুধারা বইছিল। ওঁর মৃদু ও সরল স্বভাব দেখে বাবা প্রসন্ন হন। ঈশ্বরের ন্যায় সন্তরাও ভক্তদের অধীন। যারা তাঁর শরণাগত হয়ে অনন্য ভাবে তাঁরই পূজো করে, তাদের রক্ষা সন্তগণ নিশ্চয়ই করেন। শিরডীতে কিছুদিন সুখে-শান্তিতে থেকে পিত্‌লে পরিবার প্রস্থান করার অনুমতি নেওয়ার জন্য বাবার কাছে মস্‌জিদে যান। বাবা ওদের 'উদী' দিয়ে আশীর্বাদ করে শ্রী পিতলেকে কাছে ডেকে বলেন, "বাপু, এর আগে আমি তোমায় দু টাকা দিয়ে ছিলাম, এবার আমি তোমায় তিন টাকা দিচ্ছি। নিজের পূজোর জায়গায় রেখে রোজ এই টাকাগুলির পূজো কোর। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।" শ্রী পিত্‌লে সেগুলি প্রসাদ রূপে গ্রহণ করেন। বাবাকে পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আশীষের জন্য প্রার্থনা করেন। হঠাৎ ওঁর মনে হল, উনি এই প্রথম শিরডীতে এসেছেন, তাহলে বাবার' দু টাকা আগে দিয়েছি' বলার অর্থ কি?

উনি এই প্রশ্নের স্পষ্টিকরণ আশা করছিলেন, কিন্তু বাবা চুপ করেই বসে রইলেন। বম্বে পৌঁছে উনি নিজের বুড়ী মাকে শিরডী যাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত শোনান এবং ঐ দু টাকার কথাও বলেন। মাও প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করার পর একটা পুরোন ঘটনা মনে পড়ে। ওঁর মা বলেন- "তুমি তোমার নিজের ছেলেকে নিয়ে যেমন শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে গিয়েছিলে, তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা তেমনি অনেক বছর আগে আক্কালকোট মহারাজের দর্শনে গিয়েছিলেন। মহারাজ পূর্ণ সিদ্ধ, যোগী, ত্রিকালজ্ঞ ও বড়ই উদার হৃদয়ের মহাপুরুষ ছিলেন। তোমার বাবাও ওঁর পরম ভক্ত ছিলেন, তাই ওর পূজো স্বীকৃত হয়। সেই সময় মহারাজ ওঁকে দুটো টাকা বেদীতে রেখে পূজো করার জন্য দিয়েছিলেন। উনি আজীবন সেই ভাবে পূজো করে যান। ওঁর মৃত্যুর পর সেই টাকাগুলির যথাবিধি পূজো হতে পারে না এবং টাকা দুটি হারিয়ে যায়। কিছুদিন পর আমি সেগুলির কথা একেবারেই ভুলে যাই। তোমার খুব সৌভাগ্য যে, শ্রী আক্কালকোট মহারাজ সাই রূপে তোমায় তোমার কর্তব্য ও পূজোর কথা স্মরণ করিয়ে তোমায় সব বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। এবার ভবিষ্যতে সজাগ থেকে সমস্ত সংশয়, চিন্তা ভাবনা ছেড়ে নিজের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে, রীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে সদাচারী হও। নিজের কুলদেবতা ও এই টাকাগুলির পূজো করে তাঁর যথার্থ স্বরূপটি বুঝে, সন্তদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে গর্ব বোধ করো। শ্রী সাই সমর্থ দয়া করে তোমার মনে ভক্তির বীজ রোপন করেছেন। তোমার কর্তব্য হল তার বৃদ্ধিতে সহায়ক হওয়া। মায়ের কথা শুনে শ্রী পিত্‌লে অত্যন্ত খুশী হন। বাবার সর্বকালজ্ঞতার পরিচয় উনি পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শ্রী দর্শনের মাহাত্ম্য বুঝতে পারেন। এরপর থেকে উনি নিজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বেশী সাবধান হলেন।।

শ্রী আম্বেডকর ঃ-

পুণের শ্রী গোপাল নারায়ণ আম্বেডকর বাবার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ইনি ঠানের জেলার ও জওহর স্টেটের আবগারী (মদ্য প্রস্তুতকারী) বিভাগে দশ বছর ধরে কাজ করেন। সেখানে থেকে অবসর গ্রহণ করার পর উনি অন্য চাকরী খোঁজেন কিন্তু সফল হন না। দুভার্গ্য ওঁকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে নেয় এবং ওঁর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে উনি সাত বছর কাটান। উনি প্রত্যেক বছর শিরডী যেতেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী বাবাকে শোনাতেন। ১৯১৬ সালে ওঁর দুরবস্থা যখন চরমে দাঁড়ায় তখন উনি শিরডী গিয়ে আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। এই ভেবে

উনি নিজের স্ত্রীর সাথে শিরডী আসেন এবং সেখানে দু মাস থাকেন। একদিন রাতে দীক্ষিত 'ওয়াড়া'র সামনে গরুর গাড়ীতে বসে বসে উনি কূয়ায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করেন এবং এদিকে বাবা ওঁকে রক্ষার ব্যবস্থাটা ঠিক করে রাখেন। এমন সময় কাছের এক ভোজনালয়ের মালিক শ্রী সগুণমেরু নায়ক বাইরে এসে আম্বেডকরকে জিজ্ঞাসা করেন -

"আপনি কখনো শ্রী আক্কালকোট মহারাজের জীবনী পড়েছেন?" আম্বেডকর তখন সগুণের কাছ থেকে বইটা নিয়ে পড়তে শুরু করেন। বইটা পড়তে-পড়তে একটি বিচিত্র ঘটনায় পৌঁছে উনি হতবাক্ হয়ে যান - আক্কালকোট মহারাজের জীবিতকালে একটি লোক এক অসাধ্য রোগে ভুগছিল। যখন কোন ভাবেই আর কষ্ট সহ্য করতে পারা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন একেবারে নিরাশ হয়ে সে কূয়োয় লাফিয়ে পড়ে। তক্ষুনি মহারাজ সেখানে পৌঁছে স্বয়ং হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে তোলেন। তিনি ওকে বোঝান যে **"নিজের শুভ-অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। ভোগ সম্পূর্ণ না হলে নতুন জন্মধারণ করতে হয়। তাই আত্মহত্যা না করে কিছু কাল সেগুলি সহ্য করে পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ জন্মের মতো শেষ করে দিয়ে যাও।"** এই রকম সাময়িক এবং উপযুক্ত ঘটনা পড়ে আম্বেডকর খুবই অবাক হন।

গল্পের মাধ্যমে বাবার নির্দেশ না পেলে এতক্ষণে ওঁর জীবন শেষ হয়ে যেতো। বাবার সর্বব্যাপকতা ও করুণার পরিচয় পেয়ে ওঁর বিশ্বাস সুগভীর হল। ওঁর পিতা শ্রী আক্কালকোট মহারাজের শিষ্য ছিলেন এবং তাই বাবা চাইতেন যে, উনি ওঁর পিতারই পদচিহ্ন অনুসরন করুন। বাবা ওকে আশীর্বাদ দেন ও তার ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উনি জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অনেক উন্নতি করেন। অনেক ধন উপার্জন করে শেষজীবন সুখে-সাচ্ছন্দ্যে কাটান।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ২৭

বিষ্ণুসহস্র নাম প্রদান করে অনুগৃহীত করা, গীতা রহস্য, দাদাসাহেব খাপার্ডে।

এই অধ্যায়ে শ্রী সাইবাবা ধার্মিক গ্রন্থগুলিকে করস্পর্শ করে নিজের ভক্তদের পরায়ণের জন্য দিয়ে কি ভাবে তাদের অনুগৃহীত করতেন এবং অন্যান্য কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রারম্ভ ঃ-

জনসাধারণের এইরূপ বিশ্বাস যে, সমুদ্রে স্নান করলে সমস্ত তীর্থ এবং পবিত্র নদীতে স্নান করার পুণ্য লাভ হয়। ঠিক এই রূপই সদ্‌গুরুর চরণের আশ্রয় নিলে তিনটি শক্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) এবং পরমব্রহ্মকে প্রণাম করার মঙ্গলজনক ফল সহজেই পাওয়া যায়। শ্রী সচ্চিদানন্দ সাই মহারাজের জয় হোক্। তিনি তো ভক্তদের জন্য কল্পতরু, দয়ার সাগর ও আত্মানুভূতির দাতা। হে সাই! তুমি নিজের কাহিনী শ্রবণ করিয়ে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগাও। ঝমঝমে বৃষ্টিতে যেমন স্বাতী নক্ষত্রর কেবল এক বিন্দু জল পান করেই চাতক পাখী প্রসন্ন হয়ে যায়, সেই রকমই নিজের কথার সারসিন্ধুর একটি জল কণার সহস্রাংশ দিয়ে দাও, যার দ্বারা পাঠকগণ ও শ্রোতাদের হৃদয় তৃপ্ত হয়ে আনন্দে ভরে উঠুক। শরীর হতে স্বেদ প্রবাহিত হোক, জলে চোখ ভরে যাক, প্রাণ স্থির হয়ে চিত্ত একাগ্র হয়ে যাক এবং ক্ষণে-ক্ষণে যেন দেহে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে- এইরূপ সাত্বিক ভাব সবার মধ্যে জাগ্রত করে দাও। পারস্পরিক বৈমনস্য ও বর্গ-অপবর্গের প্রভেদ নষ্ট করে দাও। তাঁরা যেন তোমার ভক্তিতে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের শরীর কম্পন দেখা দেয়। যদি এইগুলি উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়, তাহলে সেগুলি গুরুর কৃপার লক্ষণই বোঝা উচিত। এই ভাবগুলি অন্তঃকরণে উদয় হতে দেখে গুরু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে আপনাদের আত্মানুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল অনন্য ভাবে কেবল শ্রী সাইবাবার শরণে যাওয়া। বেদ-বেদান্তও মায়ারূপী সাগর পার করাতে পারে না। এই কাজটি তো কেবল সদ্‌গুরুর দ্বারাই সম্ভব। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করার যোগ্য করে তোলার ক্ষমতা শুধু তাঁরই আছে।

স্পর্শপূত গ্রন্থ প্রদান ঃ-

গত অধ্যায়ে বাবার উপদেশ দেওয়ার বিচিত্র পদ্ধতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই অধ্যায়ে শুধু একটা উদাহরণই উল্লেখ করা হবে। ভক্তরা যে গ্রন্থ বিশেষটি অধ্যয়ন করতে চাইতেন, সেটি বাবার করকমলে অর্পণ করে দিতেন। বাবা যদি সেটি নিজের শুভ হাত দিয়ে স্পর্শ করে ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে ওরা সেটি স্বীকার করে নিতো। তাদের বিশ্বাস যে, যদি সেই গ্রন্থটি নিত্য পাঠ করা হয় তাহলে বাবা সর্বদা ওদের সাথেই থাকবেন। একবার কাকা মহাজনী একনাথী ভাগবৎ নিয়ে শিরডী আসেন। শামা বইটি নিয়ে মস্‌জিদে গেলেন পড়ার জন্য। পরে বাবা সেটি স্পর্শ করে কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে শামাকে বইটি ফেরত দিয়ে তাঁর কাছেই রাখতে বলেন। তখন শামা বাবাকে জানান- "এটি ত কাকাসাহেবের এবং ওঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।" বাবা বললেন, "না, না, এই বইটি আমি তোমাকে দিলাম। তুমি এটা সাবধানে নিজের কাছে রাখো। তোমার খুব কাজে লাগবে।" কিছুদিন পর কাকামহাজনী দ্বিতীয়বার শ্রী একনাথী ভাগবৎ এনে বাবার করকমলে অর্পণ করেন। বাবা প্রসাদ স্বরূপ ফিরিয়ে ওঁকেও সেটি সাবধানে সামলে রাখার আজ্ঞা দেন। তার সাথে-সাথে এও আশ্বাসন দেন, "এটি তোমায় চরম স্থিতিতে পৌঁছতে সাহায্য করবে।" কাকা বাবাকে প্রণাম করে গ্রন্থটি গ্রহণ করেন।

শামা ও বিষ্ণুসহস্র নাম ঃ-

শামা বাবার অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাই বাবার ওঁকে এক বিচিত্র উপায়ে 'বিষ্ণু সহস্র নাম' প্রসাদ রূপে দিতে ইচ্ছে হল। সেই সময় এক রামদাসী শিরডীতে এসে কিছুদিন ছিল। সে রোজ ভোরবেলা উঠে, হাত-মুখ ধোওয়ার পর স্নান করে গেরুয়া কাপড় পরে, শরীরে উদী মেখে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করত। তারপর করত অন্যান্য ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ। বাবা শামাকে দিয়েও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ শুরু করাতে চাইতেন। এই সূত্রে উনি রামদাসীকে নিজের কাছে ডেকে বলেন, আমার পেটে খুব ব্যথা হচ্ছে। সোনামুখী পাতার রস না খেলে আমার ব্যথা দূর হবে না।" রামদাসী তক্ষুনি নিজের পাঠ ছেড়ে বাজারের দিকে ছুটল। বাবা তখন নিজের আসন থেকে উঠে রামদাসীর আসনের কাছে গিয়ে 'বিষ্ণু সহস্র নাম' পুস্তকটি উঠিয়ে আবার নিজের আসনে ফিরে আসেন। শামার দিকে তাকিয়ে বলেন- "ওহে শামা, এই বইটি খুবই দামী ও লাভদায়ক। তাই আমি তোমায় এটি দিচ্ছি, পড়ে দেখো। একবার আমি খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। বুক ধড়ফড় করত- জীবন সংশয় হয়েছিল। সেই সময় আমি এই সদ্‌গ্রন্থটি নিজের বুকের উপর রাখি। কি যে সুখ পেয়েছিলাম! সেই সময় আমার

মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরিত হয়ে আমায় রক্ষা করলেন। তাই তোমায়ও দিচ্ছি। ধীরে-ধীরে, একটু-এটকু করে দিনে অন্ততঃ একটা শ্লোক অবশ্যই পড়ো। তোমার খুব মঙ্গল হবে।" তখন শামা বলেন- আমার এই বইয়ের কোন দরকার নেই - রামদাসী এক পাগল, জেদী ও অত্যধিক রাগী লোক। এক্ষুণি এসে অকারণেই ঝগড়া করতে শুরু করবে। এছাড়া আমি সংস্কৃত ভাষা তেমন জানিও না।" শামার ধারণা ছিল যে, বাবা তাঁর ও রামদাসীর মধ্যে মনোমালিণ্যতা সৃষ্টি করতে চান, তাই তিনি এই ধরনের নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু বাবার ওঁর প্রতি কি রকম (করুণার) ভাব ছিল, সেটা উনি বুঝতে পারেন না। বাবা যেন-তেন-প্রকারেণ বিষ্ণু সহস্র নামের মালা শামার গলায় পরিয়ে দিতে চাইছিলেন। তিনি তো নিজের এক অল্পশিক্ষিত অন্তরঙ্গ ভক্তকে সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করতে চাইছিলেন। **ঈশ্বর নাম জপের মাহাত্ম্য তো সবাই জানে। এটি আমাদের পাপ থেকে বাঁচিয়ে, কু-প্রবৃত্তি হতে রক্ষা করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে। আত্মশুদ্ধির জন্য একটি উত্তম সাধন, যাতে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না আর এতে কোন নিয়মেরও বন্ধন নেই।** বাবা শুধু শামাকে দিয়ে এই সাধনাটি করাতে চাইতেন, কিন্তু শামা সে কথা বুঝতে পারছিলেন না। তাই বাবাকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে হয়। এই ধরনেরই একটি প্রসঙ্গ শোনা যায়- অনেক আগে শ্রী একনাথ মহারাজ, নিজের এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে বলে ওকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু সহস্র নাম জপ চিত্তশুদ্ধির জন্য এক শ্রেষ্ঠ এবং সরল পথ। রামদাসী বাজার থেকে তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে ফিরে আসে। আন্না চিঞ্চনীকর, 'নারদ মুনি' মতন উক্ত ঘটনার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত রামদাসীকে শোনান। রামদাসী রাগে শামার দিকে দৌড়য়, "এ তোমারই কাজ। তুমিই বাবাকে দিয়ে আমায় ওষুধ আনতে পাঠালে। বইটা ফেরত না দিলে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেবো।" শামা শান্ত ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন কিন্তু ওঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন বাবা স্নেহসিক্ত স্বরে বলেন- "আরে রামদাসী, একি কথা? উপদ্রব কেন করছ? শামা কি আমাদের আপন লোক নয়? তুমি ওকে মিছিমিছি কেন গাল দিচ্ছো? তুমি এত ঝগড়াটে হলে কি করে? একটু নম্র ও মৃদুভাষী হতে পারো না? তুমি রোজ এই পবিত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করো, তবুও তোমার চিত্ত অশুদ্ধ। তোমার ইচ্ছাই যখন তোমার বশে নেই, তখন তুমি কি ধরনের রামদাসী তোমার তো সমস্ত বস্তু থেকে অনাসক্ত থাকা উচিত। এই বইটির প্রতি এত মোহ কেন? আশ্চর্যের কথা! সত্যিকারের রামদাসী তো সে, যে মমতা ত্যাগ করে সমদর্শী হতে পারে। তুমি তো শামার সাথে একটা ছোট্ট বই নিয়ে ঝগড়া করছ। যাও গিয়ে

নিজের আসনে বসো। টাকা দিয়ে তো বই অনেক পাওয়া যেতে পারে, মানুষ পাওয়া যায় না। মনে উত্তম বিচার রেখে বিবেকবান হও। বইয়ের দামই বা কত? শামার সেটার কি প্রয়োজন? আমি স্বয়ং সেটি তুলে শামাকে দিয়েছিলাম। আমি ভাবলাম তোমার তো এটি কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। তাই শামাও এটি পাঠ করে কিছু লাভ পাক, তাই তাকে দিয়েছিলাম।" বাবার এই শব্দগুলি কত মধুর, মার্মিক ও অমৃততুল্য। এর প্রভাব রামদাসীর উপরও পড়ে। ও একেবারে শান্ত হয়ে যায় এবং তারপর শামাকে বলে- "আমি এর বদলে পঞ্চরত্নী গীতা নেব।" তখন শামাও খুশী হয়ে বলেন- "একটা কেন, আমি তো তোমাকে এটির বদলে ১০টা দিতে রাজী আছি।" এই ভাবে এই বিবাদটি শেষ হয়। কিন্তু এবার এই প্রশ্ন ওঠে যে, রামদাসী পঞ্চরত্নী গীতার (এমন একটি পুস্তক যার বিষয় ওর কখনো খেয়ালই হয়নি) জন্য এত আগ্রহান্বিত হল কেন? মস্‌জিদে যে রোজ ধার্মিক গ্রন্থ পাঠ করত, সে বাবার সামনে এত উৎপাত কিভাবে করল? আমরা জানি না এই দোষের নিরাকরণ কিভাবে করা যেতে পারে এবং দোষী কে? আমরা শুধু এতটাই জানি যে যদি এই প্রণালীটি অনুসরণ না করা হতো তাহলে বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং ঈশ্বর নামের মহিমা ও বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠের সু-ফল সম্পর্কে শামা অনভিজ্ঞ রয়ে যেতেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা এটাই বুঝতে পারা যায় যে, বাবার উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি এবং তাঁর কার্যকলাপ ছিল অদ্বিতীয়। শামা ধীরে-ধীরে এই গ্রন্থটির এতটা অধ্যয়ন করেন এবং এমন ভাবে এটি রপ্ত করে নেন যে, শ্রীমান বুটী সাহেবের জামাই, প্রোফেসর জি.জি. নারকেকেও (এম.এ., ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, পুণে) তার যথার্থ অর্থ বোঝাতে সম্পূর্ণ রূপে সফল হন।

গীতা রহস্য ঃ-

যারা ব্রহ্মবিদ্যার (আধ্যাত্ম) অধ্যয়ন করত, বাবা তাদের সব সময় উৎসাহিত করতেন। একবার বাপুসাহেব জোগ একটা পার্শেল পান। তার মধ্যে শ্রী লোকমাণ্য তিলক কৃত 'গীতা রহস্য'-এর একটি একটি কপি ছিল। উনি সেটা বগলে দাবিয়ে মস্‌জিদে আসেন। চরণ বন্দনা করার জন্য ঝুঁকতে গিয়ে পার্শেলটি বাবা শ্রী চরণের উপর পড়ে যায়। তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "এতে কি আছে?" শ্রী যোগ তক্ষুনি বইটি বার করে বাবার করকমলে রেখে দেন। বাবা কিছুক্ষণ ওর কয়েকটি পাতা উল্টে দেখেন। তারপর পকেট থেকে একটা টাকা বার করে সেটি বইটির উপর রেখে জোগকে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন- "এইটি মন দিয়ে পড়ো, তোমার কল্যাণ হবে।"

শ্রীমান এবং শ্রীমতি খাপার্ডে ঃ-

এক সময় শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডে সপরিবারে শিরডী আসেন এবং কয়েক মাস সেখানেই থাকেন। ওঁর অবস্থানের নিত্য কার্য্যক্রমের বর্ণনা 'শ্রী সাইলীলা' পত্রিকার প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। দাদা সামান্য লোক ছিলেন না। উনি অমরাবতীর (বরার) সুপ্রসিদ্ধ ও ধনশালী উকিল ছিলেন। উনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং বিধান সভার সদস্য ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এই ভদ্রলোক উচ্চ স্তরের বক্তা হিসেবে যথেষ্ঠ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এত গুণবান হওয়া সত্ত্বেও বাবার সামনে মুখ খোলার ওঁর সাহস হতো না। অনেক ভক্তই বাবার সঙ্গে কথা বলতেন ও যুক্তি-তর্কও করতেন। শুধু তিনটি ব্যক্তি-খাপার্ডে, নূলকর ও বুটীসাহেব সবসময় মৌন থাকতেন। ওঁরা অতি বিনম্র, ভদ্র ও মধুর স্বভাবের লোক ছিলেন। দাদা সাহেব বিদ্যারণ্য স্বামীর দ্বারা রচিত পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থর (অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক) বিবরণ অন্যদের বোঝাতেন। কিন্তু যখন বাবার সামনে মস্‌জিদে আসতেন, তখন একটা শব্দও উচ্চারণ করতেন না। আসলে যে যতই বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হোক না কেন, ব্রহ্মপদে স্থিত ব্যক্তির সামনে ওর শুষ্ক জ্ঞান আলোকপাত করতে পারে না। দাদা চার মাস ও ওঁর স্ত্রী সাত মাস শিরডীতে ছিলেন। ওঁরা দুজনেই শিরডী অবস্থানে অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন। শ্রীমতি খাপার্ডে ছিলেন শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমতি মহিলা। ওঁর শ্রী সাইয়ের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ছিল। প্রতিদিন দুপুরে নিজে নৈবেদ্য নিয়ে মস্‌জিদে যেতেন। বাবা সেটা গ্রহণ করলে, তবে ফিরে এসে নিজে আহার করতেন। বাবা অন্যদেরও শ্রীমতি খাপার্ডের অটল শ্রদ্ধার ক্ষণিক দর্শন করাতে চাইতেন। একদিন দুপুরে উনি সুজির পায়েস, লুচি, ভাত, পাঁপড় এবং অন্যান্য ভোজ্য পদার্থ নিয়ে মস্‌জিদে আসেন। অন্যান্য দিন বাবার প্রতীক্ষায় খাবার পড়ে থাকত। কিন্তু সেদিন তিনি তক্ষুনি উঠে খাবারের জায়গায় আসন গ্রহণ করেন। থালার উপর থেকে কাপড় সরিয়ে সানন্দে খাবার খেতে শুরু করে দেন। তখন শামা বলেন- "এই পক্ষপাতিত্বের কারণ টি কি? অন্যদের থালার দিকে তো আপনি ফিরেও তাকান না বরং কখনো-কখনো সেগুলি সরিয়ে দেন। কিন্তু আজ আপনি খুবই উৎসুক ও খুশী হয়ে খাচ্ছেন। আজ এই মায়ের খাবার আপনার এত সুস্বাদু কেন লাগছে? বড়ই বিচিত্র ব্যাপার তো!" তখন বাবা নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাপারটা বোঝান-

"সত্যি এই ব্যাপারটা বিচিত্র। পূর্বজন্মে এই মহিলাটি এক ব্যবসায়ীর গরু ছিল এবং প্রচুর দুধ দিত। পশুযোনি ছেড়ে এ এক মালীর বাড়ীতে জন্ম নেয়। ঐ জন্মের

পর এক ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্ম নিয়ে বিয়ে করল এক ব্যবসায়ীকে। দীর্ঘকাল পর এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই এর থালা থেকে চারটি গ্রাস খেয়ে নিতে দাও।" এই বলে বাবা পেট ভরে খেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে, তৃপ্তির চার-পাঁচটা ঢেকুর তুলে নিজের আসনে এসে বসেন। শ্রীমতি খাপার্ডে বাবাকে প্রণাম করে তাঁর চরণ সেবা করতে লাগলেন। বাবা ওঁর সাথে গল্প করতে শুরু করেন এবং সাথে-সাথে ওঁর হাতও টিপতে থাকেন। পরস্পরের এই সেবা দেখে শামা হেসে বলেন- "দেখো তো, এ কি অদ্ভুত দৃশ্য। ভগবান আর ভক্ত একজন অন্য জনের সেবা করছেন।" শ্রীমতি খাপার্ডের কপটহীন উৎসাহ দেখে বাবা অত্যন্ত নরম ও মৃদু শব্দে বলেন- "এবার থেকে সর্বদা 'রাজারাম-রাজারাম' মন্ত্রের জপ কোর। যদি তুমি এর নিত্য অভ্যাস করো, তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। শান্তি পাবে, অত্যধিক লাভ হবে।" আধ্যাত্মিক বিষয়ে অজ্ঞ লোকেরা এটিকে একটি অতি সাধারণ ঘটনা বলে মনে করতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রের ভাষাতে এটিকে 'শক্তিপাত' বলা হয় অর্থাৎ গুরু দ্বারা শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা। বাবার শব্দগুলি এত শক্তিশালী ছিল যে, এক মুহূর্তে মহিলাটিকে প্রভাবিত করে ওঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে যায় এবং সেখানে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এই ঘটনাটি গুরু ও শিষ্যর সম্বন্ধের আদর্শের দ্যোতক। গুরু ও শিষ্য দুজনেই একে-অন্যকে অভিন্ন জেনে একজন-অন্যজনকে প্রেম ও সেবা করেন কারণ ওঁদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। তাঁরা দুজনে অভিন্ন এবং একই, একে-অন্যকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। শিষ্য গুরুদেবের চরণতলে-মাথা নত করছেন- এতো শুধু বাহ্য দৃশ্যমাত্র। আন্তরিক দৃষ্টিতে এরা দুজনে অভিন্ন এবং এক। তাঁদের মধ্যে যে ভেদ দেখে, সে এখনো অপরিপক্ক এবং অপূর্ণ।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ২৮

পাখীদের শিরডীতে টেনে আনা - ১) লক্ষ্মীচন্দ ২) বুরহানপুরের মহিলা ৩) মেঘার নির্বাণ।

শ্রী সাই অনন্ত। তিনি একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সর্বভূতে ব্যাপ্ত। বেদ ও আত্ম বিজ্ঞানে পূর্ণ পারঙ্গম হওয়ার দরুণ তিনি ছিলেন সদ্‌গুরু উপাধির সম্পূর্ণ যোগ্য। বিদ্বান হয়েও যদি গুরু নিজের শিষ্যকে সজাগ করে তাকে আত্মস্বরূপের দর্শন না করাতে পারেন, তাহলে তাঁকে সদ্‌গুরু নামে কদাপি সম্বোধন করা যায় না। সাধারণতঃ, পিতা কেবল এই নশ্বর শরীরেরই জন্মদাতা। কিন্তু সদ্‌গুরু জন্ম ও মৃত্যু-দুটোর থেকেই মুক্তি পাইয়ে দেন। অতএব তিনি অন্য লোকেদের চেয়ে বেশী দয়াবন্ত।

শ্রী সাইবাবা সব সময় বলতেন- **"আমার ভক্ত এক হাজার ক্রোশ দূরে থাকলেও শিরডীর টানে এইভাবে আকর্ষিত হয়ে চলে আসে, যেমন সূতোয় বাঁধা চড়াইপাখী নিজেই চলে আসে।"** এই অধ্যায়ে এমনি তিনটি পাখীর বর্ণনা করা হয়েছে।

১) লালা লক্ষ্মীচন্দ ঃ-

এই ভদ্রলোক বম্বের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর প্রেসে চাকরী করতেন। সেই চাকরীটা ছেড়ে উনি রেল বিভাগে আসেন এবং তারপর মেসার্স রেলী ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীতে কেরাণীর চাকরীতে ঢোকেন। ১৯১০ সালে ওঁর শ্রী সাইবাবার সাথে যোগাযোগ হয়। বড়দিনের (ক্রিসমাস্) প্রায় মাস দুই আগে সান্তাক্রুজে থাকাকালীন একটি স্বপ্ন দেখেন- এক দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধকে ভক্তরা ঘিরে বসে আছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর উনি নিজের বন্ধু শ্রী দত্তাত্রেয় মঞ্জুনাথ বিজয়ের বাড়ীতে দাসগণুর কীর্তন শুনতে যান। শ্রী দাসগণুর একটা নিয়ম ছিল যে, উনি কীর্তন করার সময় শ্রোতাদের সামনে শ্রী সাইবাবার ছবি নিশ্চয়ই সাজিয়ে রাখতেন। লক্ষ্মীচন্দ এই ছবিটি দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হন, কারণ স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধটির আকৃতি হুবহু এই ছবিটির মতন ছিল। ওঁর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, যিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন তিনি শ্রী সাইনাথ ছাড়া আর কেউ নন। চিত্র-

দর্শন, দাসগণুর মধুর কীর্তন এবং সন্ত তুকারামের উপর প্রবচন ইত্যাদির এমন একটা প্রভাব ওঁর উপর পড়ে যে, উনি শিরডী যাত্রার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেন। চিরকালই ভক্তরা এটা অনুভব করেছে যে, যে সদ্‌গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের খোঁজে বেরোয়, তাকে ঈশ্বর পদে-পদে সাহায্য করেন। সেই রাতেই ওঁর এক বন্ধু, শঙ্কর রাও ওঁর বাড়ী আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে- "আপনি কি আমাদের সাথে শিরডী যাবেন?" এই কথা শুনে লক্ষ্মীচন্দের মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং তক্ষুনি শিরডী যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। এক মারোয়াড়ীর কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার নিয়ে এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যবস্থা করে উনি শিরডী অভিমুখে রওনা হন। ট্রেনে বন্ধুর সাথে কিছুক্ষণ ভজন-কীর্তনও করেন। ঐ কামরায় চারজন মুসলমানও বসেছিল, যারা শিরডীর কাছেই নিজেদের বাড়ী ফিরছিল। লক্ষ্মীচন্দ তাদের কাছে শ্রী সাইবাবার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তারা ওকে জানায়- "শ্রী সাইবাবা শিরডীতে অনেক বছর ধরে আছেন এবং উনি এক খুবই উচ্চ শ্রেণীর সন্ত।" কোপর গ্রামে পৌঁছে লক্ষ্মীচন্দের বাবার জন্য কিছু পেয়ারা কেনার ইচ্ছে হয়। কিন্তু একটু পরই সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখতে এতো মগ্ন হয়ে যান যে, পেয়ারার কথা একেবারেই ভুলে যান।। ঠিক শিরডীর কাছাকাছি পৌঁছে ওঁর পেয়ারা কেনার কথা মনে পড়ে। ইতিমধ্যে উনি একটি বৃদ্ধাকে টুকরী নিয়ে টাঙ্গার পেছনে দৌড়ে-দৌড়ে আসতে দেখেন। এই দেখে উনি টাঙ্গা থামান এবং টুকরীতে পেয়ারা দেখে কিছু বালো পেয়ারা কিনে নেন। তখন ঐ বৃদ্ধাটি ওঁকে বলেন- "দয়া করে এই বাকি পেয়ারা গুলোও আমার হয়ে বাবাকে অর্পণ করে দেবেন।" এই কথা শুনতেই লক্ষ্মীচন্দের মনে হয়- "আমার পেয়ারা কেনার যে ইচ্ছেটা ছিল এবং যেটা আমি পরে ভুলে যাই, সেটা এই বৃদ্ধা আমায় মনে করিয়ে দিল।" শ্রী সাইবাবার প্রতি ঐ বৃদ্ধার ভক্তি দেখে ওঁরা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে যান। লক্ষ্মীচন্দ ভাবতে বাধ্য হন যে- 'যে বৃদ্ধকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এই বৃদ্ধা বোধহয় তাঁরই কোন আত্মীয়া।" শিরডী পৌঁছতেই দূর থেকেই মস্‌জিদে ধ্বজাকে প্রণাম করেন। হাতে পূজোর সামগ্রী নিয়ে মস্‌জিদে পৌঁছন। তিনি বাবার বিধি সম্মত ভাবে পূজা-অর্চনা করে তৃপ্তি অনুভব করেন। বাবাকে দর্শন করে উনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর চরণ দুটি এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেন, যেমন একটি মৌমাছি পদ্মফুলের মকরন্দের সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে। তখন বাবা ওঁকে যা-যা বলেন সেটা হেমাডপন্ত নিজের মূল গ্রন্থে এই ভাবে বর্ণনা করেছেন, "ব্যাটা, রাস্তায় ভজন-কীর্তন করে এবং অন্য লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অন্যদের জিজ্ঞাসা করার কি দরকার? সব কিছু নিজের চোখেই দেখো। কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করা? স্বপ্ন মিথ্যে

না সত্যি? এবার নিজেই বিচার করে নাও। মারোয়াড়ীর কাছ থেকে ধার নেওয়ার কি দরকার ছিল? মনের ইচ্ছে কি পূরণ হলো?" এই শব্দগুলি শুনে বাবার সর্বব্যাপকতা অনুভব করে লক্ষ্মীচন্দ বিস্মিত হন। ওঁর ভেবে লজ্জা হয় যে, বাড়ী থেকে শিরডী পর্যন্ত রাস্তায় যা যা ঘটেছিল, সে সব কথা বাবা জানতেন। এখানে লক্ষ্য করার মত বিষয় হল এই যে, ঋণ নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে আসা বা ধার করে তীর্থ যাত্রা বা আনন্দোৎসব করা তিনি পছন্দ করতেন না।

'সাঁজা' (এক রকমের সুজীর পায়েস)

দুপুরে খাওয়ার সময় এক ভক্তের কাছ থেকে 'সাঁজা'র প্রসাদ পেয়ে লক্ষ্মীচন্দ খুব খুশী হন। পরের দিনও উনি 'সাঁজা'র আশাতেই বসেছিলেন, কিন্তু সেদিন আর কোন ভক্ত সেই প্রসাদ বিতরণ করেনি। তৃতীয় দিন বাপুসাহেব যোগ বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন কিসের নৈবেদ্য অর্পণ করা হবে? বাবা ওঁকে 'সাঁজা' আনতে বলেন। ভক্তরা দুটো বড় পাত্র ভরে 'সাঁজা' নিয়ে আসেন। লক্ষ্মীচন্দের ক্ষিধেও খুব জোরে পেয়েছিল। ওঁর পিঠেও একটা ব্যথা হচ্ছিল। বাবা লক্ষ্মীচন্দকে বলেন- "তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই না? ভালো কথা। কোমরে ব্যথাও হচ্ছে? নাও এবার 'সাঁজা'ই ওষুধ হিসেবে খাও।' লক্ষ্মীচন্দ আবার খুব অবাক হয়ে যান যে, ওঁর মনের সব কথাগুলি বাবা কি করে জেনে ফেললেন। নিশ্চয় উনি সর্বজ্ঞ!

কু-দৃষ্টি ঃ-

এই যাত্রাতেই ওঁর একবার 'চাওড়ী' শোভা যাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয়। সেদিন বাবার কাশি ও শ্লেষ্মার দরুণ শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। লক্ষ্মীচন্দ ভাবেন বাবার নিশ্চয়ই কারো নজর লেগে গেছে। তাই তিনি এইরকম কষ্ট পাচ্ছেন। পরের দিন সকালবেলা মস্‌জিদে বাবা শামাকে বলেন, "গতকাল যে আমার কষ্ট হচ্ছিল তার কারণ অবশ্যই কারুর কু-দৃষ্টি। আমার মনে হচ্ছে আমার বোধহয় কারো নজর লাগল। তাই আমার এত কষ্ট হচ্ছে।" লক্ষ্মীচন্দের মনের কথাটা বাবা এইভাবে প্রকাশ করেন। বাবার সর্বজ্ঞতার অনেক প্রমাণ ও ভক্তদের প্রতি বাবার স্নেহ দেখে লক্ষ্মীচন্দ বাবার চরণে পড়ে বলেন- "আপনার অপূর্ব দর্শন পেয়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমার মন-মধুপ আপনার চরণ পদ্মে এবং ভজনগানেই যেন নিমগ্ন থাকে। আপনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর আছে বলে আমি জানি না। কৃপা ও স্নেহ দিয়ে এই দাসকে রক্ষা করে তার কল্যাণ করুন। আপনার ভবভয়নাশক চরণ স্মরণ করতে-করতেই যেন আমার

জীবন আনন্দে কেটে যায়, এই আমার আপনার কাছে বিনম্র প্রার্থনা।"

বাবার আশীর্বাদ ও উদী পেয়ে খুবই আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হন। বন্ধুর সাথে সারা রাস্তা বাবার লীলার গুণগান করতে-করতে উনি বাড়ী ফিরে আসেন। বলা বাহুল্য, এর পর উনি বাবার অন্যান্য ভক্ত হয়ে ওঠেন। শিরডী যাত্রীদের হাতে উনি বাবার জন্য মালা, কর্পূর ও দক্ষিণা পাঠাতেন।

২) বুরহানপুরের মহিলা ঃ-

এবার এই দ্বিতীয় পাখীটির (ভক্ত) বর্ণনা করা হবে। একদিন বুরহানপুরের এক মহিলা স্বপ্নে দেখেন যে শ্রী সাইবাবা ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে খিচুড়ী চাইছেন। ঘুম থেকে ওঠে দরজায় কাউকে দেখতে পান না। তবুও স্বপ্নের কথা ভেবে ওঁর খুব ভালো লাগে এবং নিজের স্বামী ও অন্যান্য লোকেদের স্বপ্নের কথাটা জানান। ওঁর স্বামী ডাক বিভাগে কাজ করতেন। ওঁরা দুজনেই খুব ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন অকোলায় স্থানান্তরণ তখন ওঁরা শিরডী যাওয়া স্থির করেন। একটা শুভদিন দেখে শিরডীর জন্য রওনা হন। পথে গোমতী তীর্থ হয়ে ওঁরা শিরডী পৌছন এবং সেখানে দুমাস থাকেন। প্রতি দিন ওঁরা মস্‌জিদে যেতেন এবং বাবার পূজো করে আনন্দে নিজেদের সময় কাটাতেন। যদিও ঐ দম্পতি বাবাকে খিচুড়ী ভোগ অর্পণ করতে এসেছিলেন, কিন্তু কোন-না-কোন কারণে চৌদ্দ দিন অবধি ওঁদের সেই সুযোগ আর মেলে না। কিন্তু ঐ মহিলা এই কাজে আর দেরী করতে চাইতেন না। পনেরো দিনের দিন খিচুড়ী নিয়ে মস্‌জিদে পৌছে দেখেন বাবা অন্য লোকেদের সাথে খেতে বসে গেছেন। পর্দা টানা হয়ে গেলে কেউ ভেতরে প্রবেশ করার সাহস করত না। কিন্তু উনি আর এক দণ্ড প্রতীক্ষা করতে পারছিলেন না। হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে যান। খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে বাবার সেদিন সব চেয়ে আগে খিচুড়ী খেতে ইচ্ছে করছিল। মহিলাটি থালা নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই বাবা খুব খুশী হন ও তার থেকেই খিচুড়ীর দলা নিয়ে খেতে শুরু করেন। বাবাকে এইরূপ আগ্রহান্বিত দেখে প্রত্যেকেই খুব অবাক হয়। পরে যে-যে এই খিচুড়ীর গল্পটি শোনে, ভক্তদের প্রতি বাবার স্নেহ দেখে তার খুবই আনন্দ হয়।

মেঘার নির্বান ঃ-

এবার তৃতীয় মহান পাখীর গল্প শুনুন। বিরম গ্রামের মেঘা ছিল রাও বাহাদুর হরি বিনায়ক সাঠের একজন সরল, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ রাঁধুনি। সে শিবের পরম ভক্ত

ছিল ও সর্বদা পঞ্চাক্ষরীয় মন্ত্র 'ওঁ নমো শিবায়' এর জপ করত। সন্ধ্যা উপাসনা ইত্যাদি ও কিছুই জানত না, এমনকি সন্ধ্যার মূল গায়ত্রী মন্ত্র পর্যন্ত জানত না। রাও বাহাদুর ওকে খুবই স্নেহ করতেন। তাই ওকে সন্ধ্যার বিধি এবং গায়ত্রী মন্ত্র শিখিয়ে দেন। 'শ্রী সাইবাবা শিবের সাক্ষাৎ অবতার' এই বলে শ্রী রাওবাহাদুর মেঘাকে শিরডী পাঠাবেন ঠিক করেন। কিন্তু শ্রী সাঠেকে জিজ্ঞাসা করায় মেঘা জানতে পারে যে, শ্রী সাইবাবা তো মুসলমান। তাই মেঘা ভাবে যে, শিরডী গিয়ে এক মুসলমানকে প্রণাম করতে হবে এটা তো ঠিক কথা নয়। সাদাসিধা তো সে ছিলই, তাই ওর মনে অসমঞ্জস সহজেই দেখা দেয়। তখন সে নিজের মালিককে প্রার্থনা করে- "দয়া করে আমাকে সেখানে পাঠাবেন না।" কিন্তু সাঠেসাহের ওর কথা শুনতে মোটেই রাজী ছিলেন না। ওঁর সামনে মেঘার অনুরোধ টিঁকল না। সাঠেসাহেব নিজের শ্বশুর শ্রী গণেশ দামোদর ওরফে দাদা কেলকরকে (যিনি শিরডীতেই থাকতেন) একটা চিঠি লেখেন- 'মেঘার পরিচয় বাবার সাথে করিয়ে দেবেন' এবং মেঘাকে চিঠিটি দিয়ে কোন রকমে শিরডী পাঠিয়ে দেন। শিরডী পৌঁছে মেঘা মস্‌জিদের ঢুকতে যাবে এমন সময় বাবা অত্যন্ত রেগে ওঠেন। ওকে মস্‌জিদে ঢুকতে মানা করে দেন। তিনি গর্জন করে বলেন- "একে বাইরে বার করে দাও।" তারপর মেঘার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি এক উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং আমি নিম্ন জাতির এক মুসলমান। এখানে এলে তোমার জাত যাবে। তাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" এই কথা শুনে মেঘা কেঁপে ওঠে এবং খুবই বিস্মিত হয় যে, ওর মনের কথাগুলি বাবা কি করে জানতে পারলেন! কোন ক্রমে ও শিরডীতে কিছুদিন থাকে এবং নিজের সাধ্যমত সেবাও করে। কিন্তু ওর তৃপ্তি হয় না। ও বাড়ী ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ত্র্যয়ম্বক (জেলা নাসিক) চলে যায়। পুরো এক বছর পর ও আবার শিরডী আসে এবং এবার দাদা কেলকরের বলাতে মস্‌জিদে ঢোকার সুযোগও পায়। শ্রী সাইবাবা মৌখিক উপদেশ দ্বারা মেঘার উন্নতি করার চেয়ে ওর হৃদয় পরিবর্তন বা আন্তরিক সংশোধন করতে চাইছিলেন। ফলে মেঘার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। এখন ও শ্রী সাইবাবাকে শিবেরই সাক্ষাৎ অবতার বলে মানত। শিব পূজোয় বেলপাতা নিতান্তই আবশ্যক। নিজের শিবের (শ্রী বাবা) পূজোর জন্য বেলপাতার খোঁজে সে অনেক দূর অবধি চলে যেতো। প্রতিদিনের তার এই নিয়ম ছিল যে, গ্রামে যতগুলি দেবালয় আছে, আগে সেখানে গিয়ে পূজো করত এবং তার পর মস্‌জিদে এসে বাবাকে প্রণাম করে কিছুক্ষণ চরণ সেবা করে চরণামৃত পান করত। একবার খণ্ডোবা মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকায় পূজো না করেই মস্‌জিদে ফিরে আসে। কিন্তু মস্‌জিদে বাবা ওর সেবা স্বীকার করেন না এবং ওকে আগে খাণ্ডোবা মন্দিরে

পূজো করে আসতে বলেন। বাবা ওকে জানান যে, মন্দিরের দ্বার খুলে গেছে। যথারীতি পূজো করে ফিরে আসার পরই বাবা ওকে তাঁর পূজো করার অনুমতি দেন।

গঙ্গাস্নান ঃ-

একবার মকর সংক্রান্তির দিন মেঘার ইচ্ছে হয় যে, সে বাবাকে চন্দন লাগিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করাবে। বাবা প্রথমে এ বিষয়ে স্বীকৃতি দেন না। কিন্তু ওর নিরন্তর প্রার্থনার পর উনি কোনরকমে রাজী হন। গোদাবরী নদীর পবিত্র জল আনার জন্য আট ক্রোশ দূরে যেতে হতো। দুপুরের মধ্যে মেঘা সব ব্যবস্থা করে ফেলে। এরপর ও বাবাকে তৈরী হয়ে নিতে বলে। বাবা আবার মেঘাকে অনুরোধ করেন- "আমায় এই ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে থাকতে দাও। আমি তো এক ফকির, গঙ্গাজলে স্নান করে কি করব?" কিন্তু মেঘা কোন কথা শুনতে রাজী নয়। তার দৃঢ় ধারণা- 'শিবঠাকুর গঙ্গাজল পেয়ে খুব প্রসন্ন হন। তাই এই রকম শুভ পর্বে নিজের শিবঠাকুরকে স্নান করানো আমাদের পরম কর্তব্য।' এবার বাবাকে রাজী হতেই হলো। বাবা নীচে নেমে একটা পিঁড়িতে বসে মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলেন- "শুধু মাথাতেই জল ঢেলো। মাথাই শরীরের প্রধান অঙ্গ। তার উপর জল ঢালা আর পুরো শরীরের উপর জল ঢালা সমান।" মেঘা, 'আচ্ছা, আচ্ছা' বলতে-বলতে পাত্রটা বাবার গায়ে উপুড় করে দিল। তারপর খালি পাত্রটা একদিকে রেখে, বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একি আশ্চর্য কাণ্ড! বাবার কেবল মাথাটাই ভিজেছে এবং বাকী শরীরটা যেমন কে তেমন শুকনোই রয়েছে।

ত্রিশুল এবং পিণ্ডী ঃ-

মেঘা বাবাকে দু জায়গায় পূজো করত। প্রথমে মস্‌জিদে সশরীরে বাবাকে পূজো করত এবং তারপর ওয়াড়ায় ফিরে নানাসাহেব চাঁদোরকরের দেওয়া বড় ছবিটাকে। এই ভাবে এই ক্রম বারো মাস চলে। বাবা ওর ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য ওকে দর্শন দেন। একদিন ভোরবেলা যখন মেঘা অর্দ্ধ নিদ্রাবস্থায় বিছানায় শুয়েছিল, তখন ও বাবার দর্শন পায়। বাবা ওকে জাগ্রত ভেবে কিছু কুমকুম মেশানো চাল ("অক্ষত") ছড়িয়ে দেন এবং বলেন- "মেঘা, একটা ত্রিশুল আঁকো।" এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। মেঘা উৎসুক হয়ে চোখ খোলে কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। শুধু এখানে-ওখানে চালের দানা ছড়ানো ছিল। এরপর মস্‌জিদে গিয়ে বাবাকে নিজের স্বপ্নের কথা বলে ত্রিশুল টানার অনুমতি চায়। বাবা বলেন- "তুমি কি আমার কথা

শোননি? আমি তো বললাম 'ত্রিশুল আঁকো।' ওটা কোন স্বপ্ন নয় বরং আমারই প্রত্যক্ষ আদেশ। আমার কথা সর্বদা অর্থপূর্ণ হয়, আমি আজে-বাজে কথা বলি না।" মেঘা সে কথা স্বীকার করে বলেন- "আপনি দয়া করে আমায় ঘুম থেকে জাগিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু সব কটি দরজা বন্ধ দেখে এই মূঢ় ব্যক্তির ভ্রান্তি হয় যে, বোধহয় সেটা স্বপ্নই ছিল।" বাবা উত্তর দেন- "প্রবেশ করার জন্য আমার কোন দরজার দরকার হয় না। যে আমার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সর্বদা আমারই চিন্তন করে, তার সব কাজ আমিই স্বয়ং করি এবং শেষে তাকে শ্রেষ্ঠ (চরম) গতি প্রদান করি।" মেঘা নিজের বাসস্থানে ফিরে বাবার ছবির কাছে দেওয়ালে একটা লাল ত্রিশুল আঁকে। পরের দিন এক রামদাসী ভক্ত পুণে থেকে শিরডী এসে পৌঁছয়। ও বাবাকে প্রণাম করে একটি শিবলিঙ্গ উপহার দেয়। সেই সময় মেঘাও সেখানে এসে পৌঁছয়। তখন বাবা ওকে বলেন- "দেখো, ভোলাশঙ্কর এসে গেছেন। এবার এঁকে সামলাও।" মেঘা তার উপর ত্রিশুল আঁকা দেখে মহান বিস্মিত হয়। কাকা সাহেব দীক্ষিত স্নান করে মাথার উপর গামছা দিয়ে, 'সাই' নাম জপ করছিলেন। এমন সময় মানস চক্ষে দেখলেন এক শিবলিঙ্গ। ওঁর একটু কৌতুহল হয়। ঠিক সেই সময় মেঘা মস্‌জিদ থেকে ফিরছে। মেঘা বাবার দেওয়া শিবলিঙ্গটি কাকাকে দেখায়। শিবলিঙ্গটি ঠিক সেরকমই ছিল, যেমনটি কাকাসাহেব একটু আগে দেখেছিলেন। ত্রিশুল টানার কিছুদিনের মধ্যেই বাবা বড় ছবিটির (যেটির পূজো মেঘা নিত্য করত) কাছে ঐ লিঙ্গটি স্থাপনা করে দেন। মেঘা শিব পূজো খুব ভালবাসত। ত্রিশুল টানার সুযোগ দিয়ে ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে বাবা ওর বিশ্বাস দৃঢ় করে দেন।

এই ভাবে অনেক বছর ধরে দুপুর ও সন্ধ্যার সময় নিয়মিতভাবে আরতি এবং পূজো করে ১৯১২ সালে মেঘা পরলোক গমন করে। বাবা ওর মৃত শরীরের উপর হাত বুলিয়ে বলেন, "এ আমার সত্যিকারের ভক্ত ছিল।" তারপর বাবা নিজের খরচায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার আদেশ দেন, যেটা কাকাসাহেব দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ চতুর্থ বিশ্রাম

অধ্যায় - ২৯

১) মাদ্রাজী ভজন-মণ্ডলী২) তেন্ডুলকর (পিতা ও পুত্র) ৩) ডাক্তার ক্যাপ্টেন হাটে এবং ৪) বামন নার্বেকরের গল্প।

১) মাদ্রাজী ভজনাকারী মেলা ঃ-

১৯১৬ সাল নাগাদ এক মাদ্রাজী ভজন মণ্ডলী পবিত্র কাশীর তীর্থ করতে বেরোয়। ঐ মণ্ডলীতে একটি পুরুষ, তার স্ত্রী, ছেলে ও শ্যালিকা ছিল। রাস্তায় ওরা জানতে পারে যে, আহমদনগরে কোপরগ্রামের কাছে শিরডী গ্রামে শ্রী সাইবাবা নামক এক মহান সন্ত থাকেন। তিনি খুবই দয়ালু ও উচ্চ শ্রেণীর সাধু। তাঁর হৃদয় খুবই উদার এবং তিনি কৃপার সাগর। তিনি প্রতিদিন ভক্তদের টাকা বিতরণ করেন। যদি কোন শিল্পী সেখানে গিয়ে নিজের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তো সেও পুরস্কার পায়। প্রতিদিন বাবার কাছে দক্ষিণা রূপে অনেক টাকা জড়ো হতো। বাবা তার থেকে রোজ একটাকা ভক্ত কোণ্ডাজী তিন বছরের মেয়ে অমণীকে, ছ টাকা অমলীর মা জমলীকে এবং কখনো দশ বা কুড়ি বা কখনো-কখনো পঞ্চাশ টাকাও নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। এই শুনে ভজন মণ্ডলীও শিরডী এসে পৌঁছয়। ওরা খুব সুন্দর ভজন ও গান করত, কিন্তু ওদের আন্তরিক ইচ্ছে ধন উপার্জন করাই ছিল। ঐ দলে তিনটে লোক বড়ই লোভী ছিল। শুধু প্রধান স্ত্রীটির স্বভাব ছিল এদের থেকে একেবারেই ভিন্ন। ওর হৃদয়ে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। এক দিন দুপুরের আরতির সময় ঐ মহিলাটির ভক্তি ও বিশ্বাস দেখে বাবা প্রসন্ন হন। তারপর আর কি? বাবা ওকে ওর ইষ্টের রূপে দর্শন দেন এবং শুধু ওই বাবাকে সীতানাথ রূপে দেখতে পায়। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য লোকেরা তাঁকে বাবা রূপেই দেখে। নিজের প্রিয় ইষ্ট দেবের দর্শন পেয়ে আনন্দে মহিলাটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। প্রেমোন্মাদ হয়ে ও তালি বাজাতে শুরু করে। ওকে এই রূপ আত্মহারা হতে দেখে লোকেদের কৌতূহল হয়, কিন্তু কেউ কারণটা জানতে পারে না। পরে ও নিজের স্বামীকে সমস্ত কথা খুলে বলে। বাবা ওকে শ্রীরাম রূপে কিভাবে দর্শন দেন, সে সব জানায়। কিন্তু ওর স্বামী ভাবে যে- "আমার স্ত্রী খুবই ভাবুক ও সরল। সুতরাং

শ্রীরামের দর্শন পাওয়াটা ওর একটা মানসিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়।" ও নিজের পত্নীর কথা উপেক্ষা করে বলে- "এটা কি করে সম্ভব যে, বাবা শুধু তোমাকেই শ্রীরাম রূপে দর্শন দিলেন আর বাকি সব ভক্তরা বাবারই দর্শন পেলো।" ওর স্ত্রী এর উত্তরে কোন প্রতিবাদ করল না কারণ ঐ সময় যে ভাবে ও শ্রীরামের দর্শন পেয়েছিল, ঠিক সেরকমই দর্শন এখনো পাচ্ছিল। ওর মন শান্তি, স্থিরতা ও তৃপ্তি লাভ করে।

আশ্চর্যজনক দর্শন ঃ-

এই ভাবে দিন কাটতে থাকে। এক রাতে পুরুষটি একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে যে, একটা বড় শহরে পুলিশ ওকে ধরে দড়ি দিয়ে বেঁধে কারাগারে বন্ধ করে দিয়েছে। বাবা শান্ত মুদ্রায় ওর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে নিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও কাতর ভাবে বলে ওঠে- "আপনার কীর্তি শুনে আমি আপনার শ্রীচরণে এসেছিলাম। আপনার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমার এইরূপ বিপদ কি করে হলো?" তখন বাবা বলেন- "তোমাকে নিজের কু-কর্মের ফল ভুগতে হবে।" ও তখন উত্তর দেয়- "এই জন্মে আমার সে রকম কোন কর্মের কথা মনে নেই, যার দরুণ আমায় এই দুর্দিন দেখতে হচ্ছে।" বাবা বলেন- "এই জন্মে নয় তো গত জন্মে নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করেছিলে।" তখন লোকটি বলে- "আমার গত জন্মের কথা তো কিছু মনে নেই। কিন্তু ধরুন কোন ভুল কাজ করেও যদি ফেলেছিলাম তবুও আপনার উপস্থিতিতে সেটা তক্ষুনি জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, যেমন শুকনো ঘাস আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "তোমার কি সত্যি-সত্যি এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে?" লোকটি উত্তর দেয়- "হ্যাঁ"। বাবা তখন ওকে চোখ বন্ধ করতে বলেন এবং চোখ বন্ধ করতেই ও একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ পায়। চোখ খুলে ও দেখে যে, ও কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং পুলিশটা মাটিতে পড়ে আছে ও তার গা থেকে রক্ত পড়ছে। এই দেখে ও অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। তা দেখে বাবা বলেন- "ব্যাটা, এইবার তোমার ভালো ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশ এসে এক্ষুনি তোমায় ধরে নেবে।" তখন ও মিনতি করে বলে- "আপনি ছাড়া আমায় কে রক্ষা করতে পারে? আমার তো একমাত্র আপনিই ভরসা। ভগবান! আমায় যেমন করে হোক্ বাঁচিয়ে নিন।" তখন বাবা ওকে আবার চোখ বন্ধ করতে বলেন। চোখ খুলে দেখে যে ও সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কাঠগড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং বাবাও ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ও বাবার শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়ে।

বাবা এবার জিজ্ঞাসা করেন- "আমায় বলো তো তোমার এখনকার প্রণামটি ও আগের প্রণামগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না? ভালোভাবে ভেবে জবাব দিও।"

লোকটি বলে- "আকাশ -পাতালের পার্থক্য আছে আমার এখনকার ও আগের প্রণামের মধ্যে। আগের প্রণামগুলি তো শুধু ধন-প্রাপ্তির আশায় করেছিলাম। কিন্তু এই প্রণামটি আমি আপনাকে ঈশ্বর জেনে করেছি। আগে আমার ধারণা ছিল যে, আপনি মুসলমান হয়ে হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট করছেন।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি মুসলমান পীরদের বিশ্বাস করো না?" প্রত্যুত্তরে সে বলে- "আজ্ঞে না।" তখন বাবা আবার জিজ্ঞাসা করেন- "তোমার বাড়ীতে কি একটা পাঞ্জা নেই? তুমি কি 'তাবুতের' (শবাধার) পূজো করো না? তোমার বাড়ীতে এখনও কাডবীবী নামক এক দেবী আছেন, যার সামনে তুমি বিয়ে ও অন্যান্য ধার্মিক অবসরে কৃপা প্রার্থনা করো।" শেষে যখন ও সব স্বীকার করে তখন বাবা বলেন- "এর চেয়ে বেশী তুমি আর কি প্রমাণ চাও?" তখন লোকটি নিজের গুরু শ্রীরামদাসের দর্শন করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। বাবার আদেশে ও পিছনে ফিরে দেখে যে, শ্রীরামদাস স্বামী ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং যেই ও তাঁর চরণ ছুঁতে যায়, তক্ষুনি তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

তখন ও বাবাকে বলে- "আপনাকে দেখে তো বেশ বৃদ্ধ মনে হয়। আপনি নিজের বয়স জানেন?" বাবা তখন বলেন, "তুমি কি বলতে চাও, আমি বৃদ্ধ? বেশ, কিছুদূর আমার সঙ্গে দৌড়ে দেখাও দেখি।" এই বলে বাবা দৌড়তে শুরু করেন এবং সেও বাবার পিছন-পিছন দৌড়য়। দৌড়তে গিয়ে পা দিয়ে যে ধূলো ওড়ে বাবা তাতে লুপ্ত হয়ে যান এবং তখনই ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও গভীর ভাবে এই স্বপ্নটির বিষয় চিন্তা করে। ওর মানসিক প্রবৃত্তিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এবার ও বাবার মহানতা বুঝে গিয়েছিল। ওর লোভী ও শঙ্কাগ্রস্ত বৃত্তি সুপ্ত হয়ে যায় এবং বাবার চরণের প্রতি সত্যিকারের ভক্তি উথলে পড়ে। ওটা ছিল তো মাত্র একটা স্বপ্ন, কিন্তু তার প্রশ্নোত্তরগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পরের দিন যখন সবাই মস্‌জিদে আরতির জন্য একত্রিত হয়, তখন বাবা ওদের প্রসাদ রূপে প্রায় দু টাকার মিষ্টি ও নগদ দু টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ওখানে কিছু দিন আরো থাকতে বলে আশীষ দেন- "আল্লাহ তোমায় অনেক দেবেন এবং এবার সব ভালোই করবেন।" সেখানে বাবার কাছ থেকে খুব বেশী অর্থ লাভ হয় না, কিন্তু বাবার কৃপা অবশ্যই প্রাপ্ত হয় যাতে ওঁদের খুবই মঙ্গল হয়। রাস্তায় ওরা যথেষ্ট ধন উপার্জন করে এবং ওদের ঐ যাত্রা সফল হয়। যাত্রায় সেই দলের কোন কষ্ট বা অসুবিধে হয় না এবং ওরা নির্বিঘ্নে

বাড়ী পৌঁছে যায়। বাবার আশীর্বাদে এবং তাঁর কৃপায় যে পরমানন্দ লাভ হয়েছিল, সেটা ওদের চিরকাল মনে থাকে।

তেণ্ডুলকর কুটুম্ব ঃ-

বম্বের কাছে বান্দ্রাতে এক তেন্ডুলকর পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য বাবার পরম ভক্ত ছিল। শ্রী রঘুনাথ রাও তেন্ডুলকর মারাঠী ভাষায় 'শ্রী সাইনাথ ভজনমালা" নামক একটি বই লিখেছেন যাতে প্রায় আটশোটা ছন্দ ও পদের সমাবেশ ও বাবার লীলার মধুর বর্ণনা দেওয়া আছে। এইটি বাবার ভক্তদের পড়ার যোগ্য বই। ওঁর জেষ্ঠ পুত্র বাবু ডাক্তারী পরীক্ষায় বসার অনবরত অভ্যাস করছিল। অনেক জ্যোতিষীদেরও ও নিজের কুষ্ঠী দেখায় এবং সবাই জানায় যে সে বছর ওর গ্রহদশা ভালো না হওয়ার দরুণ পরের বছর পরীক্ষায় বসলে ও নিশ্চয়ই সফল হবে। এই শুনে ও খুব নিরাশ হয়। ছেলেটির মা মনের অশান্তির এই কথাটি বাবাকে বলেন। ছেলের কিছুদিন পরই পরীক্ষায় বসার কথা। বাবা বললেন- "নিজের ছেলেকে বলো আমার উপর বিশ্বাস রাখতে। সব ভবিষ্যবাণী ও জ্যোতিষীদের কুষ্ঠী এক কোণে ফেলে দাও। ও নিজের অভ্যাস-ক্রম চালিয়ে যাক। শান্তচিত্তে পরীক্ষায় বসুক। ও নিশ্চয়ই এই বছর পাশ করবে। ওকে বোল নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।" মা বাড়ী ফিরে বাবার আশ্বাস ছেলেকে জানান। ও দিনরাত পরিশ্রম করে এবং পরীক্ষায় বসে। ও সব বিষয়েই খুব ভালো পরীক্ষা (লিখিত) দেয়। কিন্তু তবুও ওর মনে একটা সংশয় - বোধহয় পাশ করার মতন অতটা ভালো হয়নি। তাই ও স্থির করে যে, মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়ে কোন লাভ হবে না। কিন্তু পরীক্ষক তো নাছোড়বান্দা। উনি এক বিদ্যার্থীকে দিয়ে বাবুকে বলে পাঠান যে, ওর লিখিত পরীক্ষা যথেষ্ট ভালো হয়েছে। এবার ওর মৌখিক পরীক্ষাতেও নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকা উচিত। এই ভাবে উৎসাহ পেয়ে বাবু পরীক্ষায় বসে এবং দুটি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়। সেই বছর ওর গ্রহদশা প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বাবার কৃপায় ও সফল হয়। এখানে শুধু এ কথাই মনে রাখা উচিত যে, **কষ্ট এবং সংশয়ের উৎপত্তি শেষে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। যেমন ভাবেই হোক পরীক্ষা তো হয়ই, কিন্তু আমরা যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপূর্বক চেষ্টা করে যাই তাহলে সফলতা নিশ্চয়ই পাব।** এই ছেলেরই পিতা রঘুনাথ রাও বম্বের এক বিদেশী ফার্মে চাকরী করতেন। উনি বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের কাজ ভালো ভাবে করতে পারতেন না। তাই উনি ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে চাইতেন। ছুটি নেওয়া সত্ত্বেও ওঁর স্বাস্থ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। তাই এবার

অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হতে হলো। একজন বিশ্বাসী কর্মচারী হওয়ার দরুণ প্রধান ম্যানেজার ওঁকে পেন্‌শন দিয়ে সেবানিবৃত্ত করা স্থির করেন। পেন্‌শনে কত দেওয়া উচিত্, সেটাই চিন্তা করা হচ্ছিল। উনি ১৫০ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। সেই হিসেবে ওঁর পেন্‌শন হয় ৭৫ টাকা। কিন্তু সেটা ওঁর পরিবারের নিবার্হের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। নির্ণয় হওয়ার পনেরো দিন আগে বাবা শ্রীমতি তেণ্ডুলকরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন- "আমার ইচ্ছে যে, তোমার স্বামীকে পেন্‌শন ১০০ টাকা দেওয়া হোক্। তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট?"

শ্রীমতি তেন্ডুলকর উত্তর দেন- "বাবা, আপনার এই দাসীকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার শ্রীচরণেই আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস।"

যদিও বাবা ১০০ টাকা বলেছিলেন, কিন্তু সেটিকে বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনা করে ১০ টাকা বেশী অর্থাৎ ১১০ টাকা পেন্‌শন নিশ্চত হয়। বাবার নিজের ভক্তদের প্রতি ছিল অসীম স্নেহ ও ভালবাসা।

ক্যাপ্টেন হাটে ঃ-

ক্যাপ্টেন হাটে বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। থাকতেন বিকানীরে। একবার স্বপ্নে বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি আমায় ভুলে গেছো?" শ্রী হাটে তাঁর শ্রী চরণ ধরে বলেন- "ছেলে নিজের মাকে ভুলে কি বেঁচে থাকতে পারে?" এই বলে শ্রী হাটে তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে কিছু সীম ভেঙ্গে নিয়ে আসেন। একটা থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে তাতে দক্ষিণা রেখে বাবাকে অর্পণ করতে যাবেন এমন সময় ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উনি বুঝতে পারেন যে- 'সেটা শুধু মাত্র একটা স্বপ্ন ছিল।' কিন্তু যে সব বস্তুগুলি উনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেগুলি বাবার কাছে শিরডী পাঠাবেন স্থির করেন। কিছুদিন পর উনি গোয়ালিয়ার যান এবং সেখান থেকে নিজের এক বন্ধুকে বারো টাকা 'মানি অর্ডার' পাঠিয়ে চিঠিতে লিখে পাঠান- "দু টাকার সীধেসামগ্রী এবং সীম ইত্যাদি কিনে ও দশ টাকা দক্ষিণাস্বরূপ রেখে আমার হয়ে বাবাকে নিবেদন কোর।" ওর বন্ধু সবই জোগাড় করে নেন, কিন্তু সীম পেতে খুবই অসুবিধে হয়। এমন সময় উনি এক মহিলাকে মাথায় একটা টুকরী নিয়ে যেতে দেখেন। উনি এই দেখে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যান যে, ঐ টুকরীটিতে শুধু সীমই ছিল। তখন সীম কিনে, একত্রিত জিনিষগুলি নিয়ে মস্‌জিদে গিয়ে শ্রী হাটের পাঠানো নৈবেদ্য বাবাকে অর্পণ করেন। পরের দিন শ্রী নিমোনকর তাই দিয়ে ভাত ও সীমের তরকারী বানিয়ে, বাবাকে খেতে দেন।

সবার খুব আশ্চর্য্য লাগল যে, বাবা সেদিন শুধু সীমই খেলেন এবং অন্য জিনিষ স্পর্শও করলেন না। ওঁর বন্ধুর কাছে এই খবর পেয়ে শ্রী হাটে গদগদ হয়ে ওঠেন এবং অগাধ আনন্দে মন ভরে ওঠে।

পবিত্র টাকা ঃ-

এক সময় ক্যাপ্টেন হাটের মনে হয় যে, একটা টাকা বাবার পবিত্র করকমলে স্পর্শ করিয়ে নিজের বাড়ীতে অবশ্যই রাখা উচিত। শিরডী যাবেন এমন এক বন্ধুর সাথে ওঁর হঠাৎ দেখা হয়। সে বন্ধুটিকে নিজের ইচ্ছেটি জানিয়ে শ্রী হাটে তাঁকে একটা টাকা দেন। শিরডী পৌঁছে বন্ধুটি বাবাকে প্রণাম করার পর দক্ষিণা দেন, বাবা সেটি তক্ষুনি পকেটে রেখে নেন। এরপর উনি ক্যাপ্টেন হাটের টাকাটি অর্পণ করেন। বাবা সেটি হাতে নিয়ে খুব মন দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। টাকাটি নিজের বুড়ো আঙ্গুলের উপর রেখে উপর দিকে নিক্ষেপ করেন। এ রকম দু-চারবার করে টাকাটি বন্ধুটিকে দিয়ে বলেন- "উদীর সাথে এই টাকাটা নিজের বন্ধুকে ফিরিয়ে দিও। আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু চাই না। ওঁকে বোল যে, উনি সুখে থাকুন এই-ই আমি আশীর্বাদ করছি।" বন্ধুটি গোয়ালিয়ার ফিরে সেই টাকাটি শ্রী হাটেকে দিয়ে সেখানে যা-যা ঘটেছিল সে সব ওঁকে জানান। সে সব কথা শুনে শ্রী হাটে খুব খুশী হন। উনি অনুভব করেন যে, বাবা সর্বদা ওঁর সদিচ্ছাগুলিকে উৎসাহিত করে ওঁর সমস্ত মনোকামনা পুরণ করতেন।

৪) শ্রী বামন নার্বেকর ঃ-

পাঠকগণ! এবার একটা অন্য গল্প শ্রবণ করুন। এক মহাশয়ের, নাম বামন নার্বেকর, সাই চরণে প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। একবার উনি একটা এমন মুদ্রা আনেন, যার একদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবং অপরদিকে করবদ্ধ মারুতির চিত্র আঁকা ছিল। উনি এই মুদ্রাটি বাবাকে এই ভেবে অর্পণ করেন যে, তিনি সেটি করস্পর্শ দ্বারা পবিত্র করে "উদী"-র সাথে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু বাবা সেটা তক্ষুনি পকেটে রেখে নেন। শামা বামনরাও-য়ের ইচ্ছেটি জানিয়ে মুদ্রাটি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তখন উনি বামনরাও এর সামনেই বলেন- "এইটি ওঁকে ফেরত না দিয়ে আমাদের কাছেই রাখব। যদি উনি এর বদলে পঁচিশ টাকা দিতে রাজী থাকেন তাহলে আমি এটা ফিরিয়ে দেব।" মুদ্রাটি পাওয়ার জন্য শ্রী বামনরাও পঁচিশ টাকা জোগাড় করে বাবাকে দেন। তখন বাবা বলেন- "এই মুদ্রার মূল্য তো পঁচিশ টাকার থেকে অনেক বেশী। শামা,

তুমি এটি নিজের ভাণ্ডারে জমা করে নিজের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করে এর নিত্য পূজো কোর।” কেউ সাহস করে জিজ্ঞাসা করতে পারে না যে তিনি এমনটি কেন করলেন। এ তো শুধু বাবাই জানেন যে কার জন্য, কখন, কি উপযুক্ত।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৩০

শিরডীতে আনয়ন- ১) বণীর কাকা বৈদ্য ২) খুশালচন্দ ৩) বম্বের রামলাল পাঞ্জাবী।

এই অধ্যায়ে আরো তিনটি ভক্ত কিভাবে শিরডীর টানে সেখানে গিয়ে পৌঁছয়, সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

যিনি বিনা কোন কারণে ভক্তদের স্নেহ করেন, দয়ার সাগর এবং নির্গুন হয়েও ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে যিনি স্বেচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করেছিলেন, যিনি এইরূপ ভক্তবৎসল যে, তাঁর দর্শন মাত্রেই ভবসাগরের ভয় ও সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়, সেই শ্রী সাইনাথ মহারাজকে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। ভক্তদের আত্মদর্শন করানোই সন্তদের প্রধান কাজ। সন্ত শিরোমণি শ্রী সাইয়ের ছিল এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যারা তাঁর শ্রী চরণের শরণে যায়, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে দিন-প্রতিদিন উন্নতি হতে থাকে। তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করে পবিত্র স্থান থেকে ভক্তরা শিরডীতে আসত এবং তাঁর কাছে বসে শাস্ত্র পাঠ করত, গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করত। কিন্তু যারা নির্বল এবং সর্বপ্রকারে দীন-হীন এবং যারা এও জানে না যে ভক্তি কাকে বলে, তাদের শুধু একটাই বিশ্বাস যে, সবাই ওদের অসহায় ছেড়ে উপেক্ষা করতে পারে- কিন্তু অনাথের নাথ এবং প্রভু শ্রীসাই ওদের কখনো পরিত্যাগ করবেন না। যার উপর তিনি কৃপা করেন, সে প্রচণ্ড শক্তি, নিত্যানিত্যে বিবেক ও জ্ঞান সহজেই লাভ করে।

তিনি নিজের ভক্তদের ইচ্ছে জেনে সেটি পূরণ করেন। তাই ভক্তদের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তারা কৃতজ্ঞ বোধ করে। আমরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে প্রার্থনা করছি যে- "হে সাই, আমাদের ভুল-ত্রুটির দিকে মন না দিয়ে আমাদের সমস্ত কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নাও।" যে বিপদগ্রস্ত প্রাণী এই ভাবে শ্রী সাইয়ের কাছে প্রার্থনা করে, তাঁর কৃপায় যে পূর্ণ শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে। শ্রী হেমাডপন্ত বলেন যে- "হে, আমার সাই। তুমি তো দয়ার সাগর। এ তো তোমারই দয়ার ফল যে আজ এই 'সাই সৎচরিত্র' ভক্তদের হাতে পৌঁছতে পেরেছে। নতুবা আমার সেই যোগ্যতা কোথায় যে এমন কঠিন কাজ হাতে নেওয়ার দুঃসাহস করতে পারি? যখন সম্পূর্ণ উত্তরদায়িত্ব তুমি নিজের উপরই নিয়ে নিয়েছ তখন আমার তিলমাত্র ভার অনুভব হচ্ছে না। আমার

আর কোন চিন্তা নেই।" শ্রীসাই এই গ্রন্থের রূপে শ্রী হেমাডপন্তের সেবা স্বীকার করেন। এটি শুধু ওঁর পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কারের জন্যই সম্ভব হতে পেরেছে। তাই উনি নিজেকে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করেন।

নীচে লেখা ঘটনা কপোলকল্পিত নয় বরং বিশুদ্ধ অমৃত। এটি যে হৃদয়ঙ্গম করবে, সে শ্রী সাইয়ের মহানতা ও সর্বব্যাপকতা সহজেই জানতে পারবে। কিন্তু যে যুক্তি-তর্ক বা সমালোচনা করতে ইচ্ছুক তার এই কথাগুলির দিকে কান দেওয়ার দরকার নেই। এখানে তর্ক নয় বরং প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তির প্রয়োজন। বিদ্বান, ভক্তমান, গভীরভাবে বিশ্বাসী যাঁরা বা যাঁরা নিজেদের সাই পদ সেবক মনে করেন, তাদেরই এই কথাগুলি রুচিকর ও শিক্ষাপ্রদ মনে হবে। অন্য লোকেদের জন্য তো এগুলি কেবল কপোল কল্পনা। শ্রী সাইয়ের অন্তরঙ্গ ভক্তদের শ্রীসাই লীলাগুলি কল্পতরুর মতন মনে হবে। শ্রীসাই লীলারূপী অমৃত পান করলে অজ্ঞান জীবেরা মোক্ষ, গৃহস্থরা শান্তি এবং মুমুক্ষুজন সাধনার এক সর্বোচ্চ পথ লাভ করবেন। এবার আমরা এই অধ্যায়ের মূল কথায় আসব।

কাকাজী বৈদ্য ঃ-

নাসিক জেলার বণী গ্রামে কাকাজী বৈদ্য নামক এক ব্যক্তি থাকতেন। উনি সপ্তশ্রৃঙ্গী দেবীর প্রধান পুরোহিত ছিলেন। একবার উনি এমন বিপদে পড়েন হন যে মনের শান্তি হারিয়ে ব্যকুল হয়ে ওঠেন। একদিন উনি দেবীর মন্দিরে গিয়ে অন্তঃকরণ হতে প্রার্থনা করেন যে "হে দেবী, হে দয়াময়ী! আমায় এই কষ্ট থেকে শীঘ্র মুক্ত করো।" ওঁর প্রার্থনায় দেবী প্রসন্ন হন এবং ঐ রাত্রিতেই ওঁকে স্বপ্নে বলেন- "তুই বাবার কাছে যা। ওখানে তোর মন শান্ত ও স্থির হয়ে যাবে।" বাবার পরিচয় জানবার জন্য কাকাজী অতন্ত উৎসুক ছিলেন, কিন্তু দেবীকে প্রশ্ন করার আগেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবার উনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন- ইনি কোন বাবা যার দিকে দেবী ইঙ্গিত করছেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তাঁর এটাই মনে হলো যে সম্ভবতঃ দেবী ত্রয়্যম্বকেশ্বরবাবার (শিব) কথা বলেছেন। তাই উনি পবিত্র তীর্থ ত্রয়্যম্বক (নাসিক) গিয়ে দশ দিন থাকেন। সকাল-সকাল উঠে স্নান ইত্যাদি সেরে রুদ্র মন্ত্রের জপ করতেন। কিন্তু তাতেও মনের অশান্তি দূর হয় না। তখন উনি বাড়ী ফিরে আবার অতি করুণ স্বরে দেবীর স্তুতি করেন। সেই রাত্রিতে দেবী ওঁকে স্বপ্নে পুণঃ দর্শন দিয়ে বলেন- "তুই মিছিমিছি ত্রয়্যম্বকেশ্বর গেলি। বাবা বলতে আমি শিরডীর শ্রীসাই বাবার কথা বলেছিলাম।" এবার কাকাজীর প্রধান চিন্তা হল যে, কি করে এবং কখন শিরডী গিয়ে বাবার শ্রীদর্শন

করা যেতে পারে।

যথার্থে যদি কোন ব্যক্তি কোন সন্তের দর্শন হেতু আতুর হয়ে ওঠে তাহলে শুধুমাত্র সেই সন্তই নয়, ভগবানও তার ইচ্ছে পুরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সন্ত ও অনন্ত একই এবং তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি কেউ মনে করে যে সে নিজে গিয়েই সন্তের সঙ্গে দেখা করবে তাহলে সেটা হবে একটা দম্ভ। সন্তের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর দর্শন কে লাভ করতে পারে? তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়তে পারে না। সন্ত দর্শনের উৎকণ্ঠা যত তীব্র হয় সেই অনুপাতেই ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়ে এবং ততই তাড়াতাড়ি মনোস্কাম পূর্ণ হয়। যে নিমন্ত্রণ দেয়, অতিথি সৎকারের ব্যবস্থাও সে-ই করে। কাকাজীর ক্ষেত্রে ঠিক এমনটি হয়।

শামার বিশ্বাস ঃ-

যে সময় কাকাজী শিরডী যাত্রার কথা মনে-মনে স্থির করেছিলেন, সেই সময়ই ওঁর বাড়ীতে এক অতিথি (শামা) এসে পৌঁছন। উনি ঠিক এই সময়ে বণীতে কেন এবং কি করে এসে পৌঁছন এবার আমরা সেই দিকে দৃষ্টি দিই। ছোটবেলায় উনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওঁর মা নিজের কুলদেবী সপ্তশ্রুঙ্গীর কাছে প্রার্থনা করেন- "যদি আমার ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠে, তাহলে আমি তাকে তোমার চরণে নিয়ে আসব।" কিছু বছর পর শামার মায়ের বুকে দাদ হয়। তখন উনি আবার দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন- "যদি আমি রোগমুক্ত হয়ে যাই তাহলে আমি তোমায় দুটো রূপোর স্তন অর্পণ করব।" কিন্তু এই দুটি মান্‌সিকই অপূর্ণ রয়ে যায়। মৃত্যুর আগে শামাকে নিজের কাছে ডেকে ওঁর মা ঐ দুটি মান্‌সিক মনে করিয়ে সেগুলি পূর্ণ করার আশ্বাস পেয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কিছুদিন পর শামা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলে যান এবং এই ভাবে ৩০ বছর কেটে যায়। এক সময় এক বিখ্যাত জ্যোতিষী শিরডী এসে সেখানে প্রায় মাস খানেক ছিলেন। শ্রীমান বুটী সাহেব এবং অন্য লোকেদের যা-যা ভবিষ্যবাণী করেছিলেন সেগুলি প্রায়-প্রায় ঠিক প্রমাণিত হয় । তাই সবাই খুব সন্তুষ্ট হয়। শামার ছোট ভাই বাপাজীও ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তখন উনি জানান- "তোমার বড় ভাই নিজের মাকে মৃত্যুশয্যায় যা কথা দিয়েছিলেন, সেগুলি এখনো পুরণ না হওয়ায় দেবী অসন্তুষ্ট হয়ে ওঁকে কষ্ট দিচ্ছেন।" জ্যোতিষীর কথা শুনে শামার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। দেরী করা বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে উনি তাড়াতাড়ি দুটি রূপোর স্তন তৈরী করিয়ে সেগুলি মস্‌জিদে নিয়ে গিয়ে

বাবার সামনে রাখেন। বাবাকে প্রণাম করে সেগুলি গ্রহণ করে তাঁকে বচনমুক্ত করতে প্রার্থণা করেন। শামা বলেন- "আমার জন্য ত মা সপ্তশৃঙ্গী আপনিই।" কিন্তু বাবা তাতে বলেন- "তুমি স্বয়ং এগুলি নিয়ে গিয়ে দেবীর চরণে অর্পণ করো।" বাবার অনুমতি ও উদী নিয়ে উনি বণীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। পুরোহিতের-খোঁজ করতে-করতে উনি কাকাজীর বাড়ী এসে পৌঁছন। কাকাজী এই সময় বাবার দর্শন করার জন্য খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন এবং ঠিক এমুনি সময় শামা সেখানে এসে পৌঁছন। এ কি চমৎকার যোগাযোগ? আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে এবং তিনি যে শিরডী থেকে এসেছেন শুনে কাকাজী শামাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর দুজনের মধ্যে 'সাই লীলা' সম্বন্ধে গল্প শুরু হল। শামা নিজের প্রতিজ্ঞা-কৃত্য পুরণ করে কাকাজীর সাথে শিরডী ফিরে যান। কাকাজী মস্‌জিদে পৌঁছে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়েন। ওঁর দু-চোখ থেকে প্রেমাশ্রুর ধারা বইতে থাকে এবং মন স্থির হয়ে যায়। দেবীর দৃষ্টান্ত অনুসারে বাবার দর্শন করা মাত্রে কাকাজীর মনের অশান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং উনি পরম শান্তি অনুভব করেন। উনি আশ্চর্যান্বিত বোধ করছিলেন- এ কি অদ্ভুত শক্তি যে, কোন সম্ভাষণ বা প্রশ্নোত্তর না করেই বা কোনরকম আশীষ না পেয়েই, শুধুমাত্র দর্শনেই অপার প্রসন্নতা বোধ হচ্ছে! সত্যি দর্শনের মাহাত্ম্য তো একেই বলে। ওঁর তৃষিত দৃষ্টি সাই চরণেই নিবদ্ধ হয়ে যায় এবং উনি মুখ থেকে একটা কথাও বলতে পারেন না। বাবার অন্যান্য লীলা শুনে ওঁর খুবই আনন্দ হয়। উনি চিন্তা-ভাবনা ভুলে বাবার পদতলে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিলেন। শিরডীতে বারো দিন সুখে কাটিয়ে বাবার অনুমতি, আশীর্বাদ ও উদী প্রাপ্ত করে উনি নিজের বাড়ী ফিরে আসেন।

খুশালচন্দ (রাহাতা নিবাসী) ঃ-

প্রায় দেখা গেছে যে, ভোরবেলায় যে স্বপ্ন দেখা হয় সেটা জাগ্রত অবস্থায় সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাবার ক্ষেত্রে সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তারই এক উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। বাবা একদিন তৃতীয় প্রহরে কাকাসাহেবকে টাঙ্গায় রাহাতা গিয়ে খুশালচন্দকে নিয়ে আসতে বলেন। খুশালচন্দের সাথে ওঁর অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। রাহাতা পৌঁছে কাকাসাহেব কুশালচন্দ্রকে এই খবরটি দেন। কথাটি শুনে খুশালচন্দ অবাক হয়ে বলেন- "দুপুরে খাবার পর আমি কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। সেই সময় বাবা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তক্ষুনি শিরডী আসতে বলেন। কিন্তু ঘোড়ার কোনরকম ব্যবস্থা না থাকার দরুণ আমি নিজের ছেলেকে তাঁর কাছে পাঠাই, এই খবরটা দিতে। ও যখন গ্রামের সীমানায় পৌঁছয়, তখনই সামনে দিয়ে টাঙ্গায় আপনাকে

আসতে দেখে।" এরপর ওঁরা দুজন ঐ টাঙ্গাতেই শিরডী রওনা হন। বাবার সাথে দেখা করে উনি খুব খুশী হন এবং বাবার এই লীলা দেখে খুশালচন্দ মুগ্ধ হয়ে যান।

বম্বের রামলাল পঞ্জাবী ঃ-

বম্বের এক পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ শ্রী রামলালকে বাবা স্বপ্নে এক মোহান্তর (সাধু) বেশে দর্শন দিয়ে শিরডী আসতে বলেন। কিন্তু রামলাল এই মোহান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। শ্রীদর্শনের তীব্র উৎকন্ঠা তো ছিল, কিন্তু ঠিকানা না জানার দরুণ উনি বড়ই মুস্কিলে পড়ে যান। যে নিমন্ত্রণ দেয় সে আসবার ব্যবস্থাও করে রাখে এবং শেষে হলোও তাই। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় বেড়াবার সময় একটা দোকানে রামলাল বাবার একটি ছবি দেখতে পান। স্বপ্নে যে সাধুর দর্শন হয়েছিল, তাঁর আর এই ছবিটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারেন যে এই ছবিটি শিরডীর শ্রী সাইবাবার। উনি শীঘ্রই শিরডী অভিমুখে রওনা হয়ে যান এবং আমৃত্যু সেখানেই থাকেন।

এই ভাবে বাবা নিজের ভক্তদের দর্শনের জন্য শিরডী ডাকতেন এবং তাদের লৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত ইচ্ছে পুরণ করতেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩১

মুক্তি দান

১) সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ ২) বালারাম মানকর ৩) নুলকর ৪) মেঘা ৫) একটি বাঘ।

বাবার সামনে কয়েকটি ভক্তের মৃত্যু ও বাঘের প্রাণত্যাগের কথা হেমাডপন্ত এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

মৃত্যুর সময় মনে যা শেষ ইচ্ছে বা ভাবনা জাগে, সেটিই ভবিতব্যতা নির্মাণ করে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (অধ্যায় ৮) বলেছেন "নিজের জীবনের শেষ সময় আমায় যে স্মরণ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত করে এবং সেই সময় সে যা দৃশ্য দেখে, সেটাই সে লাভ করে।" এটি কেউই হলফ্ করে বলতে পারে না যে সেই সময় আমাদের মনে উত্তম বিচারই জাগবে। বরং এমন মনে হয় যে মৃত্যু আসন্ন দেখে নানা কারণে ভয়ভীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তাই মনকে কোন উত্তম বিচারের চিন্তনে লাগিয়ে রাখার নিত্যাভ্যাস অত্যন্ত আবশ্যক। সব সাধু-সন্তরা হরি নাম ও তার জপকেই শ্রেষ্ঠ বলেন- যাতে মৃত্যুর সময় আমরা কোন পরিবারিক সমস্যায় না জড়িয়ে পড়ি। ভক্তরাও সম্পূর্ণ ভাবে সন্তদের শরণাপন্ন হয় যাতে তাঁরা উচিত পথপ্রদর্শন করে তাদের সাহায্য করেন। এই কথারই কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে -

১) বিজয়ানন্দ ঃ-

এক মাদ্রাজী সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ মানসরোবরের যাত্রায় বেরোন। পথে বাবার কীর্তির কথা শুনে উনি শিরডী আসেন এবং সেখানে হরিদ্বারের সোমদেবজী স্বামীর সাথে ওঁর দেখা হয়। স্বামীজীকে মানসরোবরের যাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় স্বামীজী জানান যে, মানসরোবর গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় ৫০০ মাইল উত্তরের দিকে পড়ে। রাস্তায় যে-যে অসুবিধে ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাও উল্লেখ করেন। বরফে ঢাকা রাস্তা, ৫০ ক্রোশ অবধি ভাষার ভিন্নতা এবং ভুটান বাসীদের সন্দিগ্ধ স্বভাব ইত্যাদি নানা অসুবিধা হয়রানি করে থাকে। একথা শুনে সন্ন্যাসীর মন উদাস হয়ে

যায় এবং উনি যাত্রার বিচার ছেড়ে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার শ্রীচরণ স্পর্শ করেন। বাবা রেগে ওঠে বলেন- "এই অপদার্থ সন্ন্যাসীকে এখান থেকে বার করে দাও। এর সঙ্গ করাও বৃথা।" সন্ন্যাসী বাবার স্বভাবের বিষয়ে একবারেই অপরিচিত ছিলেন। উনি বড়ই হতাশ হয়ে পড়েন- এক কোণে চুপচাপ বসে শুধু মস্‌জিদে লোকেদরে গতিবিধি দেখছিলেন। সকালবেলা দরবারে ভক্তদের বেজায় ভীড়। বাবার যথাবিধি অভিষেক করা হচ্ছিল। কেউ তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ তাঁর চরণামৃত পান করছে বা চোখে লাগাচ্ছে। কেউ-কেউ তাঁকে চন্দন ও আতরও লাগাচ্ছিল। জাত-পাতের পার্থক্য ভুলে সবাই বাবার সেবায় মগ্ন ছিল। যদিও বাবা সন্ন্যাসীর উপর রেগে গিয়েছিলেন, তবুও সন্ন্যাসীর মন বাবার প্রতি গভীর প্রীতিতে ভরে ওঠে। ওঁর সেই স্থান ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এর দুদিন পরই মাদ্রাজ থেকে চিঠি আসে যে, ওঁর মায়ের অবস্থা চিন্তাজনক। এই খবর পেয়ে সন্ন্যাসী খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং মায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রগাঢ় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাবার অনুমতি না নিয়ে উনি শিরডী থেকে যেতেই বা কি করে পারতেন? তাই হাতে চিঠিটা নিয়ে উনি বাবার কাছে যান এবং বাড়ী ফেরার অনুমতি চান। ত্রিকালদর্শী বাবা তো সবার ভবিষ্যত জানতেন। তিনি বলেন- "মায়ের প্রতি এত মোহ আছে তো সন্ন্যাস ধারণ করার কি দরকার ছিল? মমতা বা মোহ গেরুয়া বস্ত্রধারীদের কি শোভা দেয়? যাও, চুপচাপ নিজের জায়গায় গিয়ে কিছুদিন শান্তিতে কাটাও। কিন্তু সাবধান! 'ওয়াড়ায়' অনেক চোর আছে। তাই দরজা বন্ধ করে সাবধানে থেকো, নাহলে চোর সব চুরি করে নিয়ে যাবে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত পদার্থের মোহ ত্যাগ করে নিজের কর্তব্য করো। যে এই ধরনের আচরণ করে শ্রীহরির শরণে যায়, সে সব কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। **যে পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তন প্রেম ও ভক্তি সহকারে করে, পরমাত্মা তার সাহায্য অবশ্যই করেন।** পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারের ফলস্বরূপই তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ এবং আমি যা-যা বলছি, সেটা মন দিয়ে শোন। নিজের জীবনের মুখ্য লক্ষ্যের বিষয়ে চিন্তা করো। ইচ্ছারহিত হয়ে কাল থেকে তিন সপ্তাহ অবধি ভাগবৎ পাঠ করো। তখন ভগবান প্রসন্ন হবেন এবং তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবেন। মায়ার আবরণ দূর হলে তুমি শান্তি পাবে।" ওঁর শেষ সময় আসন্ন জেনে বাবা ওকে এই উপায়টি বলেন। এরই সাথে 'রামবিজয়' পড়বারও আদেশ দেন, যাতে যমরাজ বেশী খুশী হন। পরের দিন স্নানাদি ও অন্যান্য শুদ্ধি কৃত্য সেরে সন্ন্যাসী 'লেণ্ডীবাগে' একান্তে বসে ভাগবৎ পাঠ শুরু করেন। দ্বিতীয় বার পাঠ শেষ হওয়ার পর উনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং 'ওয়াড়া'য় এসে দু দিন বিশ্রাম করেন। তৃতীয় দিন বাবার

কোলে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দর্শনের জন্য বাবা ওঁর শরীর একদিন ওখানে রাখেন। তারপর পুলিশ এসে যথোচিত তদন্ত করার পর মৃতদেহ সরাবার অনুমতি দেয়। যথোপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে সমাধি দেওয়া হল। বাবা এই ভাবে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করে তাঁকে সদ্‌গতি প্রদান করেন।

২) বালারাম মানকর ঃ-

বালারাম মানকর নামক এক গৃহস্থ বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। ওঁর স্ত্রীর স্বর্গবাস হওয়ায় উনি বড় নিরাশ হয়ে ঘর-সংসারের দায়িত্ব ছেলেকে দিয়ে নিজে শিরডীতে এসে বাবার কাছে থাকতে শুরু করেন। ওঁর ভক্তি দেখে বাবা ওঁর জীবনের গতি পরিবর্তন করতে চাইতেন। তাই উনি বালারামের হাতে বারোটা টাকা দিয়ে মছিন্দ্রগড়ে (জেলা সাতারা) গিয়ে থাকতে বলেন। বাবার সান্নিধ্য ছেড়ে অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকার ইচ্ছে মানকরের ছিল না। কিন্তু বাবা ওঁকে বুঝিয়ে বলেন- "তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এই সর্বোত্তম উপায় তোমায় বলছি। ওখানে গিয়ে দিনে তিনবার প্রভুর ধ্যান কোর।" বাবার কথায় বিশ্বাস রেখে উনি মচ্ছিন্দ্রগড়ে যান। সেখানকার মনোহর দৃশ্যে, শীতল জলে এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ওঁর মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বাবা যে বিধি বলে দিয়েছিলেন, সেই অনুসারেই উনি প্রভুর ধ্যান করা শুরু করেন এবং কিছুদিন পরই দর্শন পান। বেশীর ভাগ সময় ভক্তরা সমাধি অবস্থায় দর্শন পায়। মানকর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উনি দর্শন পান। দর্শন হওয়ার পর মানকর বাবাকে ওঁকে সেখানে পাঠাবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। তাতে বাবা বলেন- "শিরডীতে তোমার মনে নানারকম বিচারধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই আমি তোমায় এখানে পাঠাই, যাতে তোমার চঞ্চল মন শান্ত হতে পারে। তোমার ধারণা ছিল যে, আমি শুধু শিরডীতেই বিদ্যমান এবং সাড়ে তিন হাতের এক পাঁচ তত্ত্বের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নই। এবার আমার দর্শন করে এই যাচাই করে নাও যে যাকে তুমি শিরডীতে বিরাজমান দেখেছিলে এবং যার দর্শন তুমি এখানে করলে, তারা দুজনে অভিন্ন কি না।" মানকর সেখান থেকে বান্দ্রায় নিজের বাড়ী ফিরে যান। উনি পুণে থেকে দাদার, ট্রেনে যেতে চাইতেন। টিকিট কিনতে গিয়ে সেখানে খুব বেশী ভীড়ে দেখে পিছিয়ে যান। এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক, যার কাঁধে একটা কম্বল এবং শরীরে একটা ল্যাঙোট ছাড়া কিছুই ছিল না, মানকরকে এসে জিজ্ঞাসা করে- "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" মানকর জবাব দেন- "দাদার।" তখন লোকটি বলে- "আমার এই দাদারের টিকিটটা আপনি রাখুন, এখানে একটা দরকারী কাজ এসে পড়ায় আমি আজ যেতে পারছি না।" টিকিট পেয়ে মানকর

তো অতিশয় খুশী। পকেট থেকে টাকা বার করতে-করতেই সেই ব্যক্তিটি ভীড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মানকর অনেক খোঁজা-খুঁজি করেন কিন্তু তার কোন ফল হয় না। গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত মানকর সেই লোকটির জন্য প্রতীক্ষা করেন, কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। এই ভাবে মানকর বিচিত্র রূপে বাবার দ্বিতীয় বার দর্শন পান। কিছু দিন নিজের বাড়ীতে থেকে মানকর আবার শিরডী ফিরে আসেন এবং বাবার শ্রীচরণেই দিন কাটাতে শুরু করেন। এখন তিনি সর্বদা বাবার আদেশ পালন করতেন। শেষে এই ভাগ্যবান ব্যক্তি বাবার সামনে তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে প্রাণত্যাগ করেন।

৩) তাত্য়া সাহেব নুলকর ঃ-

হেমাডপন্ত তাত্য়া সাহেব নুলকরের বিষয়ে কোন বিবরণ লেখেননি। শুধু এতটাই লিখেছিলেন যে উনি শিরডীতে দেহত্যাগ করেন। ১৯০৯ সালে যে সময় তাত্য়া সাহেব পন্ঢরপুরে উপ-ন্যায়াধীশ ছিলেন, সেই সময়ই নানাসাহেব চাঁদোরকরও ওখানকার মাম্‌লৎদার ছিলেন। এঁরা দুজনে প্রায় দেখা-সাক্ষাত ও গল্প-গুজব করতেন। তাত্য়া সাহেবের সাধু সন্তে সে রকম বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু নানাসাহেব ওঁকে সাইবাবার লীলা শোনাতেন এবং একবার শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করার জন্য অনুরোধ করেন। উনি দুটি শর্তে শিরডী যেতে রাজী হন - ১) একজন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি পাওয়া চাই ২) উপহার দেওয়ার জন্য নাগপুরের ভালো কমলালেবু পাওয়া চাই। খুব শীঘ্র ওঁর এই দুটি শর্তই পুরণ হয়ে পড়ে। নানাসাহেবের কাছে একটি ব্রাহ্মণ চাকরীর খোঁজে আসে, যাকে উনি তাত্য়া সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। একটা কমলালেবু পার্শেলও এসে পৌঁছয়। কিন্তু তার উপর প্রেরণকারীর নাম বা ঠিকানা লেখা ছিল না। শর্ত পূরণ হয়ার পর ওঁকে শিরডী যেতেই হয়। প্রথমে বাবা ওঁর উপর রেগে ওঠেন। ধীরে-ধীরে যখন তাত্য়াসাহেবের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, বাবা সত্যি সত্যি ঈশ্বরবতার তখন উনি বাবার শরণাপন্ন হন। তারপর শেষ জীবন অবধি সেখানেই তাকেন। ওঁর শেষ সময় নিকটস্থ জেনে ওঁকে পবিত্র ধার্মিক পাঠ শোনানো হয়েছিল। শেষ সময়ে বাবার চরণামৃত দেওয়া হয়েছিল। ওঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে বাবা বলে ওঠেন- "আরে! তাত্য়া তো আগেই চলে গেল। ওর আর পুণর্জন্ম হবে না।

৪) মেঘা ঃ-

অধ্যায় ২৮-তে মেঘার কথা বলা হয়েছে। মেঘার মৃতদেহের সাথে সব গ্রামবাসীরা

শ্মশান পর্যন্ত যায়। বাবাও তাদের মধ্যে সম্মিলিত হন এবং মৃত শরীরের উপর ফুল ছড়ান। দাহ-সংস্কারের পর বাবার চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে দেখা যায়। একজন সাধারণ মানুষের মত তাঁর হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়। শরীরটি ফুল দিয়ে ঢেকে এক নিকট আত্মীয়ের ন্যায় কাঁদতে-কাঁদতে বাবা মস্‌জিদে ফিরে আসেন। সদ্‌গতি প্রদান করতে অনেক সন্তদেরই দেখেছি, কিন্তু বাবার মহানতা অদ্বিতীয়। এমন কি বাঘের মত হিংস্র পশুও নিজের রক্ষার জন্য বাবার শরণে আসে। নিম্নে তারই বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে -

৫) বাঘের মুক্তি ঃ-

বাবা সমাধিস্থ হওয়ার সাতদিন আগে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। মস্‌জিদের সামনে একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একটা বাঘ বাঁধা ছিল। ওর ভয়ানক মুখটা গাড়ীর পিছনের দিকে ছিল। বাঘটা কোন একটা অজ্ঞাত কষ্টে ভুগছিল। বাঘের মালিক তিনজন দরবেশী এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে ওর প্রদর্শন করত এবং এই ভাবে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করত। তাদের ঐ ছিল জীবিকা। ওরা বাঘটির চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ হয়। শেষে কোন এক জায়গায় ওরা বাবার কীর্তির কথা শুনে বাঘটিকে নিয়ে বাবার দরবারে আসে। হাতে শিকল ধরে ওরা বাঘটিকে মস্‌জিদের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়। বাঘটি ছিল রোগাক্রান্ত, ক্রুদ্ধ ও অস্থির। সবাই ভয় ও আশ্চর্য্যের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ওরা তিনজন ভেতরে গিয়ে বাবাকে সব কথা জানিয়ে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে বাঘটিকে বাবার সামনে নিয়ে যায়। সিঁড়ির কাছে পৌঁছেই বাবার তেজপুঞ্জস্বরূপ দর্শন করে বাঘটি পেছনে সরে গিয়ে মাথা নীচু করে নেয়। পরে দুজনের চোখাচুখি হতেই বাঘটি সিঁড়ির উপর চড়ে গিয়ে বাবাকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে। লেজ নাড়িয়ে তিনবার মাটিতে ঝাপটায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে। ওকে মৃত দেখে তিনজন দরবেশী অতিশয় নিরাশ ও দুঃখী হয়। কিছুক্ষণ পর ওদের বোধ হয় যে, প্রাণীটা রোগগ্রস্ত তো ছিলই এবং ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। যাক্, ওর জন্য ভালই হলো যে, বাবার মত সন্তের চরণে সদ্‌গতি পেলো। বাঘটি ওদের কাছে ঋণী ছিল এবং ঋণ শোধ হতেই ও মুক্ত হয়ে সাই চরণে সদ্‌গতি প্রাপ্ত করে। **যদি কোন প্রাণী কোন সন্তের চরণে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ করে, তাহলে তার মুক্তি লাভ হয়।** পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কারের অভাবে এরকম সুন্দর পরিসমাপ্তি কি করে সম্ভব হতে পারে?

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩২

গুরু ও ঈশ্বরের খোঁজ, উপবাস অমান্য, বাবার 'সরকার'।

এই অধ্যায়ে হেমাডপন্ত দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- ১) বাবার নিজের গুরুর সাথে কিভাবে দেখা হয় এবং তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন কিভাবে লাভ হয়? ২) শ্রীমতি গোখলেকে, যিনি তিনদিন ধরে উপবাস করছিলেন, 'পুরণপোলী' খাওয়ান।

প্রস্তাবনা ঃ-

শ্রী হেমাডপন্ত অশ্বথ গাছের উপমা দিয়ে এই গোচর সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তার জড় উপরের দিকে ও শাখাগুলি নীচের দিকে ছড়িয়ে আছে। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" (গীতা ১৫ অধ্যায়, শ্লোক ১)। সেই রকমই সংসারের মূল থাকে উপরে অর্থাৎ মায়াশক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মে। শাখা-প্রশাখা রূপী কর্মকাণ্ড মানুষের জন্য নিচের দিকে বিস্তৃত হয়। ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের) দ্বারা সেই কর্মকাণ্ড পুষ্টি লাভ করে ও তার মূলগুলি ইন্দ্রিয়ের কাম্য পদার্থ। কর্মরূপী জড়গুলি সৃষ্টির মানবের দিকে ছড়িয়ে আছে। এই গাছটিকে বড় বিচিত্র রূপে রচনা করা হয়েছে। এর আকার, উদগম ও শেষের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অরি নাই বোঝা যায় এর আধার। এই কঠোর জড়ের সংসাররূপী বৃক্ষকে নষ্ট করার জন্য কোন বাহ্য মার্গ অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যক, যাতে এই অসাড় সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক (গুরু) পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। **অনেকে অতীব বিদ্বান অথবা বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষন না তাকে সাহায্য করার জন্য কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক এসে দাঁড়ায়। তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করলে পথের গহ্বর এবং হিংস্র প্রাণীদের ভয় থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে** পারে। এই ভাবে সংসার যাত্রা সুগম ও সফল হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে বাবার অভিজ্ঞতা যা তিনি স্বয়ং বলেছেন- সত্যিই আশ্চর্য্য জনক। যদি আমরা মন দিয়ে সেগুলি শুনি তাহলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মুক্তি নিশ্চয়ই লাভ করব।

অন্বেষণ ঃ-

এক সময় আমরা চারজন সহপাঠী এক সাথে ধার্মিক এবং অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করছিলাম। এইরূপ প্রবুদ্ধ হয়ে আমরা ব্রহ্মের মূল স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করি। একজন বলল যে- "আমাদের স্বয়ং নিজেদের জাগ্রত করা উচিত, অন্যদের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।" এই কথার উপর দ্বিতীয়জন বলল- "যে মন নিগ্রহ করে নিয়েছে, সেই ধন্য। নিজেদের সংকীর্ণ বিচার ও ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে কারণ এই সংসারে আমাদের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই।" এবার তৃতীয়জন বলে- "এই সংসার পরিবর্তনশীল। কেবল নিরাকারই শাশ্বত। অতএব সত্য ও অসত্যের বিবেক থাকা দরকার।" তখন চতুর্থ জন (স্বয়ং বাবা) বলেন- "**কেবল পুঁথিগত বিদ্যা বা জ্ঞান দিয়ে কোন লাভ হয় না। আমাদের নিজেদের কর্তব্য অবশ্যই করা উচিত।** দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে শরীর, মন, সম্পত্তি এবং পঞ্চপ্রাণাদি সর্বব্যাপক গুরুদেবকে অর্পণ করে দেওয়া উচিত। গুরু ভগবান, সবার সংরক্ষক।" এই ভাবে তর্কাতর্কির পর আমরা চারজন বনে ঈশ্বরের খোঁজে বেরোই। আমরা চারজন বিদ্বান, কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র বুদ্ধির জোরে ঈশ্বরের খোঁজ করতে চাইতাম। পথে একটি নিম্ন জাতির লোকের ('বঞ্জারা') সাথে আমাদের দেখা হয়। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে- "আপনারা এত গরমে কোথায় চলেছেন?" প্রত্যুত্তরে আমরা জানাই- "জঙ্গলে খুঁজে দেখছি।" তখন সে জিজ্ঞাসা করে- "কি খুঁজছেন, দয়া করে সেটাই বলুন।" আমরা ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই। আমাদের এই ভাবে নিরুদ্দেশ্যে ঘন জঙ্গলে পথভ্রান্ত দেখে ওর আমাদের উপর দয়া হয়। অতি বিনম্র হয়ে আমাদের নিবেদন করে বলে- "আপনারা নিজেদের গোপনীয় খোঁজের কথা আমায় না জানালেও আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যে, মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তাপে আপনারা অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। দয়া করে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে একটু জলপান গ্রহন করুন। আপনাদের ধীর ও নম্র হওয়া উচিত। পথপ্রদর্শক ছাড়া এই অপরিচিত ভয়ানক বনে বৃথা ঘুরে বেরিয়ে কোন লাভ হবে কি?" ওর বিনম্র প্রার্থনা কোনরূপ গ্রাহ্য না করে আমরা এগিয়ে যাই। আমদের এই ধারণাই ছিল যে, লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে আমরা স্বয়ং সক্ষম। তাহলে অন্য কারো সাহায্যের কি দরকার? জঙ্গলটি খুবই বিশাল ও ঘন ছিল। বৃক্ষগুলি এত উঁচু ও ঘন যে, সেখানে সূর্য্যের আলোও পৌছছিলনা। শেষে পরিণাম এই হলো যে, আমরা পথ ভুলে অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ভাগ্যবশে আবার ঐ স্থানেই গিয়ে পৌছই, যেখান থেকে একটু আগে প্রস্থান করেছিলাম। তখন আবার সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা হয়। সে বলে- "নিজেদের চাতুর্যের উপর নির্ভর করে

আপনারা পথভ্রান্ত হলেন। প্রত্যেক ছোট-বড় কাজে পথপ্রদর্শকের দরকার হয়। ঈশ্বরের প্রেরণার অভাবে সৎপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। **খালি পেটে কোন কাজের ফল পাওয়া যায় না। তাই যদি কেউ আগ্রহ করে ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করে, তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অন্ন ভগবানের প্রসাদ, সেটি অগ্রাহ্য বা মানা করা উচিত নয়। যদি কেউ খেতে অনুরোধ করে তাহলে সেটা নিজের সফলতার প্রতীক জানবেন।**" এই বলে ও আবার অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। তবুও আমরা ওর অনুরোধ উপেক্ষা করে ওকে মানা করে দিই। ওর সরল ও গূঢ় উপদেশ পরীক্ষা না করেই আমার তিনটি সহপাঠী সেখান থেকে চলে যায়। পাঠকগণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন কতখানি জেদী ও একগুঁয়ে ছিল তারা। আমি ক্ষিধে এবং তেষ্ঠায় বিচলিত ছিলামই, উপরন্তু ঐ ব্যক্তিটির অপূর্ব প্রেম আমায় আকর্ষিত করে। যদিও আমরা নিজেদের অত্যন্ত বিদ্বান বলে মনে করতাম, কিন্তু দয়া ও কৃপা কাকে বলে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না। এক শুদ্র, অশিক্ষিত, গ্রাম্যলোক হওয়া সত্ত্বেও ওর মনে মহান দয়া ছিল। তাই সে আমাদের বার-বার অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছিল। **যারা নিঃস্বার্থে অন্যদের ভালবাসে, তারাই সত্যকার মহান।** আমি ভাবলাম লোকটির অনুরোধ স্বীকার করাটাই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শুভ আবাহন। তাই ওর দেওয়া শুকনো রুটি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহন করলাম।

ক্ষুধা নিবারণ হতেই দেখি যে, গুরুদেব আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন- "এই সব কি হচ্ছিল?" আমি তখন সব ঘটনাগুলি তাঁকে বললাম। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন- "**আমি তোমার হৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছে পুরণ করে দেব। কিন্তু যে আমার উপর বিশ্বাস রাখবে, শুধু সে-ই সফল হবে।**" আমার তিনটি সহপাঠী তাঁর কথা বিশ্বাস না করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। আমি তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আদেশ পালন করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। এরপর তিনি আমায় একটা কূয়োর কাছে নিয়ে গেলেন। দড়ি দিয়ে পা বেঁধে আমায় কূয়োতে উল্টো টাঙ্গিয়ে দিলেন। আমার মাথা নীচে ও পা উপরে ছিল। মাথাটা ছিল জল থেকে প্রায় তিন ফুট উপরে। হাত দিয়ে জল ছোঁবার বা মুখে জল যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমায় এই ভাবে উল্টো টাঙ্গিয়ে জানি না তিনি কোথায় চলে গেলেন। প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা পর ফিরে এলেন এবং আমায় কূয়ো থেকে বাইরে বার করে আনলেন। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার ওখানে কিরকম মনে হচ্ছিল?" আমি উত্তর দিই- "পরম আনন্দ অনুভব করছিলাম। আমার মতন মূর্খ এই রকম আনন্দ কি ভাবেই বা ব্যক্ত করতে পারে?" আমার উত্তর শুনে গুরুদের অত্যন্ত প্রসন্ন হন

এবং তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমার প্রশংসা করে আমায় নিজের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে নিয়ে যান। একটি চড়াইপাখি নিজের ছানাদের যেভাবে দেখা-শোনা করে, ঠিক সেই ভাবে তিনি আমারও আদর-যত্ন করতেন। কত সুন্দর ছিল সেই আশ্রম। সেখানে আমি নিজের মা-বাবার কথা ভুলে যাই। অন্যান্য আকর্ষণও দূর হয়ে গিয়েছিল এবং আমি সহজেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাই। আমার সব সময় মনে হত যে, তাঁর বুকের মাঝেই লুকিয়ে থাকি। যদি কখনও চোখের সামনে তাঁর মূর্তিটি না ভাসত - তবে মনে হতো অন্ধ হয়ে যাওয়াই ভালো। এইরকম ছিল সেই আশ্রম। সেখানে পৌঁছে কেউ খালি হাতে ফেরেনি। তিনি আমার ঘর-বাড়ী, মাতা-পিতা, ধন-সম্পত্তি-সর্বস্ব ছিলেন। আমার ইন্দ্রিয়গুলি নিজেদের কর্ম ছেড়ে আমার চোখে কেন্দ্রিভূত হয়ে যায় এবং আমার চোখ তাঁর উপর। আমার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, দিন-রাত আমি তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকতাম। আমার আর কোন কথারই জ্ঞান ছিল না। **এই ভাবে ধ্যান ও চিন্তন করতে-করতে আমার মন ও বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়।** আমি স্তব্ধ হয়ে মনে-মনেই তাঁকে প্রণাম করতাম। অন্য অনেক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র আছে, যেখানে এক ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। সাধক সেখানে জ্ঞানপ্রাপ্ত করতে যায় এবং দ্রব্য ও সময়ের অপব্যয় করে। কঠিন পরিশ্রমও করে কিন্তু শেষে অনুতাপ হয়। সেখানে গুরুর গুপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের অভিমান দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা পবিত্র ও শুদ্ধ হওয়ার অভিনয় ত করেন, কিন্তু তাঁদের মনে দয়া লেশমাত্রও দেখা যায় না। তাঁরা উপদেশ দেন বেশী ও নিজেদের কীর্তির স্বয়ংই গুণগান করেন। কিন্তু তাঁদের শব্দ হৃদয় ভেদী হয় না। তাই সাধকও তৃপ্তি পায় না। এমনি অবস্থায় আত্মদর্শন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের কেন্দ্র সাধকদের জন্য কতটা হিতকর বা সেখানে কোন উন্নতি কি করে আশা করা যেতে পারে? যে গুরুর শ্রী চরণের বর্ণনা একটু আগে করলাম, তিনি ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর। কেবল তাঁর কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে আপনা-আপনি অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে গেল এবং আমায় কোন চেষ্টা বা বিশেষ অধ্যয়ন করার দরকার হল না। আমায় কোন বস্তু খোঁজারও দরকার হল না বরং প্রত্যেকটি বস্তু দিনের আলোর ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কেবল গুরুই জানেন যে কি ভাবে কূয়োতে আমাকে উল্টো করে টাঙ্গানো আমার জন্য পরামানন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার ঐ তিনটি সহপাঠীদের মধ্যে একজন মহান কর্মকাণ্ডী ছিল। কর্ম করে কি ভাবে তার থেকে অলিপ্ত থাকা যেতে পারে, সেটা ও ভালো ভাবে জানত। দ্বিতীয়জন ছিল জ্ঞানী, সর্বদা জ্ঞানের অহংকারে মত্ত থাকত। তৃতীয়জন ঈশ্বরভক্ত এবং অনন্য রূপে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবানকেই কর্তা মানত। যখন ওরা এইরূপ তর্কালোচনা করছিল, তখনই

ঈশ্বর সম্বন্ধী প্রশ্ন ওঠে এবং কারো সাহায্য না নিয়েই, ওরা নিজেদের স্বতন্ত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

শ্রীসাই, বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি স্বরূপ, এই তিনজনের সঙ্গে ছিলেন। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে- "স্বয়ং ব্রহ্মের অবতার হয়ে তিনি ঐ লোকেদের সঙ্গে মিশে এমন বোকা সাজলেন কেন?" অবতারপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি এক শুদ্র পথিকের ভোজন সানন্দে গ্রহণ করেন কারণ তিনি বিশ্বাসই করতেন 'অন্নম্ ব্রহ্ম'। ভোজনের আগ্রহ উপেক্ষা করলে এবং গুরু ছাড়াই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চাইলে তাদের কি দশা হয়, তারই এক উদাহরণ প্রস্তুত করেন। শ্রুতি বলে যে বাবা, মা ও গুরুর পূজো এবং ধার্মিক গ্রন্থের (শাস্ত্র) অধ্যয়ন করা উচিত। এইগুলি চিত্ত-শুদ্ধির পথ এবং **যতক্ষন চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততক্ষন আত্মানুভূতি আশা করা বৃথা।** এই ভাবে জ্ঞান ও তর্ক আমাদের কোন সাহায্য করতে পারে না। **শুধু গুরু-কৃপা দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব।** শ্রী সাইয়ের দরবারে নানা রকমের লোকেদের দর্শন হত। দেখো, জ্যোতিষীরা আসছেন এবং ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যান করছেন। অন্যদিকে রাজকুমার, শ্রীমান, সম্পন্ন ও নির্ধন, সন্ন্যাসী, যোগী ও গায়ক দর্শন করতে আসছে। এমন কি এক অতি শুদ্রও দরবারে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলে, "সাই-ই আমার বাবা-মা এবং এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করে দেবেন।" আরো অনেকে - ঐন্দ্রজালিক, অন্ধ, পঙ্গু, নাথপন্থী, নর্ত্তক ও শিল্পী ইত্যাদি বহু রকমের লোক - বাবার দরবারে আসত। সেখানে তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা হতো। এই ভাবে উপযুক্ত সময় সেই পথিকটিও আবির্ভূত হয় এবং যে চরিত্রটি ওকে অভিনয় করতে দেওয়া হয় সেটা ও সম্পন্ন করে। কূয়োতে ৪-৫ ঘন্টা উল্টো টাঙ্গানো থাকাটা আমাদের একটা সামান্য ঘটনা মনে করা উচিত নয়। এমন কেউ বিরলই হবে যে এইরূপ এতক্ষণ উল্টো টাঙ্গানো থাকা সত্ত্বেও কষ্ট অনুভব না করে পরামনন্দের অনুভূতি পায়। বরং ব্যথা বা কষ্ট পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তাই এমন মনে হয় যে, এখানে সমাধি অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে। আনন্দ দুরকমের হয় - প্রথম ঐন্দ্রিক এবং দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক। ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয় ও শরীর মনের প্রবৃত্তির রচনা বাহ্যমুখী করেছেন। তাই যখন সেগুলি (ইন্দ্রিয় ও মন) নিজেদের বিষয় পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন আমরা ইন্দ্রিয় চৈতন্যতা প্রাপ্ত করি, যার ফলস্বরূপ আমরা সুখ ও দুঃখ পৃথক বা সম্মিলিত ভাবে অনুভব করি, পরমানন্দ নয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় ও মনকে বিষয় পদার্থ থেকে সরিয়ে অন্তর্মুখী করে আত্মার উপর কেন্দ্রিভূত করা হয় তখন আমাদের আধ্যাত্মিক বোধ জাগ্রত হয় এবং সেই আনন্দ মুখ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না। "আমি পরমানন্দে ছিলাম এবং সেই মূহূর্তের বর্ণনা আমি কিভাবে

করতে পারি?" এই শব্দগুলির দ্বারা বোঝা যায় যে গুরু তাঁকে সমাধি অবস্থায় রেখে চঞ্চল ইন্দ্রিয় ও মনরূপী জল থেকে দূরে রেখেছিলেন।

উপবাস এবং শ্রীমতি গোখ্‌লে ঃ-

বাবা স্বয়ং কখনো উপবাস করেননি এবং তিনি অন্যদেরও করতে দিতেন না। যারা উপবাস করে, তাদের মন কখনো শান্ত থাকে না। সে ক্ষেত্রে ওদের পরমার্থের প্রাপ্তি কিভাবে সম্ভব? সর্বপ্রথম আত্মার তৃপ্তি আবশ্যক। ক্ষুধার্ত থেকে **খালি পেটে ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে না।** যদি পেটে অন্ন ও পুষ্টি না থাকে তাহলে আমরা কোন চোখ দিয়ে ঈশ্বর দর্শন করব, কোন্ জিভ দিয়ে তাঁর মহানতা বর্ণনা করব এবং কোন কান দিয়ে তাঁর লীলা শ্রবণ করব? সারাংশ এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট ভোজন ও শান্তি পেয়ে যখন বলিষ্ঠ থাকে, তখনই আমরা ভক্তি এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্য সাধনা করতে পারি। **তাই আমাদের উপবাস বা অত্যধিক ভোজন, কোনটাই করা উচিত নয়। আহারে সংযম রাখা শরীর ও মন, দুইয়ের জন্যই উত্তম।** শ্রীমতি কাশীবাঈ কাণিট্‌কর (শ্রীসাই বাবার এক ভক্ত) কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে শ্রীমতি গোখ্‌লে দাদা কেলকরের কাছে শিরডী আসেন। উনি এই দৃঢ় সংকল্প করে আসেন যে, বাবার শ্রী চরণে বসে তিন দিন উপবাস করবেন। ওঁর শিরডী পৌঁছবার আগেই বাবা দাদা কেলকরকে বলেন- "আমি দোলের দিন নিজের সন্তানদের ক্ষুধার্ত দেখতে পারি না। যদি ওদের অনাহারেই থাকতে হয়, তাহেল আমি এখানে আছি কি করতে?" পরের দিন ঐ মহিলা দাদা কেলকরের সাথে মস্‌জিদে পৌঁছে বাবার চরণকমলের কাছে বসতেই বাবা বলেন- **"উপবাসের প্রয়োজনটাই কি?** দাদা ভট্টের বাড়ী গিয়ে 'পুরণপোলী' তৈরী করো। ওঁর ছেলে-মেয়েদের খাওয়াও ও নিজেও খাও।" সেটা ছিল দোলের দিন এবং সেই সময় শ্রীমতি কেলকর মাসিক ধর্মে ছিলেন। দাদাভট্টের বাড়ীতে খাবার তৈরী করার কেউ ছিল না। তাই বাবার যুক্তি খুবই সাময়িক প্রমাণিত হয়। শ্রীমতি গোখ্‌লে দাদাভট্টের বাড়ী গিয়ে রান্না করে সবাইকে খাইয়ে নিজেও খান। কি চমৎকার এই গল্প ও কত সুন্দর তাঁর শিক্ষা!

বাবার 'সরকার' ঃ-

বাবা নিজের ছোটবেলার একটি কাহিনী এই ভাবে বর্ণনা করেন -

ছোটবেলায় জীবিকা উপার্জন করার জন্য আমি বীডগ্রাম যাই। সেখানে আমি জরির কাজ পাই এবং পূর্ণ উৎসাহ ও একাগ্র মনে কাজ করতাম। আমার কাজ দেখে

মালিক খুব খুশী হতেন। আমার সাথে আরো তিনটে ছেলে কাজ করত। প্রথম জন ৫০ টাকা, দ্বিতীয়জন ১০০ টাকা এবং তৃতীয়জন ১৫০ টাকা পেত। আমি ঐ তিনজনের চেয়ে দ্বিগুণ কাজ করতাম। আমার নিপুণতা দেখে মালিক আমার প্রশংসা করতেন। উনি আমায় খুব ভালবাসতেন এবং আমায় একটা পোষাকও উপহার দেন। তার মধ্যে মাথায় পাগড়ী ও গা ঢাকার জন্য একটা শালও ছিল। সেই পোষাকটি আমার কাছে এখনও নতুনই রাখা আছে। আমি ভাবলাম যে মানুষ দ্বারা নির্মিত সব কিছুই তো নশ্বর ও অপূর্ণ। কিন্তু আমার 'সরকার' (ভগবান) যা দেন সেটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। মানুষের দেওয়া কোন উপহারের সাথে তার তুলনা সম্ভব নয়। আমার মালিক বলেন- "নাও, নাও।" লোকেরা আমার কাছে এসে বলে- "আমায় দাও, আমায় দাও।" কিন্তু আমি যা বলি, তার দিকে কেউ মন দেয় না। আমার মালিকের ভাণ্ডার (আধ্যাত্মিক ভান্ডার) ভরপুর এবং সমানেই উপচে পড়ছে। আমি তো বলি- গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যাও। মায়ের খাঁটি সন্তান হলে, এই সম্পদে নিজেকে পূর্ণ করে নেবে। আমার ফকিরের কৌশল, আমার ভগবানের লীলা ও আমার 'সরকারের' দক্ষতা অতুলনীয়। আমার আর কি, এই শরীর মাটির সঙ্গে মিলে সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং এই সুযোগ আর কখনো পাবে না। আমি যেখানেই যাই, যেখানেই বসি, মায়া আমায় কষ্ট দেয়। তা সত্ত্বেও আমি নিজের ভক্তদের কল্যাণের বিষয়ে সর্বদা উৎসুক থাকি। **যে যাই করুক, একদিন তার ফল সে অবশ্যই পাবে এবং যে আমার এই কথা মনে রাখবে, সে অমূল্য সুখশান্তির অধিকারী হবে।**

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৩৩

উদীর মহিমা (ভাগ - ১)

বিছের কামড়, প্লেগের গাঁট, জামনেরের চমৎকার, নারায়ণ রাও, বালা বুওয়া সুতার, আপ্পাসাহেব কুলকার্ণী, হরি ভাউ কার্ণিক।

এর আগের অধ্যায়ে গুরুর মহানতার দিগ্‌দর্শন করানো হয়েছিল। এবার এই অধ্যায়ে 'উদীর' মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হবে।

প্রস্তাবনা ঃ-

আসুন, আগে আমরা সন্তদের চরণে প্রণাম করি, যাঁদের মাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্ম হয়ে আমাদের আচরণের দোষ নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁদের উপদেশ আমাদের জন্য হয়ে ওঠে পরম শিক্ষাপ্রদ ও অক্ষয় সুখের বস্তু। তাঁরা নিজেদের মনে- "এটা আমার, ওটা তোমার" এমন কোন প্রভেদ রাখেন না। এই ধরনের মনোভাব স্বপ্নেও তাঁদের হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না। তাঁদের ঋণ এই জন্মে ত দূর, অনেক জন্মেও শোধ করতে পারব না।

উদী (বিভূতি) ঃ-

এটা তো সবাই জানে যে, বাবা লোকেদের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন এবং ঐ টাকা থেকে লোকেদের দান করার পর যা বাঁচত, সেটা দিয়ে কয়লা বা কাঠ কিনে সব সময় ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখতেন। এই ধুনির ভস্মকে 'উদী' বলা হয়। শিরডী থেকে রওনা হওয়ার সময় ভক্তদের এই ভস্ম মুক্তহস্তে বিতরণ করা হতো। এই 'উদী'র মাধ্যমে বাবা আমাদের কি শিক্ষা দিতেন? উদী বিতরণ করে বাবা আমাদের শেখাতেন যে এই জ্বলন্ত কয়লার ন্যায় গোচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব ভস্মেরই সমান। আমাদের দেহ ইন্ধনের মতো অর্থাৎ পঞ্চভূতাদি দ্বারা নির্মিত, যেটি সাংসারিক ভোগাদির পর ধ্বংস হয়ে ভস্ম রূপে পরিণত হয়ে যাবে। সব শেষে এই দেহটা ভস্ম হয়ে যাবে- এই কথাটা স্মরণ করাবার জন্য বাবা উদী বিতরণ করতেন। এই উদীর দ্বারা তিনি আরো একটা শিক্ষা দিতেন- ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই সংসারে বস্তুতঃ কেউ কারো পিতা, পুত্র বা স্ত্রী নয়। আমরা এই জগতে একলাই এসেছি এবং একলাই চলে যাবো।

আগেও দেখা গেছে এবং এখনো অনুভব করা হয়, এই উদী অনেক শারীরিক এবং মানসিক রোগীদের স্বাস্থ্য প্রদান করেছে। আসলে বাবা ভক্তদের দক্ষিণা ও উদীর মাধ্যমে সত্য ও অসত্যের প্রতি বিবেক এবং অসত্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বোঝাতে চাইতেন। আমারা উদীর মাধ্যমে বৈরাগ্য ও দক্ষিণার মাধ্যমে ত্যাগের শিক্ষা পাই। এই দুটি না থাকলে এই মায়ারূপী ভবসাগর পার করা কঠিন। তাই বাবা অন্যের ভোগ স্বয়ং ভোগ করে দক্ষিণা স্বীকার করতেন। ভক্তরা যখন রওনা হওয়ার অনুমতি নিতে যেত, তখন তিনি প্রসাদ রূপে খানিকটা উদী দিয়ে ও কিছুটা ওদের কপালে লাগিয়ে নিজের হাত ওদের মাথায় রাখতেন। বাবা প্রসন্ন চিত্তে থাকলে প্রেমপূর্বক গান গাইতেন। এমনি একটা ভজন উদীর বিষয়েও ছিল। ভজনের শব্দগুলি- রমতে রাম আয়ো জী, আয়ো জী, উদিয়া কী গোনিয়া লায়ো জী - "ঐ দেখো শ্রী রাম ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন ও থলিতে উদী ভরে এনেছেন।" বাবা এই ভজনটি মধুর সুরে গাইতেন। এ তো হল উদীর আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্বন্ধীয় কথা। কিন্তু এতে ভৌতিক প্রভাবও আছে, যার দ্বারা ভক্তরা স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, চিন্তামুক্তি ও অনেক সাংসারিক লাভ প্রাপ্ত করে। তাই উদী আমাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক- দুরকমই লাভ প্রদান করে। এবার আমরা উদীর মহিমার কথা আরম্ভ করছি।

বিছের কামড় ঃ-

নাসিকে শ্রী নারায়ণ মোতীরাম জানী বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। উনি বাবারই আরেক ভক্ত শ্রী রামচন্দ্র বামন মোডকের অধীনে কাজ করতেন। একবার উনি নিজের মাকে নিয়ে বাবার দর্শন করতে শিরডী আসেন। তখন বাবা ওঁর মাকে বলেন- "এবার তোমার ছেলের চাকরী ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করা উচিত।" কিছুদিনের মধ্যেই বাবার কথা সত্য হয়। নারায়ণ রাও চাকরী ছেড়ে, 'আনন্দ আশ্রম' নামক একটা উপহার সামগ্রীর দোকান খোলেন। একবার নারায়ণ রাও-য়ের এক বন্ধুকে বিছে কামড়ালো। অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে লাগলেন। এ সব ব্যাপারে উদী একেবারে রামবাণ- কামড়ের জায়গায় শুধু লাগিয়ে দিতে হয়। নারায়ণ উদী খুঁজে পাচ্ছিলেন না। উনি বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন। বাবার নাম নিয়ে তাঁর ছবির সামনে রাখা ধূপের থেকে এক চিমটে ভস্ম বাবার উদীর সমান মনে করে কামড়ের জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। সেখান থেকে হাত সরাতেই ব্যথা তক্ষুনি কমে যায় এবং দুজনেই অত্যন্ত খুশী হয়ে নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যান।

প্লেগের গাঁট ঃ-

এক সময় বান্দ্রায় থাকাকালীন এক ভক্ত জানতে পারেন যে, ওর মেয়ে প্লেগগ্রস্ত এবং ওর শরীরে গাঁট বেরিয়ে এসেছে। ভক্তটির কাছে সেই সময় উদী ছিল না। তাই তিনি নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছে উদী দেওয়ার জন্য খবর পাঠান। যখন নানাসাহেবের কাছে এই খবর পৌঁছয় তখন উনি ঠানে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে কল্যাণ যাচ্ছিলেন। ওঁর কাছেও সেই সময় উদী ছিল না। রাস্তা থেকে খানিকটা ধূলো উঠিয়ে শ্রীসাই বাবার ধ্যান করে এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে সেই ধূলোটি নিজের স্ত্রীর মাথায় লাগিয়ে দেন। ভক্তটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই সব দেখছিলেন। বাড়ী ফিরে জানতে পারেন যে, যে সময় নানাসাহেব ঠানে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে বাবার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন থেকেই যথেষ্ট পরিবর্তনের ফলে মেয়ে আরাম পেয়েছে। মেয়েটি গত তিনদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিল।

জামনেরের বিলক্ষণ চমৎকার ঃ-

১৯০৪-০৫ সালে খানদেশ জেলার জামনের শহরে মাম্‌লৎদার ছিলেন- নানাসাহেব চাঁদোরকর। জামনের শিরডী থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে। ওঁর মেয়ে ময়নাতাঈ ছিলেন আসন্ন প্রসবা। ২-৩ দিন আগে থেকে ওঁর প্রসব পীড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। নানাসাহেব সব সম্ভব চেষ্টা করেন, কিন্তু কষ্ট কম হয় না। তখন উনি বাবার ধ্যান করে সাহায্য করতে প্রার্থনা করেন। ঐ সময় রামগীর বুওয়া, যাকে বাবা 'বাপুগীর বুওয়া' বলে ডাকতেন, শিরডী থেকে নিজের বাড়ী খানদেশে ফিরছিলেন। বাবা ওকে নিজের কাছে ডেকে বলেন- "তুমি বাড়ী যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য জামনেরে নেমে এই উদী এবং আরতি শ্রী নানাসাহেবকে দিয়ে দিও।" রামগীর বুওয়া বলেন- "আমার কাছে তো মাত্র দু টাকা আছে। সেটা বোধহয় জলগ্রাম অবধি ভাড়া দিতেই শেষ হয়ে যাবে। তবে এই অবস্থায় সেখান থেকে আরো ৩০ মাইল যাওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে?" তাতে বাবা উত্তর দেন- "চিন্তা করো না। তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" বাবা শামাকে দিয়ে মাধব অডগর দ্বারা রচিত প্রসিদ্ধ আরতির প্রতিলিপি তৈরী করিয়ে উদীর সাথে নানাসাহেবের জন্য পাঠিয়ে দেন। বাবার আশ্বাস পেয়ে রামগীর বুওয়া শিরডী থেকে প্রস্থান করেন এবং প্রায় রাত্তির পৌনে তিনটের সময় জলগ্রামে এসে পৌঁছন। ওঁর পকেটে তখন দু আনা পয়সা। বড়ই অসুবিধেজনক অবস্থা। এমন সময় উনি একটি আওয়াজ শুনতে পান - 'শিরডী থেকে একজন বাপুগীর বুওয়া এসেছেন, তিনি কে?" উনি এগিয়ে গিয়ে বলেন- "আমিই শিরডী থেকে আসছি।,

আমার নাম বাপুগীর বুওয়া।" তখন ঐ চাপরাশীটি ওঁকে নিয়ে বাইরে এসে একটা সুন্দর টাঙ্গাতে বসায়। সে জানায় যে সে নানাসাহেব চাঁদেরকরের নির্দেশেই তাঁকে জামনের নিয়ে যেতে এসেছে। এবার ওঁরা দুজনে রওনা হন। মাঝে ঘোড়া দুটিকে জল খাওয়ানোর জন্য টাঙ্গা থামানো হয়। সেই সময় চাপরাশীটি রামগীর বুওয়াকেও জলপান করতে অনুরোধ করে। লোকটির দাড়ি-গোঁফ ও বেশভূষা দেখে তাকে মুসলমান ভেবে রামগীর বুওয়া জলপান করতে অস্বীকার করেন। তখন চাপরাশীটি জানায় যে, সে গাড়ওয়ালের ক্ষত্রিয় বংশের হিন্দু। ঐ সব জলখাবার নানাসাহেবই বুওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। তাই ওঁর তাতে আপত্তি বা সন্দেহ করা উচিত নয়। এরপর দুজনে জলপান করে আবার রওনা হন এবং সূর্যোদয় কালে জামনের পৌছন। রামগীর বুওয়া প্রস্রাব করতে যান। একটু পরেই ফিরে এসে দেখেন যে, সেখানে টাঙ্গা, টাঙ্গার দুটি ঘোড়া ও সেই চাপরাশীটি (সহিস) কেউই নেই। ওঁর মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। উনি কাছের কাছারীতে খোঁজ করতে যান এবং সেখানে জানতে পারেন যে, এই সময় মাম্‌লৎদার নিজের বাড়ীতেই আছেন। বাপুগীর নানাসাহেবের বাড়ী গিয়ে পৌছন এবং ওঁকে বলেন- "আমি শিরডী থেকে বাবার আরতি ও উদী নিয়ে এসেছি।" সেই সময় ময়নাতাঈয়ের অবস্থা খুবই চিন্তাজনক। নানাসাহেব ভাবেন যে বাবার সাহায্য খুবই সাময়িক। কিছুক্ষণ পরই খবর আসে যে প্রসব সকুশলে ও নির্বিঘ্নে হয়ে সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে গেছে। এরপর রামগীর বুওয়া নানাসাহেবকে ষ্টেশনে টাঙ্গার সাথে খাবার পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। সে কথা শুনে নানা সাহেব অবাক হয়ে বলেন- "আমি তো কোন টাঙ্গা বা চাপরাশী পাঠাইনি আর শিরডী থেকে আপনার আগমনের কোন খবরও পাইনি।" ঠানের শ্রী বি. ভি. দেব এই সম্বন্ধে শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের পুত্র বাপুসাহেব চাঁদোরকর এবং শিরডীর রামগীর বুওয়াকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে শ্রী সাই লীলা পত্রিকা ১৩ তে গদ্য ও পদ্য রূপে একটি সুন্দর রচনা প্রকাশ করেন। শ্রী নরসিংহ স্বামী ১) ময়নাতাই (ভাগ ৫, পৃষ্ঠ ১৪) ২) বাপুসাহেব চাঁদোরকর (ভাগ ২০, পৃষ্ঠ ৪০) এবং ৩) রামগীর বুওয়ার (ভাগ ২৭, পৃষ্ঠ ৮৩) বক্তব্য নিজের বই "ভক্তদের অভিজ্ঞতা" (ভাগ-৩) প্রকাশ করেছেন। নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ রামগীর বুওয়ার কথানুসারে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

"একদিন বাবা আমায় নিজের কাছে ডেকে একটা উদীর পুরিয়া এবং একটা আরতির প্রতিলিপি দিয়ে বলেন- "যামনের যাও। এই আরতি ও উদী নানাসাহেবকে দিয়ে দিও।" আমি বাবাকে জানাই যে আমার কাছে মোট দু টাকাই আছে। কোপরগ্রাম থেকে জলগ্রাম এবং সেখানে থেকে গরুর গাড়ীতে জামনের যাওয়ার জন্য এই টাকায়

কুলোবে না। বাবা বলেন- "আল্লাহ দেবেন।" আমি শুক্রবারে রওনা হই। মনমাড বিকেল ৬.৩০ মিনিটে ও জলগ্রাম রাত্রি দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছই। সেই সময় প্লেগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কড়াকড়ি ছিল। তাই আমার একটু অসুবিধেই হয়। আমার চিন্তা হচ্ছিল- জামনের যাই কি করে? রাত্তির তিনটে নাগাদ পায়ে বুট ও মাথায় পাগড়ী পরা একটি চাপরাশী এসে আমায় টাঙ্গায় বসতে বলে এবং আমরা সেই টাঙ্গায় রওনা হই। আমার বেশ ভয় হচ্ছিল। রাস্তায় জলপানও করি। ভোরবেলা জামনের পৌঁছই। প্রস্রাব করার পর ফিরে এসে দেখি যে সেখানে কিছুই নেই। টাঙ্গা ও টাঙ্গাওয়ালা অদৃশ্য।"

নারায়ণ রাও ঃ-

ভক্ত নারায়ণ রাও বাবার তিনবার দর্শন পান। বাবা সমাধিস্থ (১৯১৮) হওয়ার তিন বছর পর উনি শিরডী যেতে চাইতেন। কিন্তু কোন-না-কোন কারণে যাওয়া হয়ে উঠছিল না। বাবার মহাসমাধির পর এক বছরের মধ্যেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন চিকিৎসাই কাজে লাগে না। তখন উনি অষ্টপ্রহর বাবার ধ্যান করা শুরু করেন। এক রাতে উনি স্বপ্ন দেখেন যে বাবা একটা গুহা থেকে বেরোচ্ছেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- "ভয় পেও না। তুমি কাল থেকেই আরাম পেতে শুরু করবে এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই চলতে-ফিরতে পারবে।" ঠিক অতটা সময়ের মধ্যে নারায়ণ রাও সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবার চিন্তা করার কথা এই যে, বাবাকে কি দেহে থাকাকালীনই জীবিত মানা উচিত এবং যেহেতু দেহত্যাগ করে দিয়েছেন বলে কি মৃত মানা হবে? না। বাবা অমর- কারণ তিনি জন্ম-মৃত্যুর বাইরে। **একবার অনন্য ভাবে যে তাঁর শরণাপন্ন হয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে তিনি সাহায্য অবশ্যই করেন। তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং যে কোন রূপে ভক্তের সামনে প্রকট হয়ে তার ইচ্ছে পূরণ করেন।**

আপ্পাসাহেব কুলকর্ণী ঃ-

১৯১৭ সালে আপ্পাসাহেব কুলকার্ণীর জীবনে ভালো সময় আসে। ওঁর ঠানেতে স্থানান্তরণ হয়। বালাসাহেব ভাটে ওঁকে বাবার একটা ছবি দেন। আপ্পাসাহেব সেই ছবিটি পূজো করতে শুরু করেন। উনি পবিত্র মনে পূজো করতেন। রোজ বাবাকে চন্দন এবং নৈবেদ্য অর্পণ করতেন। বাবার দর্শন করার ওঁর তীব্র ইচ্ছে ছিল। এই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে উৎসুক হয়ে বাবার ছবিকে দেখাই বাবার প্রত্যক্ষ দর্শনের সমান। নীচে লেখা ঘটনাটি এই কথাটি প্রমাণ করে।

বালাবুওয়া সুতার ঃ-

বালাবুওয়া নামক বম্বেতে এক সাধু (মহাপুরুষ) ছিলেন। নিজের ভক্তি, ভজন ও আচরণের জন্য উনি আধুনিক তুকারাম নামে বিখ্যাত ছিলেন। ১৯১৭ সালে উনি শিরডী আসেন। বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা বলেন- "আমি একে গত চার বছর থেকে জানি।" বালাবুওয়া খুব আশ্চর্য্য হন। উনি মনে-মনে ভাবেন- "আমি তো প্রথমবার শিরডী এসেছি, তাহলে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?" অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর উনি বাবার কথার যথার্থ অর্থ বুঝতে পারেন। উনি মনে-মনেই বলেন- "সন্তরা কত সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞানী এবং ভক্তদের প্রতি তাঁদের হৃদয়ে অফুরন্ত দয়া। আমি তো কেবল তাঁর ছবিকেই প্রণাম করেছিলাম। সেটাও বাবা জানতে পেরে গেছেন। তাই তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে **বাবার ছবি দেখাও যা, বাবাকে দেখাও তাই।**

এবার আমরা আপ্পাসাহেবের ঘটনায় ফিরে আসি। ঠানেতে থাকাকালীন ওঁকে একবার কোন কাজে ভিবণ্ডী যেতে হয় যেখান থেকে এক সপ্তাহ আগে ফেরা সম্ভব ছিল না। ওঁর অনুপস্থিতিতে তৃতীয় দিন ওঁর বাড়ীতে নিম্নলিখিত বিচিত্র ঘটনাটি ঘটে। দুপুর বেলা আপ্পাসাহেবের বাড়ীতে একটি ফকির আসেন, যাঁর চেহারা বাবার ছবির সাথে হুবহু মিল ছিল। শ্রীমতি কুলকার্ণী ও ছেলে মেয়েরা ওঁকে জিজ্ঞাসা করে- "আপনি শিরডীর শ্রীসাই বাবা তো নন?" এর উত্তরে ফকিরটি জানান যে উনি সাইবাবার আজ্ঞাকারী সেবক এবং তাঁর আদেশ অনুসারেই ওদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। ফকির দক্ষিণা চান এবং শ্রীমতি কুলকার্ণী ওঁকে এক টাকা দেন। তখন ফকির ওঁকে একটা পুরিয়া দিয়ে বলেন- "এটা নিজের পূজোর জায়গায় ছবির সাথে রেখো।' এই বলে উনি তাদের কল্যাণ কামনা করে সেখান থেকে চলে যান। এবার বাবার অদ্ভুত লীলার কথা শুনুন।

ভিবণ্ডীতে আপ্পাসাহেবের ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই উনি কাজে এগোতে পারেন না। তখন সেই রাত্তিরেই উনি বাড়ী ফিরে আসেন। বাড়ী পৌঁছতেই বৌয়ের কাছে ফকিরের আগমনের খবর পান। ওঁর মন এই ভেবে অশান্ত হয়ে উঠে যে তিনি ফকিরের দর্শন পেলেন না। এবং স্ত্রী যে শুধু এক টাকা দক্ষিণা দেন সেটাও ওঁর ঠিক পছন্দ হয় না। উনি বলেন- "আমি হলে ১০ টাকার কম কখনোই দিতাম না।" তখন উনি খালি পেটেই ফকিরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। মস্‌জিদ ও অন্যান্য অনেক জায়গায় খোঁজেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। পাঠকগণ! অধ্যায় ৩২তে বাবার কথাগুলি

স্মরণ করুন - 'খালি পেটে ঈশ্বরের খোঁজ করা উচিত নয়।" আপ্পাসাহেব এই শিক্ষাটি পেয়ে যান। খাবার খাওয়ার পর যখন উনি শ্রী চিত্রের সাথে বেড়াতে বেরোন, তখন একটু দূরে যেতেই দেখেন যে, সামনে থেকে একটি ফকির দ্রুত গতিতে ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। আপ্পাসাহেব ভাবেন- "এঁকে দেখে ঐ ফকিরটি বলেই তো মনে হচ্ছে। এঁকে দেখতেও ঠিক বাবার (ছবির) মতনই।" ফকির কাছে আসতেই হাত বাড়িয়ে দক্ষিণা চান। আপ্পাসাহেব ওঁকে এক টাকা দেন, তখন উনি আরো টাকা চান। এবার আপ্পাসাহেব দু টাকা দেন, তাও ফকিরের মন ভরে না। উনি নিজের বন্ধুর কাছ থেকে তিন টাকা নিয়ে ফকিরকে দেন। তবুও ওকে দেখে ঠিক সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে হচ্ছিল না এবং উনি আরো চাইছিলেন। তখন আপ্পাসাহেব ফকিরকে তাঁদের সঙ্গে বাড়ী আসতে অনুরোধ জানান। বাড়ীতে এসে ফকিরকে আরো তিন টাকা দিলেন- সবশুদ্ধ নয় টাকা হল। কিন্তু ফকির আবার দাবী করলেন। তখন আপ্পাসাহেব বলেন- "আমার কাছে ১০ টাকার একটা নোট আছে।" ফকির সেই নোটটি নিয়ে ঐ ৯ টাকা ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে যান। আপ্পাসহেব ১০ টাকা দেবেন বলেছিলেন, তাই ওর কাছ থেকে ১০ টাকা নিয়ে নেন। তিনি বাবার স্পর্শ করা ৯ টাকা ফেরত পান। ৯ সংখ্যাটি খুবই অর্থপূর্ণ এবং নববিধা ভক্তির দিকে ইঙ্গিত করে (দেখুন অধ্যায় ২১)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লক্ষ্মীবাঈকেও শেষ সময় বাবা ৯ টাকা দিয়েছিলেন।

উদীর পুরিয়া খুলে আপ্পাসাহেব দেখেন যে, তার মধ্যে ফুলের পাঁপড়ি ও চাল রাখা আছে। কালান্তরে উনি যখন শিরডী যান, তখন বাবা ওঁকে নিজের একটি চুলও দিয়েছিলেন। উনি উদী ও চুল একটা মাদুলিতে রেখে সেটা সর্বদা হাতে বেঁধে রাখতেন। আপ্পাসাহেব উদীর শক্তি বুঝতে পেরেছিলেন। প্রথমে উনি চল্লিশ টাকা বেতন পেতেন। কিন্তু বাবার উদী পাওয়ার পর ওঁর বেতন অনেক বেড়ে যায় এবং উনি মান ও খ্যাতি লাভ করেন। এই অস্থায়ী আকর্ষণ ছাড়াও ওঁর আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। তাই সৌভাগ্যক্রমে যাদের কাছে উদী আছে, তাদের স্নান করার পর সেটি কপালে লাগানো উচিত এবং একটু জলে মিশিয়ে তীর্থের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত।

হরিভাউ কার্ণিক ঃ-

১৯১৭ সালে গুরু পূর্ণিমার দিন (ডহানু জেলার) ঠানের হরিভাই কার্ণিক শিরডী আসেন এবং উনি বাবার যাথাবিধি পূজো করেন। নৈবেদ্য ও দক্ষিণা ইত্যাদি অর্পণ করে শামার মাধ্যমে বাবার কাছে থেকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত করেন। মস্‌জিদের সিঁড়ি নেমেই ওঁর মনে হয় যে বাবাকে আরো এক টাকা অর্পণ করা উচিত। উনি

শামাকে ইশারায় ওঁর এই ইচ্ছেটি জানাতে চাইছিলেন- বাবার অনুমতি পাওয়ার পর ফের সিঁড়ি উঠতে ওঁর মন চাইছিল না। কিন্তু শামার ওঁর উপরে চোখ পড়ে না। তাই উনি বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে যান। রাস্তায় নাসিকে উনি শ্রীকালা রামের মন্দির দর্শন করতে যান। সন্ত নরসিংহ মহারাজ মন্দিরের মুখ্য দ্বারের কাছেই বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি ভক্তদের ওখানেই ছেড়ে হরিভাউ-য়ের কাছে এসে ওঁর হাত ধরে বলেন- "আমার টাকাটা দাও।" কার্নিক খুবই আশ্চর্যান্বিত হন এবং সহর্ষে টাকাটা দিয়ে ভাবেন- "আমি বাবাকে এই টাকাটা দেব ভেবেছিলাম। তাই বাবা নরসিংহ মহারাজের রূপে সেটা নিয়ে নিলেন।" এই কাহিনীটি প্রমাণ করে যে সব মহাপুরুষেরাই মূলতঃ অভিন্ন এবং তাঁরা কোন-না-কোন ভাবে একত্র হয়ে কাজ করেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৪

উদীর মহিমা (ভাগ - ২)

১) ডাক্তারের ভাইপো ২) ডাক্তার পিল্লে ৩) শামার বৌদি ৪) ইরাণী কন্যা ৫) হরদার এক ভদ্রলোক ৬) বম্বের মহিলার প্রসব পীড়া।

এই অধ্যায়তেও উদীর মাহাত্মের এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উদীর উপযোগিতা সিদ্ধ হয়, সেই সকল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ডাক্তারের ভাইপো ঃ-

নাসিক জেলার মালেগ্রামে এক ডাক্তার থাকতেন। ওঁর ভাইপো এক অসাধ্য রোগে ভুগছিল। উনি এবং ওঁর ডাক্তার বন্ধুরা সমস্ত রকমের চিকিৎসা করেন, এমন কি অস্ত্রোপচারও করানো হয়। কিন্তু ছেলেটির তাতে কোন লাভ হয় না। ওর কষ্টের শেষ ছিল না। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা ছেলেটির বাবা-মাকে দৈবিক উপচার চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়ে শ্রীসাই বাবার শরণে যেতে বলে। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বাবা মাত্র নিজের দৃষ্টি দিয়েই অসাধ্য রোগের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অতএব বাবা-মা ছেলেটিকে নিয়ে শিরডী আসেন। বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর শ্রী চরণে ছেলেটিকে রেখে অতি নম্র ভাবে মিনতি করেন- "প্রভু আমাদের উপর দয়া করুন। আপনার কীর্তির কথা শুনেই আমরা এখানে এসেছি। দয়া করে এই ছেলেটিকে রক্ষা করুন। প্রভু, আমাদের শুধু আপনিই ভরসা।" প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয় এবং উনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- **"যে এই মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা দেয়, তার জীবনে আর কোন দুঃখ থাকে না। চিন্তা কোর না, এই উদী নিয়ে ওকে লাগিয়ে দাও। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখো। ও এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা মস্‌জিদ নয় দ্বারকাবতী এবং যে এর সিঁড়ি চড়ে, সে স্বাস্থ্য এবং সুখ লাভ করে এবং তার কষ্ট শেষ হয়ে যায়।"** ছেলেটিকে বাবার সামনে বসানো হলো। তিনি সেই রোগগ্রস্ত জায়গায় উপর হাত বুলাতে-বুলাতে ছেলেটিকে করুণাময় দৃষ্টিতে দেখছিলেন। রোগীকে দেখে প্রসন্ন মনে হচ্ছিল এবং উদী লাগাবার অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে। ওর মা-

বাবা বাবাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যান।

এই লীলার কথা শুনে ছেলেটির কাকা, যিনি নিজে একজন ডাক্তার ছিলেন, খুবই আশ্চর্য্য হন এবং ওঁরও বাবার দর্শন করার আগ্রহ জাগে।

বম্বে যাওয়ার পথে ডাক্তারের ইচ্ছে হল বাবার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু মালেগ্রাম ও মনমাডের কাছে কেউ বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলে ওঁর কান বিষিয়ে তোলে। তাই উনি শিরডী যাওয়ার বিচার ছেড়ে সোজা বম্বে চলে যান। বাকি ছুটির কটা দিন উনি আলীবাগে কাটাতে চাইতেন। কিন্তু বম্বেতে তিন রাত্তির ধরে উনি একটাই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন- "এখনো কি তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে?" তখন ডাক্তার নিজের ধারণা বদলে শিরডী যাওয়া স্থির করেন। এদিকে বম্বেতে ওঁর এক রোগীর জ্বর কম হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তাই একবার ওঁর মনে হয় যে বোধহয় শিরডী যাত্রা স্থগিত করতে হবে। উনি মনে-মনেই একটা কথা পরীক্ষা করা স্থির করেন যে যদি রোগী সেদিন ভালো হয়ে যায় তাহলে পরের দিনই তিনি শিরডী রওনা হবেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, যে সময় উনি এই এই রূপ মনস্থ করেন ঠিক সেই সময় থেকেই রোগীর জ্বর কমতে শুরু করে এবং তাপ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন উনি নিজের সংকল্প অনুযায়ী শিরডী পৌঁছন এবং বাবার দর্শন করে তাঁকে প্রণাম করেন। বাবা ওঁকে কয়েকটা এমন অভিজ্ঞতা দেন যে, উনি বাবার ভক্তে পরিণত হন।। ডাক্তার ওখানে চার দিন থাকেন এবং উদী ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে বাড়ী ফিরে আসেন। এক বছরের মধ্যেই পদোন্নতি হওয়ার পর ওঁর স্থানান্তরণ বীজাপুরে হয়। ভাইপোর রোগমুক্ততা ওঁকে বাবার দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করে এবং শিরডী যাত্রা ওঁর মনে শ্রীসাই চরণে প্রগাঢ় প্রীতি উৎপন্ন করে দেয়।

ডাক্তার পিল্লে ঃ-

ডাক্তার পিল্লে বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বাবাও ওঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং সব সময় 'ভাউ' বলে ডাকতেন। প্রায় সময় ওঁর সাথে কথাবার্তা করতেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শও নিতেন। ডাক্তারেরও সর্বদা এই-ই ইচ্ছে হত যে উনি সর্বদা বাবার কাছাকাছিই থাকেন। একবার ডাক্তার পিল্লের পায়ে একটি নালী ঘা হয়। উনি কাতর হয়ে কাকা সাহেব দীক্ষিতকে বলেন- "আমার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমি জানি এর প্রধান কারণ আমার পূর্বজন্মের কর্ম। বাবাকে গিয়ে আমার এই কষ্ট এবার দূর করতে বলো। আমি নিজের পূর্ব জন্মের কর্ম পরের দশ

জন্মে ভুগতে রাজী আছি।" তখন কাকাসাহেব দীক্ষিত বাবাকে ওঁর অনুরোধটি জানান। সাই তো দয়ারই অবতার। তিনি নিজের ভক্তদের কষ্ট চুপচাপ বসে কি করে দেখতেন? প্রার্থনাটি শুনে বাবা বিচলিত হয়ে দীক্ষিতকে বলেন- "পিল্লেকে গিয়ে বলো ঘাবড়াবার কিছু নেই। গত জন্মের কর্মের ফল দশ জন্মে কেন ভুগতে যাবে? কেবল দশ দিনেই সেটা শেষ হয়ে যাবে। আমি তো এখানে তোমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যই বসে আছি। **প্রাণত্যাগ করার ইচ্ছে কখনোই করা উচিত নয়।** যাও, কারো পিঠে চাপিয়ে ওকে এখানে নিয়ে এসো, আমি এক্ষুনি ওকে কষ্ট থেকে রেহাই পাইয়ে দেব।"

তখন ঐ অবস্থাতেই পিল্লেকে ওখানে আনা হয়। বাবা নিজের ডানদিকে ওর মাথার কাছে নিজের গদিটা দিয়ে আরাম করে শুইয়ে বলেন- "এর আসল ঔষধি তো এই যে পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে জয় করে নেওয়া, যাতে তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমাদের কর্মই আমাদের সুখ-দুঃখের কারণ, তাই যা-ই পরিস্থিতি আসুক না কেন, তাতেই সন্তোষ রাখা উচিত। আল্লাই সব কর্মের ফল দেন এবং তিনিই সবাইকে রক্ষা করেন। এই বিশ্বাস রেখে সব সময় তাঁকেই স্মরণ করো। তিনি তোমার চিন্তা দূর করবেন। মনে-প্রাণে তাঁরই অনন্য শরণে যাও। তারপর দেখো তিনি কি করেন।" ডাক্তার পিল্লে বললেন- " আন্নাসাহেব আমার পায়ে পট্টী বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু আমার তাতে কোন লাভ হচ্ছে না।" "নানা তো বোকা। এই পট্টীটা সরাও, নয়তো মরে যাবে। একটু পরেই একটা কালো কাক এসে ঠোকর মারবে। তখন তুমি খুব শীঘ্র ভালো হয়ে যাবে।"

যে সময় এই সব কথাবার্তা চলছিল আব্দুল (যে মস্‌জিদে ঝাড়ু লাগাতো এবং প্রদীপ ইত্যাদি পরিষ্কার করত) সেখানে এসে উপস্থিত হল। প্রদীপ পরিষ্কার করতে-করতে হঠাৎ ওর পা ডাক্তার পিল্লের ঘায়ের উপর গিয়ে পড়ে। পাটা ফোলা তো ছিলই। তার উপর আব্দুলের পায়ের চাপ পড়তেই তার থেকে সাতটা ঘায়ের পোকা বেরিয়ে আসে। কষ্ট অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং ডাক্তার পিল্লে জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গান গাইতে শুরু করেন। তখন বাবা বলেন- "দেখো, ভাউ এবার ভালো হয়ে গেছে এবং গান গাইছে। গানের বুলি ছিল -

দয়া করো আমার হালের উপর, করিম।
তোমারই নাম রহমান ও রহিম।

তুমিই দুই জগতের সুলতান।
পৃথিবীতে প্রকাশ পায় তোমারই 'শান'।
মিটে যাবে সব কারবার।
তোমারই করুণা -থাকবে বজায়।
প্রেমী-ভক্তের সদাই তুমি সহায়।

এবার পিল্লে জিজ্ঞাসা করেন- "ঐ কাকটি কখন এসে ঠোকর মারবে?" বাবা উত্তর দেন- "আরে, তুমি কি কাকটাকে দেখলে না? ও আর আসবে না। আব্দুল, যে তোমার পা চেপে দিলো, ঐ সেই কাক। ও ঠোকর মেরে তোমার ঘায়ের পোকা বার করে দিয়েছে। ও আর কেন আসবে? এবার গিয়ে বিশ্রাম করো। তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে।"

খানিকটা উদী কপালে লাগিয়ে এবং কিছুটা জলে মিশিয়ে খেয়ে, কোন ওষুধ বা চিকিৎসা না করেই উনি দশ দিনেই সুস্থ ও নীরোগ হয়ে ওঠেন- বাবা ওঁকে যেমনটি কথা দিয়েছিলেন।

শামার ছোট ভাইয়ের বৌ ঃ-

শামার ছোট ভাই বাপাজী সামলী বিহারের কাছে থাকতেন। একবার ওঁর স্ত্রীর খুব জ্বর হয় ও দুটো প্লেগের গাঁট বেরিয়ে আসে। বাপাজী দৌড়ে শামার কাছে আসেন এবং সাহায্যের জন্য তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। শামা ভয়ভীত হয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। নিজের নিয়ম অনুসারে বাবার কাছে গিয়ে প্রণাম করে সাহায্যর জন্য প্রার্থনা করেন এবং ভাইয়ের বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি চান। বাবা বলেন- "এত রাত্তির হয়ে গেছে, এখন এই সময় কোথায় যাবে? শুধু উদী পাঠিয়ে দাও। জ্বর বা গাঁঠের চিন্তা কেন করছ? ভগবান তো আমাদের পিতা ও স্বামী। ও শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবে। এখন যেও না। ভোরবেলা গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

শামার তো 'উদী'র উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বাপাজী সেটা নিয়ে গিয়ে খানিকটা গাঁটের ও কপালে লাগিয়ে লাগিয়ে দেন ও খানিকটা জলে গুলে রোগীকে খাইয়ে দেন। ওটা খেতেই রোগীর ঘাম বেরোতে শুরু করে এবং জ্বর কমতেই সে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন বাপাজী নিজের স্ত্রীকে সুস্থ দেখে খুবই অবাক হয়ে যান - জ্বর ও গাঁঠ দুটোই উধাও। শামা বাবার আজ্ঞা নিয়ে পরের দিন সেখানে পৌছে ভ্রাতৃবধূকে চা তৈরী করতে দেখে অবাক হয়ে যান। ভাইকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে

পারেন যে বাবার উদী রোগ সমূলে নষ্ট করে দিয়েছে। তখন শামা বাবা কথা মর্ম বুঝতে পারেন- "ভোরবেলা যেও এবং তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

চা খেয়ে শামা ফিরে আসেন। বাবাকে প্রণাম করার পর বলেন- "দেব! এ কি নাটক? আগে ঝড় তুলে আমাদের অস্থির করে দাও, তারপর শীঘ্র আমাদের সাহায্য করে সব ঠিক করে দাও।" বাবা উত্তর দেন- "তুমি তো জানোই যে কর্মপথ বড় রহস্যপূর্ণ। যদিও আমি কিছু করি না, তবুও লোকেরা আমাকেই কর্মের জন্য দায়ী ঠাওরায়। আমি শুধু একটি দর্শক বা সাক্ষীমাত্র। **কেবল ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান এবং তিনিই প্রেরণা দেন। তিনি পরম দয়ালু। আমি ঈশ্বর বা মালিক কোনটাই নই। শুধু তাঁর এক আজ্ঞাবাহী সেবক এবং সব সময় তাঁকেই স্মরণ করি। যে নিরভিমান হয়ে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তার কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং সে মুক্তি লাভ করে।**

ইরাণী কন্যা ঃ-

এবার এক ইরাণী মহাশয়ের অভিজ্ঞতা পড়ুন। ওঁর ছোট মেয়ে ঘন্টায়-ঘন্টায় অজ্ঞান হয়ে যেত। হাত-পা শক্ত হয়ে মাটিতে মাটিতে পড়ে যেত। নানা চিকিৎসার কোন লাভ হয় না। কিছু লোক ঐ ইরাণী ভদ্রলোকের কাছে বাবার উদীর বিষয় অনেক প্রশংসা করেন। তাঁরা জানান- "ভিলে পার্লেতে (বম্বে) কাকাসাহেব দীক্ষিতের কাছে উদী পেতে পারেন।" তখন উনি সেখান থেকে উদী এনে জলে গুলে মেয়েকে খাওয়ান। প্রথমে যে মূর্ছা এক ঘন্টা অন্তর হত, পরে সেটা সাত ঘন্টা অন্তর হয় এবং কিছুদিন পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

হরদার এক ভদ্রলোক ঃ-

হরদার এক ভদ্রলোকের পাথুরী রোগ ধরা পড়ে। এই পাথর সাধারণতঃ অস্ত্রপ্রচার করেই বার করা যেতে পারত। লোকেরাও ওঁকে সেই পরামর্শ দেয়। কিন্তু উনি খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাই অস্ত্রোপ্রচার করাবার সাহস হচ্ছিল না। এই অবস্থায় ওঁর কষ্ট কিভাবে লাঘব হতে পারত? ঐ সময় শহরের 'ইনামদার' সেখানে ছিলেন এবং ওঁর কাছে উদীও ছিল। কিছু বন্ধুদের পরামর্শে ভদ্রলোকটির ছেলে ইনামদারের কাছ থেকে খানিকটা উদী নিয়ে এসে জলে গুলে নিজের বৃদ্ধ পিতাকে খাইয়ে দেয়। কেবল পাঁচ মিনিটে, উদী পেটে যেতেই পাথর মল-মূত্রেন্দ্রিয় দ্বার থেকে বেরিয়ে

যায়। বৃদ্ধটি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করলেন।

বম্বের মহিলার প্রসব-পীড়া ঃ-

বম্বের কায়স্থ প্রভু জাতির এক মহিলার প্রসব কালে অসহ্য যন্ত্রণা হত। গর্ভবতী হলেই উনি ঘাবড়ে যেতেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন। ওঁর স্বামীর এক বন্ধু, শ্রীরাম মারুতি তাঁকে পরামর্শ দেন- "যদি এই ব্যথা থেকে মুক্তি চাও তো নিজের স্ত্রীকে শিরডী নিয়ে যাও।"

এরপর যখন মহিলা গর্ভবতী হন, তখন দুজনে শিরডী যান এবং সেখানে কয়েক মাস থাকেন। ওঁরা বাবার রোজ সেবা করতেন এবং তাঁর সৎসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছু দিন পর মহিলার প্রসব কাল উপস্থিত হল এবং আগের মত গর্ভাশয়ের দ্বারে বাধা পাওয়ার দরুণ খুব বেশী যন্ত্রণা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর এক প্রতিবেশী মহিলা আসেন এবং মনে-মনে বাবার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে জলে উদী মিলিয়ে মহিলাটিকে খাইয়ে দেন। এরপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর কোন কষ্ট না হয়ে প্রসব সম্পন্ন হয়। বালক তো নিজের ভাগ্য অনুসারেই জন্মায়। কিন্তু ওর মা যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে বাবার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে ছিলেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৫

কাকা মহাজনীর বন্ধু এবং 'শেঠ' (মনিব), নির্বীজ মনক্কা, বান্দ্রার এক গৃহস্থের অনিদ্রা, বালাজী পাটীল নেবাস্‌কর, বাবার সর্প রূপে প্রকট হওয়া।

এই অধ্যায়তেও উদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি ঘটনার মাধ্যমে বাবাকে পরীক্ষা করার ভক্তের মন্তব্য এবং তাঁর অন্তহীন শক্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে এই ঘটনাগুলিই বর্ণনা করা হবে।

সাম্প্রদায়িক প্রবৃত্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির পথে খুব বড় বাধা। নিরাকারবাদীদের বলতে শোনা যায় যে, ঈশ্বরের সগুণ উপাসনা শুধুমাত্র এক ভ্রম এবং সন্তগণ আমাদের মতনই সাধারণ মানুষ। তাই তাঁদের চরণ বন্দনা করে দক্ষিণা দেওয়ার কি দরকার? অন্য পন্থের অনুগামীদেরও ঐ একই মত যে, নিজের সদ্‌গুরু ছাড়া অন্য সন্তদের নমন এবং ভক্তি করা উচিত নয়। এই ধরনের অনেক আলোচনা শ্রীসাই বাবার সম্বন্ধে আগে শোনা যেত এবং এখনো শোনা যায়। কেউ-কেউ বলত- "আমরা যখন শিরডী যাই, বাবা আমাদের কাছে দক্ষিণা চান। এই ভাবে দক্ষিণা চাওয়া কি একজন সাধুর পক্ষে শোভনীয়? যখন তিনি এইরূপ আচরণ করেন তখন তাঁর সাধু ধর্ম কোথায় যায়?" কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে যারা মনে অবিশ্বাস নিয়ে বাবার দর্শন করতে গেছে, তারাই সর্বপ্রথম বাবাকে গিয়ে প্রণাম করেছে। এমনিই কয়েকটি ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে -

কাকা মহাজনী বন্ধু ঃ-

কাকা মহাজনীর এক নিরাকারবাদী বন্ধু মূর্তি-পূজার একেবারেই বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু কৌতূহলবশতঃ উনি কাকার সাথে দুটি শর্তে শিরডী যেতে প্রস্তুত হন যে ১) বাবাকে প্রণাম করবেন না ২) আর তাঁকে কোন দক্ষিণা দেবেন না। যখন কাকা স্বীকৃতিসূচক উত্তর দেন, তখন ওঁরা দুজনে শনিবার রাতে বম্বে থেকে রওনা হয়ে পরের দিন সকালে শিরডী পৌঁছন। মস্‌জিদে পা রাখতেই বাবা কাকার বন্ধুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন- "আরে আসুন! বসুন।" বাবার স্বরটি ছিল অবিকল বন্ধুটির স্বর্গীয় পিতার। তখন ওঁর নিজের (স্বর্গীয়) পিতার কথা মনে পড়ে, এবং

উনি আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন। কি মুগ্ধকারিণী ছিল সেই স্বর? তৎক্ষণাৎ নিজের শর্তের কথা ভুলে বাবার পদতলে মাথাটি রাখেন। বাবা দুবার কাকার কাছে দক্ষিণা চান, বন্ধুটির কাছে নয়। উনি আশ্চর্য্য হয়ে কাকাকে ফিস্-ফিস্ করে বলেন- "ভাই, দেখো, বাবা তোমার কাছে, দুবার দক্ষিণা চাইলেন। কিন্তু আমিও তো তোমার সঙ্গেই আছি, তবে তিনি আমায় এইরূপ উপেক্ষা কেন করছেন?" কাকা উত্তর দেন- "ভালো হয়, যদি তুমি নিজেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।" বাবা জিজ্ঞাসা করেন- 'কি কানাঘুষো চলছে?' তখন বন্ধুটি বলেন- "আমিও কি আপনাকে দক্ষিণা দিতে পারি?" বাবা বললেন- "তোমার অনিচ্ছা দেখে আমি তোমার কাছে দক্ষিণা চাইনি। কিন্তু তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে তুমি দক্ষিণা দিতে পারো।" তখন বন্ধুটি বাবাকে সতেরো টাকা দেন, ঠিক যতটা কাকা দিয়েছিলেন। তখন বাবা ওঁদের উপদেশ দিয়ে বলেন- **"আমাদের মধ্যে যে তেলীর (তেল ও জল কখনো মেশে না) দেওয়াল (ভেদ বুদ্ধি) আছে সেটা নষ্ট করে দাও, যাতে আমরা পরস্পরকে দেখে নিজেদের মিলনের পথ সুগম করতে পারি।"** বাবা ওঁদের ফেরার অনুমতি দিয়ে বলেন- "তোমাদের যাত্রা সফল হবে।" যদিও আকাশে মেঘ করেছিল তবুও ওঁরা নিরাপদে বম্বে পৌঁছে যান। বাড়ী ফিরে বন্ধুটি দরজা - জানালা খুলতেই দুটো মৃত চামচিকে দেখতে পান। তৃতীয়টি ওর সামনে দিয়ে উড়ে যায়। তখন ওঁর এই ভেবে খুব অনুতাপ হয় যদি তিনি জানালা খুলে যেতেন তাহলে ঐ জীবগুলির প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু পরক্ষণেই ওঁর মনে হয় যে এ সব ওদের ভাগ্যনুসারেই ঘটেছে এবং বাবা তৃতীয়টির প্রাণ রক্ষা করার জন্যই তাঁদের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরত পাঠিয়ে দেন।

কাকা মহাজনীর মনিব

বম্বেতে 'ঠক্কর ধরমসী জেঠাভাই সলিসিটার (Legal Solicitor) নামক এক ফার্ম ছিল। কাকা এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক ছিলেন। কাকা ও তাঁর মনিবের পরস্পর সম্বন্ধ খুব ভাল ছিল। শ্রীমান ঠক্কর জানতেন যে কাকা প্রায় শিরডী যান এবং সেখানে কিছুদিন থেকে বাবার অনুমতি হলেই ফেরেন। কৌতুহলবশতঃ বাবাকে পরীক্ষা করার বিচার নিয়ে উনিও দোল-উৎসবের উপলক্ষে কাকার সাথে শিরডী যাবেন স্থির করেন। যেহেতু কাকার শিরডী থেকে ফেরার দিন অনিশ্চিত থাকত, তাই সাথে আরেক বন্ধুকে নিয়ে তিনজনে রওনা হন। পথে কাকা বাবাকে অর্পণ করার জন্য দু সের মনক্কা কেনেন। ঠিক সময়ে শিরডী পৌঁছে ওঁরা বাবার দর্শন করার জন্য মস্‌জিদে যান। বালাসাহেব তর্খডও সেই সময় মস্‌জিদেই ছিলেন। শ্রী ঠক্কর ওঁকে

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালাসাহেব উত্তর দেন- "আমি দর্শন করতে এসেছি। আমার কোন চমৎকার দেখার প্রয়োজন বা ইচ্ছে নেই। এখানে তো ভক্তদের মনের ইচ্ছে পূরণ হয়।" কাকা বাবাকে প্রণাম করে মনক্কা অর্পণ করেন। তখন বাবা সেগুলি বিতরণ করার আদেশ দেন। শ্রীমান ঠক্করও কয়েকটা মনক্কা পান। একে তো ওঁর মনক্কা ভালো লাগত না, উপরন্তু এইরূপ অস্বচ্ছ ভাবে খেতে ডাক্তার মানা করেছিল। তাই উনি কিছু স্থির করে উঠতে পারেন না এবং ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সেগুলি গ্রহণ করতে হয়। ভদ্রতা রক্ষার্থে মুখেও পুরে নেন। এবার বীচিগুলো কি করা যায়- সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মস্‌জিদে মেঝেতে ফেলা যায় না। তাই উনি বীচিগুলো ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের পকেটে পুরে নেন। উনি ভাবেন- "বাবার ন্যায় সন্তর কাছে এই কথা কি করে গোপনীয় থাকতে পারে যে আমার মনক্কা ভালো লাগে না? তাহলে কি উনি আমায় এই বিষয়ে বাধ্য করতে পারেন?" এই চিন্তা মনের মধ্যে আসতেই বাবা ওঁকে আরো কয়েকটা মনক্কা দেন। কিন্তু উনি সেগুলি না খেয়ে হাতে ধরে বসে থাকেন। তখন বাবা ওঁকে সেগুলি খেয়ে ফেলতে বলেন। উনি সে আজ্ঞা পালন করেন এবং চিবিয়ে দেখেন যে সবগুলি নির্বীজ- চমৎকার দেখার ইচ্ছে নিয়ে এসেছিলেন, তাই চমৎকার দেখতে পান। এও বুঝতে পারেন যে বাবা সমস্ত চিন্তাধারা অবিলম্বেই জেনে ওঁর ইচ্ছানুসারে সেগুলি নির্বীজ করে দিলেন। তাঁর কি অদ্ভুত শক্তি? তারপর সন্দেহ দূর করার জন্য উনি তর্খডকে, যিনি ওঁর পাশেই বসেছিলেন এবং কয়েকটা মনক্কা উনিও পেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি রকমের মনক্কা পেলে?" উত্তর পান- "ভাল বীচির।" শ্রীমান ঠক্কর তখন আরো অবাক হয়ে যান। উনি মনে-মনে স্থির করেন যে যদি বাবা প্রকৃতপক্ষে সন্ত হন, তাহলে এবার সর্বপ্রথম মনক্কা কাকাকে দেওয়া হবে। এই চিন্তাটি জানতে পেরে বাবা বলেন- "এবার কাকার থেকে বিতরণ শুরু করো।" এই সব প্রমাণ শ্রী ঠক্করের জন্য পর্যাপ্ত ছিল।

এরপর শামা বাবার সাথে শ্রী ঠক্করের পরিচয় করিয়ে বলেন- 'ইনি কাকার মালিক।" বাবা বলেন- "ইনি কাকার মালিক কি করে হতে পারেন? ওঁর মালিক তো বড় বিচিত্র।" কাকা এই উত্তরে সম্মত ছিলেন। নিজের জেদ ছেড়ে শ্রী ঠক্কর বাবাকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে যান। দুপুরের আরতি শেষ হওয়ার পর বাবার কাছে রওনা হওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য মস্‌জিদে আসেন। শামা ওদের জন্য একটু সুপারিশ করাতে বাবা বলেন -

"একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান ও ধনী - দুই-ই ছিলেন। শারীরিক

ও মানসিক পীড়া হতে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও উনি সর্বক্ষণ অনাবশ্যক চিন্তাতে ডুবে থাকতেন ও অশান্ত মনে এখানে-ওখানে বৃথা ঘুরে বেড়াতেন। ওঁর এরকম দশা দেখে আমার দয়া হয় এবং আমি ওঁকে বলি যে দয়া করে **আপনি নিজের বিশ্বাস এক ইচ্ছিত স্থানে স্থির করুন। এইরূপ অযথা ভ্রমে পড়ে কোন লাভ হবে না।**"

"শীঘ্রই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির করো" - এই শব্দগুলি শুনে ঠক্কর তক্ষুনি বুঝে যান যে সেটি ওঁরই কাহিনী। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে কাকাও ওঁর সঙ্গে বম্বে ফিরুন। বাবা ওঁর এইরূপ ইচ্ছে জেনে কাকাকে তাঁর শেঠের সাথে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন। কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে কাকা এত তাড়াতাড়ি শিরডী থেকে ফিরতে পারবেন। এই ভাবে শ্রী ঠক্কর বাবার অন্তর্যামী হওয়ার আরেকটা প্রমাণ পান।

বাবা কাকার কাছে পনেরো টাকা দক্ষিণা চেয়ে বলেন- "আমি যদি কারো কাছ থেকে এক টাকাও দক্ষিণা নিই, তাহলে তাকে তার দশ গুণ ফিরিয়ে দিই। আমি কারো কোন বস্তু বিনামূল্যে নিই না আর সবার কাছে চাইও না। যাঁর দিকে ফকির (ঈশ্বর) ইঙ্গিত করেন, শুধু তার কাছেই চাই এবং যে গত জন্মের ঋণী তারই দক্ষিণা স্বীকার করি। **দানী দেয় এবং ভবিষ্যতে সুন্দর ফলের বীজরোপন করে।** ধর্মের পথে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অর্থের প্রয়োগ হওয়া উচিত। টাকা যদি শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়, তাহলে সেটা তার অপব্যবহার। যদি তুমি পূর্বজন্মে দান না করে থাকো তো এই জন্মে কিছু পাওয়ার আশা কি করে করো? তাই **যদি পাওয়ার আশা থাকে তো এখন দান করো।** দক্ষিণা দিলে বৈরাগ্য বুদ্ধি বাড়ে এবং বৈরাগ্য প্রাপ্তি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান বাড়ে। **একটা দাও দশ গুণ পাও।**" এই কথা শুনে শ্রী ঠক্করও নিজের সংকল্প (দক্ষিণা না দেওয়ার) ভুলে বাবাকে পনেরো টাকা অর্পণ করেন। উনি ভাবেন- "শিরডী এসে আমার ভালোই হয়েছে। সব সন্দেহ দূর হল, অনেক রকম শিক্ষা পেলাম।"

এই সব বিষয়ে বাবার কৌশল অদ্বিতীয় ছিল। যদিও তিনি সব কিছু করতেন তবুও সব কিছু থেকে অলিপ্ত থাকতেন। যে প্রণাম করত এবং যে করত না, দুজনেই ছিল তাঁর কাছে সমান। তিনি কখনো কাউকে অশ্রদ্ধা করেননি। ভক্তরা তাঁর পূজো করলে তিনি তাতে বিশেষরূপে প্রসন্ন হতেন না। কেউ তাঁকে উপেক্ষা করলে তাতেও তাঁর কোন দুঃখ হত না। তাঁর সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতিই ছিল না।

অনিদ্রা ঃ-

বান্দ্রার এক মহাশয় অনেকদিন ধরে ঘুমোতে না পারার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যেই উনি ঘুমোতে চেষ্টা করতেন সেই ওঁর স্বর্গীয় পিতা স্বপ্নে এসে বাজে ভাবে গালাগাল করতেন। তাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং রাত-ভোর আশান্তি অনুভব করতেন। প্রত্যেক রাতেই এই রকম হত। তাই উনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। একদিন বাবার এক ভক্তের সাথে পরামর্শ করেন, এই ব্যপারে। সে বলে- "আমি তো সর্ব-পীড়া নিবারণী উদীকেই এর রামবাণ ঔষধি মনে করি।" উনি একটা উদীর পুরিয়া দিয়ে বলেন- "এটা শোবার আগে কপালে লাগিয়ে নিজের মাথার কাছে রেখো।" তারপর থেকে ভদ্রলোক নির্বিঘ্নে গভীর নিদ্রার আনন্দ উপভোগ করতেন। উনি শীঘ্রই শ্রীসাই বাবার ধ্যান করতে শুরু করেন। বাজার থেকে বাবার একটা ছবি এনে নিজের মাথার কাছে রেখে নিত্য পূজো করা শুরু করেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মালা ও নৈবেদ্য অর্পণ করতেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আগেকার সব কষ্ট ভুলে যান।

বালাজী পাটীল নেবাসকর ঃ-

ইনি বাবার একজন বড় ভক্ত ছিলেন ও বাবার নিষ্কাম সেবা করতেন। দিনের বেলা যে রাস্তা দিয়ে বাবা যেতেন সেই রাস্তাটি সকাল-সকাল ঝাড়ু লাগিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে রাখতেন। ওঁর পর এই কাজটি বাবার এক পরম ভক্ত রাধাকৃষ্ণমাঈ করতেন এবং তারপর আব্দুল। বালাজী ফসল কেটে সে সব শষ্য আগে বাবাকে অর্পণ করতেন। তার মধ্যে থেকে বাবা যতটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতেন সেটা দিয়েই উনি নিজের পরিবারের ভরন-পোষণ করতেন। এইরূপ ব্যবস্থা অনেক বছর পর্যন্ত চলে এবং ওঁর মৃত্যুর পরও ওঁর ছেলে সেটা বজায় রেখেছে।

উদীর শক্তি ও মাহাত্ম্য ঃ-

একবার শ্রী বালাজীর বার্ষিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু ভোজনের সময় দেখা গেল তিনগুণ লোক এসেথে। শ্রীমতি নেবাসকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। উনি ভাবেন যে সেই খাবার সবার জন্য পর্যাপ্ত হবে না এবং কম পড়ে গেলে কুটুম্বতে নিন্দের পাত্র হতে হবে। তখন ওঁর শাশুড়ী ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- "চিন্তা করো না। এই অন্ন আমাদের নয়, এইটি তো শ্রীসাই বাবার। প্রত্যেক পাত্রে উদী ঢেলে সেটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও এবং কাপড় না সরিয়েই সকলকে পরিবেশন করো। বাবা আমাদের মুখ রক্ষা করবেন।" পরামর্শ অনুসারে সেই

রকমই করা হয়। লোকেদের পেট ভরে ও তৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর পরও খাদ্র সামগ্রী যথেষ্ট মাত্রায় বেঁচে যায় এবং তা দেখে সবাই খুব আশ্চর্য্য ও প্রসন্ন হয়। আসলে যার যে রকম মনোভাব হয় তদোনুরূপই হয় তার অনুভূতি। এমনি একটি ঘটনা প্রথম শ্রেণীর উপন্যায়াধীশ শ্রী বি. এ. চৌগুলে আমায় বলেছিলেন। ১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারীতে করজতে (জেলা আহমদনগর) পূজোর উৎসব চলছিল এবং একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হয়। খাবার সময় আমন্ত্রিত লোকেদের সংখ্যার চেয়ে পাঁচগুণ বেশী লোক এসে উপস্থিত হয়। তবুও খাদ্য সামগ্রী কম পড়ে না। বাবার কৃপায় সবাই-ই খেতে পায় এবং তাই দেখে সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে।

সাইবাবার সর্প রূপে প্রকট হওয়া ঃ-

শিরডীর রঘু পাটীল একবার নেবাসে বালাজী পাটীলের বাড়ী যান। সেখানে পৌছে জানতে পারেন যে সন্ধ্যাবেলায় একটা সাপ ফোঁস-ফোঁস করতে করতে গোশালায় ঢুকে গেছে। সব পশুগুলি ভয় পেয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। বাড়ীর লোকেরাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বালাজী মনে করেন যে শ্রীসাই-ই এই রূপে এখানে প্রকট হয়েছেন। তখন উনি একটা বাটিতে দুধ এনে নির্ভয়ে ঐ সাপটির সামনে রেখে ওকে সম্বোধন করে বলেন- "বাবা, আপনি ফোঁস করে হৈ-চৈ কেন বাঁধাচ্ছেন? আপনি কি আমায় ভয় পাওয়াতে চান? শান্ত হয়ে এই দুধ পান করুন।" এই বলে কোনরকম ভয় না পেয়ে সাপটির কাছেই বসে পড়েন। অন্যান্য সদস্যরা ঘাবড়ে গিয়ে কি যে করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু একটু পরেই সাপটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কেউ জানতেও পারে না যে ও কোথায় গেল। গোশালায় সর্বত্র খোঁজার পরও সেখানে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ পঞ্চম বিশ্রাম

অধ্যায় - ৩৬

*আশ্চর্য্যজনক ঘটনা - ১) গোয়ার দুজন ভদ্রলোক
২) শ্রীমতি ঔরাঙ্গাবাদকর*

এই অধ্যায়তে গোয়ার দুই ভদ্রলোক ও শ্রীমতি ঔরাঙ্গাবাদকরের অদ্ভুত গল্প বর্ণনা করা হচ্ছে।

গোওয়ার দুই মহানুভব ঃ-

এক সময় গোয়া থেকে দুইজন ভদ্রলোক শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করতে শিরডী আসেন। ওঁরা দুজনে বাবাকে প্রণাম করেন। যদিও তাঁরা একসাথেই এসেছিলেন তবুও বাবা শুধু একজনের কাছেই দক্ষিণা চান এবং সে সানন্দে সেটি দিয়ে দেয়। অন্যজনও তাঁকে ৩৫ টাকা দক্ষিণা দিতে চাইলেন কিন্তু বাবা ওঁর দক্ষিণা ফিরিয়ে দেন। লোকেরা খুব অবাক হয়। সে সময় শামাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উনি বলেন- "দেব! এ কি? এঁরা দুজনে একসঙ্গেই এসেছেন। একজনের দক্ষিণা আপনি চেয়ে নিলেন আর অন্যজন যিনি স্বেচ্ছায় দিতে চাইছেন তাঁরটা অস্বীকার করছেন? এই ধরনের পার্থক্যের ভাব কেন?" তখন বাবা উত্তর দেন- "শামা, তুমি অবোধ। আমি কারো কাছ থেকে কখনো কিছু নিই না। এখানে মস্‌জিদমাঈ নিজের ঋণ চান এবং তাই যে দেয় সে নিজের ঋণ শোধ করে মুক্ত হয়ে যায়। আমার কি কোন ঘর, বাড়ী, সম্পত্তি বা ছেলে-পিলে আছে, যাদের জন্য আমার কোন চিন্তা হবে? আমার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নেই। আমি চিরমুক্ত। ঋণ, শত্রুতা ও হত্যা এর প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করতে হয় এবং এগুলি থেকে অন্য কোন ভাবে মুক্তি সম্ভব নয়।

"নিজের জীবনের প্রারম্ভে এই মহাশয় গরীব ছিলেন। ইনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি চাকরী পেয়ে যান তাহলে একমাসের মাইনে অর্পন করবেন। ইনি পনেরো টাকা মাসিক বেতনের একটা চাকরী পান। তারপর একের-পর-এক উন্নতি হতে হতে ৩০, ৫০, ১০০, ২০০ এবং শেষে ৭০০ টাকা মাসিক বেতন হয়ে যায়। কিন্তু সমৃদ্ধি অর্জন করে ইনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যান এবং টাকাও অর্পণ করেন না। নিজের শুভ কর্মের প্রভাবে এখানে পৌছবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতএব আমি এনার কাছে শুধু পনেরো টাকাই দক্ষিণা চাই - এঁর এক মাসের মাইনে।"

দ্বিতীয় কাহিনী ঃ-

"সমুদ্রের কাছে বেড়াতে-বেড়াতে আমি এক প্রাসাদের কাছে গিয়ে পৌঁছই এবং তার দালানে একটু বিশ্রাম করতে বসি। এই প্রাসাদের ব্রাহ্মণ মালিক আমার যথাচিত আতিথেয়তা করে আমায় সুস্বাদু খাবার খেতে দেয়। খাওয়ার পর ও আমায় আলমারীর কাছে শোওয়ার জন্য একটা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়ে দেয় এবং আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। আমি যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সেই সময় লোকটি পাথর সরিয়ে দেওয়ালে সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকে এবং আমার পকেট কেটে সব টাকা বার করে নেয়। ঘুম থেকে উঠে দেখি যে আমার তিরিশ হাজার টাকা চুরি গেছে। দুঃখে-কষ্টে আমি শুধু কাঁদতে থাকি। শুধু নোটই চুরি হয়েছিল তাই আমার মনে হয় যে এ কাজ ঐ ব্রাহ্মণটি ছাড়া আর কারো হতে পারে না। আমার খাওয়া-পরার ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যায় এবং ওখানেই বসে-বসে চুরির কথা ভেবে ভেবে বুক চাপড়াতে থাকি। এই ভাবে পনেরো দিন কেটে যায়। একদিন এক ফকির রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমায় আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি সব কথা ওঁকে জানাই। উনি তখন আমায় বলেন- "যদি তুমি আমার কথা মত কাজ করো তাহলে তোমার হারানো টাকা ফেরত পেয়ে যাবে। আমি এক ফকিরের ঠিকানা তোমায় দিচ্ছি। তুমি তাঁর শরণে যাও এবং তাঁর কৃপায় তুমি তোমার হারানো টাকা ফিরে পাবে। কিন্তু যতদিন টাকা ফিরে না পাও ততদিন নিজের কোন প্রিয় খাদ্য পরিত্যাগ করো।" আমি ঐ ফকিরের কথা মেনে নিই এবং আমার হারানো টাকা ফেরত পাই। এর কিছুদিন পর প্রাসাদ ছেড়ে সমুদ্রোপকূলে আসি। একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভীড়ের জন্য উঠতে পারলাম না। সৌভাগ্যক্রমে এক সদাশয় চাপরাশীর সাহায্যে আমি জাহাজে বসার জায়গা পাই এবং অন্য পাড়ে পৌঁছতে পারি। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে শিরডী এসে পৌঁছই।" কাহিনী শেষ হতেই বাবা শামাকে ঐ অতিথি দুজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করতে বলেন। তখন শামা এঁদের নিজের বাড়ী নিয়ে যান। খেতে-খেতে শামা ওঁদের বলেন- "বাবার কাহিনীটি বড়ই রহস্যপূর্ণ। তিনি কখনো সমুদ্রের দিকে যাননি আর তাঁর কাছে কখনো তিরিশ হাজার টাকাও ছিলো না। তিনি কখনো কোথাও যাননি এবং কোন টাকা কোনদিন চুরি হয়ে ফেরতও আসেনি।" তারপর শামা ওঁদের জিজ্ঞাসা করেন- "আপনারা কিছু বুঝলেন - এর অর্থ?" দুই অতিথিই নির্বাক এবং তাদের চোখ থেকে অঝরে জল পড়ছিল। ওরা কাঁদতে-কাঁদতে বলল- "বাবা তো সর্বব্যাপী, অনন্ত এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যে ঘটনাগুলি তিনি বলেছেন সেগুলি আমাদেরই কাহিনী

এবং আমাদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। এটা খুব আশ্চর্য্যের কথা যে তিনি সব কথা জানলেন কি করে? খাওয়াদাওয়ার পর সব বিস্তারিত বলব।

এরপর পান খেতে-খেতে ওরা নিজেদের কথা শুরু করে। প্রথমজন বলতে শুরু করে :-

"এক পাহাড়ী এলাকায় আমাদের বাড়ী। আমি চাকরী খুঁজতে গোয়া আসি। আমি ভগবান দত্তাত্রেয়কে কথা দিই - "যদি আমি চাকরী পেয়ে যাই তাহলে আপনাকে এক মাসের মাইনে অর্পণ করব।" তাঁর কৃপায় আমি পনেরো টাকা মাসিক বেতনের চাকরী পাই এবং যেমনটি বাবা একটু আগে বললেন, আমার উন্নতিও হয়। কিন্তু আমি নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে যাই। বাবা সেটা স্মরণ করিয়ে আমার কাছ থেকে পনেরো টাকা নিয়ে নিলেন। আপনারা এটাকে দক্ষিণা মনে করবেন না। এটা একটা পুরনো ঋণ শোধ হল এবং দীর্ঘকাল ভুলে যাওয়া প্রতিজ্ঞা পালন।"

শিক্ষা :-

যথার্থে বাবা কখনো কারো কাছে টাকা চাননি আর নাই নিজের ভক্তদের কখনো চাইতে দিয়েছেন। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কাঞ্চনকে বাধা মনে করতেন এবং সর্বদা তার পাশ থেকে ভক্তদের বাঁচাতেন। ভগত্ মহালসাপতি এই বিষয়ে এক উদাহরণ। উনি খুবই গরীব ছিলেন এবং বড়ই অভাবে ওঁর দিন কাটত। বাবা ওঁকে কখনো টাকা চাইতে দিতেন না। তাঁর কাছে যে দক্ষিণা জমা হত তার থেকেও ওঁকে কিছু দিতেন না। একবার এক দয়ালু ও উদারচেতা ব্যবসায়ী বাবার সামনেই বেশ কিছু টাকা মহালসাপতিকে দিতে চাইলেন কিন্তু বাবা ওঁকে সেটা গ্রহণ করতে দেন নি।

এবার দ্বিতীয় অতিথি নিজের কাহিনী বলতে শুরু করে। "আমার কাছে এক ব্রাহ্মণ রাঁধুনী ছিল, যে গত ৩৫ বছর থেকে সত্যপরায়ণ হয়ে আমার বাড়ীতে কাজ করছিল। কিন্তু বদভ্যাসে পড়ে ওর মন পাল্টে যায় এবং ও আমার সব টাকা চুরি করে নেয়। আমার আলমারী দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকত এবং যখন আমরা ঘুমোচ্ছিলাম ও পেছন থেকে পাথর সরিয়ে আমার তিরিশ হাজার টাকা চুরি করে নেয়। আমি জানি না যে বাবা টাকার রাশিটা সঠিক কি করে জানতে পারেন। আমি দিন-রাত কাঁদতাম আর দুঃখ করতাম। একদিন যখন আমি এই ভাবেই নিরাশ ও উদাস হয়ে বারান্দায় বসেছিলাম, সেই সময় রাস্তা দিয়ে এক ফকির যাচ্ছিল। সে

আমার দশা দেখে আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি ওকে সমস্ত কথা জানাই। তখন সে বলে- "কোপরগ্রাম তালুকায় শিরডী নামে একটি জায়গায় শ্রী সাইবাবা নামক এক সিদ্ধিপ্রাপ্ত ফকির থাকেন। তাঁকে কথা দাও এবং নিজের রুচিকর ভোজ্য পদার্থ ত্যাগ করো। মনে-মনে সংকল্প করো- 'যতক্ষন আমি আপনার দর্শন না করব ততক্ষন ঐ প্রিয় খাদ্য একেবারেই খাবো না।" তখন আমি ভাত খাওয়া ছেড়ে দিই এবং বাবাকে কথা দিই- "বাবা, যতদিন না আমি আমার চুরি হওয়া টাকা ফেরত পাই এবং আপনার দর্শন করি ততদিন আমি ভাত গ্রহণ করব না।" এই ভাবে পনেরো দিন কেটে যায়। তারপর সেই রাধুনি নিজে এসে টাকা ফিরিয়ে ক্ষমা চেয়ে বলে- "আমার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি আপনার পায়ে পড়ছি। আমায় ক্ষমা করুন।" এই ভাবে সব ঠিক হয়ে যায়। আমাকে যিনি সাহায্য করেছিলেন তাঁর আর কোন দিন দেখা পাই নি। আমার মনে শ্রী সাইবাবার, যার বিষয় ফকির আমায় বলেছিলেন, দর্শন করার তীব্র উৎকণ্ঠা জাগল। আমার পরে মনে হয় যে যে ফকিরটি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন তিনি সাই বাবা ছাড়া আর কেউ নন। যিনি আমায় কৃপা করে দর্শন দেন এবং আমায় এই ভাবে সাহায্য করেন, তাঁর ৩৫ টাকার প্রতি লোভ কিভাবে থাকতে পারে? বরং তিনি আমাদের পরমার্থ লাভের পথে পরিচালিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

"হারানো টাকা ফিরে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাই। কুলাবাতে এক রাতে স্বপ্নে সেই ফকিরকে দেখি। তখনই আমার শিরডী যাওয়ার সংকল্পের কথা মনে পড়ে। আমি গোয়া পৌঁছই এবং সেখানে থেকে স্টীমারে চড়ে বম্বে হয়ে শিরডী যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গিয়ে দেখি স্টীমারে খুব ভীড় - জায়গা নেই। ক্যাপ্টেন আমায় অনুমতি দেন না। কিন্তু এক অপরিচিত চাপরাশীর বলাতে আমি স্টীমারে বসার অনুমতি পাই এবং এই ভাবে বম্বে পৌঁছই। বাবা যে সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ এ বিষয়ে আমার কোন প্রমাণের দরকার নেই। দেখোতো, আমরা কেই বা এবং কোথায় আমাদের বাড়ী? আমাদের কত সৌভাগ্য যে বাবা আমাদের হারানো টাকা ফেরত পাইয়ে এখান অবধি টেনে আনলেন। **(আপনারা) শিরডী বাসীরা আমাদের চেয়ে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ও ভাগ্যবান। আপনারা বাবার সঙ্গে হাসেন, খেলেন মধুর ভাষণ করেন এবং কত বছর ধরে তাঁর সঙ্গে থাকছেন। আপনাদের গত জন্মের অশেষ পূর্ণ সঞ্চয়ের প্রভাবই বাবাকে এখানে টেনে এনেছে।**

শ্রী সাই-ই আমাদের দত্তাত্রেয়। তিনিই আমাদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান এবং জাহাজে স্থান পাওয়ান। তারপর আমাদের এখানে এনে নিজের সর্ব্বব্যাপকতার ও সর্বজ্ঞতার অনুভূতি দেন।"

শ্রীমতী ঔরাঙ্গাবাদকর ঃ-

সোলাপুরের সখারাম ঔরাঙ্গাবাদকরের স্ত্রীর ২৭ বছর অবধি কোন সন্তান হয়নি। সন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনেক দেবী দেবতার কাছে মানত্ করেন। কিন্তু তবুও ওঁর মনোস্কামনা পুরণ হয় না। তখন উনি একেবারে নিরাশ হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে নিজের সৎ-ছেলে শ্রী বিশ্বনাথকে নিয়ে শিরডী আসেন। সেখানে বাবার সেবায় দুমাস কাটান। যখনই উনি মস্‌জিদে যেতেন তখনই বাবাকে সবসময়ই ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে থাকতে দেখতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল বাবার সঙ্গে একান্তে দেখা করে সন্তান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থণা করবেন। কিন্তু কিছুতেই সেই সুযোগ আর হচ্ছিল না। শেষে শামাকে অনুরোধ করেন যে, "যখন বাবা একটু একান্তে থাকবেন সেই সময় আমার জন্য একটু প্রার্থনা করো।" শামা বলেন- "বাবার তো 'খোলা দরবার'। তবুও তোমার যদি তাই ইচ্ছে, আমি নিশ্চয় চেষ্টা করব। কিন্তু কর্মের ফল ঈশ্বরের হাতে ছাড়তে হবে। খাবার সময় তুমি মস্‌জিদের উঠানে নারকেল ও ধূপ নিয়ে বসো। আমি ইশারা করতেই উঠে দাঁড়িও।" একদিন খাবার খাওয়ার পর শামা যখন বাবার হাত গামছা দিয়ে পুছে দিচ্ছিলেন, সেই সময় বাবা ওঁর গালে চিমটি কাটেন। তখন শামা এটকু রেগে বলেন, "দেব! এ কি? এমনি করে আমার গালে চিমটি কাটাটা কি তোমার উচিত? এই ধরনের দুষ্টু স্বভাবের দেবতার আমাদের একেবারেই দরকার নেই। আমরা তোমার উপর আশ্রিত। তবে কি আমাদের ঘনিষ্ঠতার এই ফল?" বাবা বলেন- "আরে, তুই গত ৭২ জন্ম থেকে আমার সঙ্গে আছিস। আমি এর আগে তোকে কখনো চিমটি কাটিনি। তুই আমার স্পর্শে রেগে উঠছিস্ কেন?" শামা বলেন- "আমাদের তো এমন দেব চাই যে আমাদের সব সময় আদর করবে এবং নিত্য নতুন ভালো-ভালো জিনিষ খাওয়াবে। আমরা তোমার কাছে তো কোন সম্মান চাইছিনা, স্বর্গ ইত্যাদির সুখও চাই না। আমাদের ভক্তি-বিশ্বাসটুকু সর্বদা তোমার চরণে জাগ্রত থাকুক, এই চাই।" তখন বাবা বলেন- "হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। সেই জন্যই তো এসেছি। আমি জন্ম-জন্মান্তর থেকে তোর ভরন-পোষন করছি, তাই তোকে বেশী স্নেহ করি।"

বাবা নিজের গদির উপর বসতেই শামা ঐ স্ত্রীটিকে ইঙ্গিত করেন। ও উপরে এসে বাবাকে প্রণাম করে তাঁকে নারকেল ও ধূপ অর্পণ করে। বাবা নারকেলটি নাড়িয়ে

দেখেন ও শামাকে বলেন- "এটা তো ভেতরে নড়ছে। শোন্ তো কি বলছে?" শামা বলেন- "এই 'বাঈ' প্রার্থণা করছে যে ঠিক এই রকম এঁর পেটেও যেন একটি সন্তান গুড়গুড় করে। তাই ওঁকে আশীর্বাদ করে এই নারকেলটি ফিরিয়ে দাও।" তখন আবার বাবা বলেন- "নারকেল দিলে কি কখনো বাচ্চা হয়? লোকেদের কিসব মূর্খের মত ধারণা?" শামা বলেন- "আমি খুব ভালোভাবে তোমার কথা ও আশীষের শক্তির সাথে পরিচিত। তোমার একটা শব্দতেই এই বাঈয়ের পর পর ছেলে হতে শুরু করবে। তুমি কেবল কথা এড়াতে চাইছো, আশীর্বাদ দিচ্ছ না।" এই ভাবে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। বাবা বারবার নারকেলটা ভেঙ্গে ফেলতে বলছিলেন, কিন্তু শামার এই জেদ- 'এটা বাঈকে ফেরত দিন।' শেষে বাবাকে বলতেই হয়, "এঁর সন্তান হবে।" তখন শামা জিজ্ঞাসা করেন- "কতদিনের মধ্যে?" বাবা উত্তর দেন- "এক বছরের মধ্যে।" এবার নারকেলটা ভেঙ্গে তার দুটো টুকরো করা হলো। একটা ভাগ তাঁরা দুজনে খেলেন এবং অন্য ভাগটি ঐ স্ত্রীটিকে দিলেন। তখন শামা ঐ মহিলাটিকে বলেন- "প্রিয় বোন! তুমি আমার প্রতিজ্ঞার সাক্ষী। যদি ১২ মাসের মধ্যে তোমার সন্তান না হয় তাহলে আমি এই দেবের মাথার উপর নারকেল ভেঙ্গে তাঁকে এই মস্‌জিদ থেকে বার করে দেব। যদি তা না করতে পারি তাহলে আমার নাম 'মাধব' নয়। আমি যা-যা বললাম তার অর্থ তুমি খুব শীঘ্রই বুঝতে পারবে।"

এক বছরের মধ্যেই মহিলাটি পুত্ররত্ন প্রাপ্ত করেন। পাঁচ মাসের বালককে নিয়ে নিজের স্বামীর সঙ্গে বাবার শ্রী চরণে উপস্থিত হন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাবাকে প্রণাম করেন এবং কৃতজ্ঞ পিতা (শ্রীমান ঔরাঙ্গাবাদকর) পাঁচশো টাকা বাবাকে অর্পণ করেন। এই টাকাটি শ্যামকর্ণের (বাবার ঘোড়া) ঘরের ছাদ তৈরী করার কাজে লাগে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৩৭

চাওড়ী সমারোহ

এই অধ্যায়ের শুরুতে বেদান্তের কোন কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে হেমাডপন্ত 'চাওড়ী'র অপূর্ব সমারোহ বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

ধন্য শ্রীসাই, যাঁর যেমন জীবন তেমনি অবর্ণনীয় লীলাবিলাস এবং অদ্ভুত কার্য্যকলাপে ভরা তাঁর দৈনিক কর্মসূচী। কখন তো তাঁকে সমস্ত সাংসারিক কর্ম থেকে অলিপ্ত থেকে কর্মকাণ্ডীর ন্যায় মনে হত। আবার কখনো তিনি ব্রহ্মানন্দে ও আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন থাকতেন। যদিও কখনো-কখনো তাঁকে দেখে পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মনে হত, তবুও তিনি অলস ছিলেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় সর্বদা গম্ভীর, শান্ত ও স্থির থাকতেন। তাঁর প্রকৃতি বা স্বভাব বর্ণনা করা আমাদের সামর্থের অতীত। তিনি পুরুষদের ভাই-য়ের মতো এবং নারীদের মা-য়ের বা বোন-য়ের মতো দেখতেন। সকলেই জানে তিনি ছিলেন চিরকুমার ও প্রকৃত ব্রহ্মচারী। তাঁর সঙ্গতিতে আমরা যে অনুপম জ্ঞান উপলব্ধি করেছি তার বিস্মৃতি মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন না হয়- তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই বিনম্র প্রার্থনা। প্রতিটি জীবের মধ্যে তাঁকে দর্শন করে, নাম স্মরণের রসানুভূতিতে নিমগ্ন হয়ে যেন তাঁর মোহবিনাশক চরণের অনন্যরূপে সেবা করতে পারি, এই আমাদের আকাঙ্খা। হেমাডপন্ত নিজের মত অনুসারে বেদান্তের বিবরণ দিয়ে 'চাওড়ী' সমারোহ বর্ণনা করেছেন।

চাওড়ী সমারোহ ঃ-

বাবার শয়নকক্ষের বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। তিনি একদিন মস্‌জিদে ও পরের দিন 'চাওড়ী'তে শুতেন। এইরকম ব্যবস্থা তাঁর মহাসমাধি পর্যন্ত চলে। 'চাওড়ী'তে নিয়মিত রূপে ভক্তরা তাঁর পূজা-অর্চনা ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০৯ সাল থেকে শুরু করে দিয়েছিল। এবার তাঁর শ্রীচরণের ধ্যান করে আমরা 'চাওড়ী' সমারোহ বর্ণনা শুরু করব। এত মনোহর ছিল সেই দৃশ্য যে ভক্তরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। বোধশক্তি হারিয়ে এই কামনাই করত যে সেই দৃশ্য যেন কখনো তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়।

'চাওড়ী'তে বিশ্রাম করার পালা এলে সেই রাত্রিতে ভক্তদের দল মস্‌জিদের সভা-মণ্ডপে জমায়েত হয়ে ঘন্টার-পর-ঘন্টা ভজন করত। সেখানেই একদিকে সুসজ্জিত রথ রাখা থাকত এবং অন্য দিকে তুলসী বৃন্দাবন। রসিক ভক্তরা সভা-মণ্ডপে করতাল, মৃদঙ্গ, কানজিরা, ঢোল ইত্যাদি নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ভজন শুরু করে দিত। এই সব ভজনান্দী ভক্তদের চুম্বকের মত আকর্ষিত শ্রীসাই বাবাই করতেন।

মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে দেখো ভক্তরা কত উৎসাহের সাথে নানা রকমের মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন করতে ব্যস্ত। কেউ প্রদীপ জ্বালাচ্ছে ত কেউ পাল্কি এবং রথ সাজাচ্ছে। শ্রীসাই বাবার জয় জয়কার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রদীপের আলোতে ঝলমলে মস্‌জিদকে দেখে এমন মনে হচ্ছে যেন মঙ্গলকারিনী দীপাবলী স্বয়ং শিরডীতে বিরাজমান। মস্‌জিদের বাইরে দৃষ্টিপাত্ করলে দেখা যাবে যে দ্বারে শ্রীসাই বাবার ঘোড়া শ্যামসুন্দর পূর্ণ সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে শ্রী সাইবাবা চুপ করে নিজের গদিতে বসে আছেন। এমন সময় ভক্তদের সাথে তাত্‌য়া পাটীল এসে বাবাকে তৈরী হয়ে নিতে বলেন। তাঁকে বাহুমূলে ধরে উঠতে সাহায্য করেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তাত্‌য়া বাবাকে 'মামা' বলে ডাকতেন। বাবা কফ্‌নী পড়ে, বগলে ছোট লাঠিটা দাবিয়ে, ছিলিম ও তামাক নিয়ে কাঁধে একটা কাপড় রেখে প্রস্থান করার জন্য প্র[illegible] হলেন। তখন তাত্‌য়া পাটীল তাঁর কাঁধে একটা সোনালী জরির শাল রাখেন। এরপর বাবা ধুনি প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য নিজে তাতে কিছু কাঠ ঢেলে ধুনির কাছে রাখা প্রদীপটি হাত দিয়ে নিভিয়ে 'চাওড়ী' অভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে-সঙ্গেই নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু করে। নানা রঙের আতশবাজী শুরু হয়। স্ত্রী-পুরুষেরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাঁর কীর্তির ভজন গাইতে-গাইতে তাঁর সামনে-সামনে চলছে। কেউ আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করছে তো কেউ অনেক রকমের পতাকা ও নিশান নিয়ে চলেছে। যেই বাবা মস্‌জিদের সিঁড়িতে চরণ রাখেন, অমনি খালদাররা খুব উচ্চ স্বরে তাঁর প্রস্থান ঘোষণা করে। দুদিক দিয়ে লোকে চামর দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছে। এরপর রাস্তার উপর দূর অবধি বেছানো কাপড়ের উপর দিয়ে সমারোহ এগোতে লাগল। তাত্‌য়া পাটীল বাবার বাঁ হাত এবং মহালসাপতি ডান হাত ধরে আছেন। বাপুসাহেব যোগ ছাতা নিয়ে চলছেন। এঁদের সামনে পূর্ণ সুসজ্জিত অশ্ব শ্যামসুন্দর চলেছে। পেছনে ভজন মণ্ডলী ও ভক্তদের সমূহ বাদ্যধ্বনির সাথে সমস্বরে হরি ও সাইনাম করতে-করতে এগিয়ে চলেছে। এবার সমারোহ 'চাওড়ী'র কোণে এসে পৌঁছেছে। সবাই যেন এক অপার আনন্দ ও ঘন স্বর্গসুখে ডুবে আছে। বাবা যখন 'চাওড়ী'র সামনে এসে দাঁড়ান তখন তাঁর মুখের দিব্যপ্রভা বড়ই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যেন অরুণোদয়ের সময়

উজ্জ্বল রশ্মির ছটা ছড়িয়ে আছে। উত্তরের দিকে মুখ করে তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তিনি কারো আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। বাদ্যযন্ত্র আগের মতই বেজে চলেছে এবং এই সময় কাকাসাহেব দীক্ষিত আবীরের বর্ষা করলেন। বাবার মুখমণ্ডলে এমন অপূর্ব রক্তিম আভা জ্বলজ্বল করে ওঠে যে তা দেখে ভক্তদের হৃদয় উল্লসিত হয়ে উঠল। এই মনোহর দৃশ্য ও উৎসবের বর্ণনা শব্দে করার সামর্থ আমার নেই। ভাবে বিভোর হয়ে ভগত মহালসাপতিও নাচছেন। দিয়েছেন। কিন্তু বাবার অটুট একাগ্রতা দেখে সবাই হতবাক। এক হাতে লণ্ঠন নিয়ে তাত্য়া পাটীল বাবার বাঁ দিকে এবং অলংকার ইত্যাদি নিয়ে মহালসাপতি ডান দিকে রয়েছেন। দেখো তো, কি অপরূপ এই সমারোহের শোভা! এই দৃশ্যের ক্ষণিক দর্শন পাওয়ার জন্য সহস্র নর-নারী, ধনী-দরিদ্র সেখানে জমায়েত হয়েছে। এবার বাবা ধীরে-ধীরে হাঁটতে শুরু করেন। চারিদিকের সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডল আনন্দে দুলছে। এই ভাবে সমারোহ 'চাওড়ী' পৌছয়। ভবিষ্যতে আর এই দৃশ্য কেউ দেখতে পাবে না। এখন তো শুধু সেটি মনে করে চোখে সেই মনোরম অতীত কল্পনা করে নিজের হৃদয়ের ব্যাকুলতা শান্ত করতে হবে। 'চাওড়ী' কে সুন্দর-সুন্দর কাঁচ এবং গ্যাস লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হয়েছে। 'চাওড়ী'তে পৌঁছতেই তাত্য়া পাটীল এগিয়ে গিয়ে আসন বিছিয়ে বালিশে ঠেসান দিয়ে বাবাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে একটা ভালো চাপকান পরিয়ে ভক্তরা নানা ভাবে তাঁর পূজো শুরু করে। বাবাকে সোনার মুকুট পরিয়ে ফুল ও মণি-মুক্তার হার তাঁর গলায় পরায়। তারপর কপালে কুমকুমের বৈষ্ণবী তিলক এবং তারমধ্যে গোল টিপ লাগিয়ে অনেকক্ষণ অপলক তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাঁর মাথার কাপড়টা বদলে দেওয়া হয়। খানিকক্ষণ সেটা উপরেই ধরে রাখা হয় - সবার ভয় যে বাবা সেটা ফেলে না দেন। কিন্তু বাবা তো অন্তর্যামী। তিনি ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে তাদের এই সব কর্মকাণ্ড মাথা পেতে মেনে নিচ্ছিলেন। সেই সব আভূষণে সুসজ্জিত হওয়ার পর তো বাবার শোভা অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

নানাসাহেব নিমোনকর একটি বড়, সুন্দর ঝালোরযুক্ত ছাতা মাথার উপর ঘোরাচ্ছিলেন। বাপুসাহেব যোগ রূপোর এক সুন্দর থালাতে বাবার পাদপ্রক্ষালন করেন এবং অর্ঘ্য অর্পণ করার পর রীতিসম্মতভাবে তাঁর পূজো-অর্চনা করেন। তাঁর হাতে চন্দন লাগিয়ে একটা পান দেন। তাত্য়া পাটীল ও অন্যান্য ভক্তরা তাঁর শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়লেন। দুদিক দিয়ে ভক্তরা চামর ও পাখা দোলাচ্ছে। শামা ছিলিম তৈরী করে তাত্য়া পাটীলকে দেন। উনি সেটি ভালো করে জ্বালিয়ে বাবার কাছে দিলেন। বাবার ছিলিম টানা শেষ হলে সেটা ভগত্ মহালসাপতিকে এবং তারপর বাকি ভক্তদের দেওয়া হয়। ধন্য সেই

নির্জীব ছিলিম। কি মহান তার তপস্যা! কুমোরের চাকায় ঘুরে, রোদ্দুরে শুকিয়ে, তারপর আগুনে পুড়ে- কতই না কৃচ্ছ্রসাধনের পরীক্ষা তাকে দিতে হয়েছে। তবে গিয়ে সে বাবার কর স্পর্শ ও চুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করে। এই সব হয়ে যাওয়ার পর ভক্তরা বাবাকে ফুলের মালা দিয়ে বোঝাই করে ফুলের তোড়াও উপহার দেয়। বাবা তো বৈরাগ্যের পূর্ণ অবতার ছিলেন, সেই হীরে-পান্না ও ফুলের হার বা এই ধরনের সাজ-গোজে তাঁর কোন আকর্ষণ বা রুচি থাকতে পারে কি? কিন্তু ভক্তদের ভাব ও আন্তরিক প্রেমের টানে, তারা যাতে খুশি হয়, তিনি কোন আপত্তি করলেন না। সব শেষে মাঙ্গলিক স্বরে বাদ্যযন্ত্র বাজতে শুরু হয় এবং বাপুসাহেব যোগ বাবার যথাবিধি আরতি করেন। আরতি শেষ হতেই ভক্তরা বাবাকে প্রণাম করে একে-একে বিদায় নিল। এবার তাত্য়া বাবাকে ছিলিম পান করিয়ে, গোলাপজল, আতর ইত্যাদি লাগিয়ে একটা গোলাপ ফুল দিলেন। তিনি যখন বিদায় নিতে গেলেন তখন বাবা ভালবেসে বলেন- "তাত্য়া, আমার দেখা-শোনা ভালোভাবে করো। তুমি বাড়ী যেতে চাও, যাও। কিন্তু রাত্তিরে মাঝে-মধ্যে এসে আমায় একটু দেখে যেও।" তাত্য়া সে কথার আশ্বাস দিয়ে বাড়ী ফিরে যান। তারপর বাবা অনেকগুলো চাদর বিছিয়ে নিজের বিছানা তৈরি করে বিশ্রাম নিলেন।

এবার আমরাও এখানে বিশ্রাম নেব এবং এই অধ্যায়টি শেষ করে পাঠকদের কাছে একটি অনুরোধ জানাই- তাঁরা যেন প্রতিদিন শয্যা গ্রহণের পূর্বে সাইবাবা ও তাঁর 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা স্মরণ করেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩৮

বাবার হাঁড়ি, দেবমূর্তির উপেক্ষা, নৈবেদ্য বিতরণ, ঘোলের প্রসাদ।

গত অধ্যায়ে চাওড়ী সমারোহ বর্ণনা করা হয়েছিল। এবার এই অধ্যায়ে বাবার খাবার তৈরি করার হাঁড়ি ও কয়েকটি অন্য বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে সদগুরু সাই! তুমি ধন্য! তোমাকে আমরা প্রণাম করি। তুমিই সমগ্র বিশ্বকে সুখ দিয়েছ এবং ভক্তদের মঙ্গল করেছ। তোমার হৃদয় উদার। যে ভক্তরা তোমার অভয় চরণকমলে নিজেদের সমর্পিত করে দেয়, তুমি তাদের সর্বদা রক্ষা এবং উদ্ধার করো। ভক্তদের কল্যাণ ও পরিত্রাণ নিমিত্তেই তোমার এই পৃথিবীতে অবতারণা হয়েছে। ব্রহ্মের ছাঁচে শুদ্ধ আত্মারূপী দ্রব্য ঢালা হয় এবং তার থেকে যে মূর্তি বেরোয় সেইটিই সন্তচূড়ামণি শ্রী সাইবাবা। তিনি স্বয়ং 'আত্মারাম", চির আনন্দধাম। এই জীবনের সমস্ত কার্য্যকলাপ নশ্বর জেনে তিনি ভক্তদের নিষ্কাম ও মুক্ত করেছেন।

বাবার হাঁড়ি ঃ-

মানব ধর্ম শাস্ত্রে বিভিন্ন যুগ অনুসারে বিভিন্ন সাধনা উল্লেখ করা হয়েছে। **সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানের বিশেষ মাহাত্ম্য বলা হয়। সব রকমের দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ মানা হয়।** দুপুরবেলা খাবার না পেয়ে আমরা সহজেই বিচলিত হয়ে উঠি। এমনিই অবস্থা অন্যান্য প্রাণীদেরও হয়। তাই কোন ভিক্ষুক বা ক্ষুধার্তকে যে খাবার দেয়, সেই শ্রেষ্ঠ দানী। তৈত্তিরীয় উপনিষদে লেখা আছে- "অন্নই ব্রহ্ম এবং তার থেকেই সব প্রাণীদের উৎপত্তি। তার সাহায্যেই সবাই জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পর তাতেই লয় হয়।" কোন অতিথি দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে আসলে আমাদের এটাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে খেতে অনুরোধ করি। অন্যান্য দান যেমন ধন, ভূমি, বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়ার সময় পাত্রতা বিচার করতে হয়। কিন্তু অন্ন দানের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। দুপুরবেলা যে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায় তাকে শীঘ্র ভোজন করানো

আমাদের পরম কর্তব্য। প্রথমে পঙ্গু, অন্ধ বা রুগ্ন ভিখিরিদের, তারপর শক্ত-সমর্থ লোকেদের এবং এদের সবার পরে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের পরিবেশন করাটাই উচিত। বাকী সবার চেয়ে পঙ্গুদের খাওয়ানোর মাহাত্ম্য বেশী। অন্নদান ছাড়া অন্য সব প্রকারের দান তেমনি অসম্পূর্ণ যেমন চাঁদ ছাড়া তারা, কলশ ছাড়া মন্দির, পদ্মফুলহীন পুকুর, ভক্তিরহিত ভজন, সিঁদূরবিহীন সধবা, মধুরস্বরহীন গান, নুন ছাড়া খাবার। যেমন অন্যান্য খাদ্য পদার্থের মধ্যে ডাল উত্তম মানা হয় তেমনিই সমস্ত দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ। এবার দেখা যাক্ বাবা কি ভাবে খাবার তৈরী করে সেটা বিতরণ করাতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাবা অল্পাহারী ছিলেন। একটু-আধটু যা খেতেন, সেটা তিনি দু-একটা বাড়ী থেকে যা ভিক্ষে পেতেন, তাতেই পুরো হয়ে যেতো। কিন্তু যখন তাঁর সব ভক্তদের খাবার খাওয়াবার ইচ্ছে হত তখন শুরু থেকে নিয়ে শেষ অবধি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতেন। তিনি কারো উপর নির্ভর করতেন না আর কাউকে এ বিষয়ে কষ্টও দিতেন না। এমন কি পেষার কাজও তিনি নিজেই করতেন। প্রথমে নিজে বাজার গিয়ে সব জিনিষ যেমন ডাল, চাল, আটা, নুন লঙ্কা, জীরে, নারকেল এবং অন্যান্য মশলা নগদ দাম দিয়ে কিনে আনতেন। মস্‌জিদের খোলা উঠোনে উনুন বানিয়ে (চুলা) তাতে আগুন ধরাতেন। হাঁড়িতে ঠিক পরিমাণে জল ভরতেন। দুটো হাঁড়ি ছিল। একটা ছোট ও অন্যটা বড়। একটাতে একশো ও অন্যটাতে পাঁচশো লোকের খাবার তৈরী হত। কখনো তিনি মিষ্টি পোলাও বানাতেন ও কখনো মাংস মেশানো পোলাও (নান্‌তা পোলাও)। কখনো-কখনো ডালও বানাতেন। শিলে মিহি করে মশলা পিষে হাঁড়িতে ঢালতেন। খাবার যাতে সুস্বাদু হয় সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। জোওয়ারের আটার জলে অম্বল তৈরী করে খাবারের সময় ভক্তদের সমান মাত্রায় পরিবেশন করতেন। খাবার ঠিক তৈরী হয়েছে কিনা সেটা দেখবার জন্য নিজের কফ্‌নীর আস্তিন গুটিয়ে নির্ভয়ে ফুটন্ত হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করতেন। এতে তাঁর হাতে কোন পোড়ার দাগ বা ফোস্‌কা পড়ত না আর মুখেও কোন ব্যথার চিহ্ন দেখা যেতো না। খাবার তৈরী হয়ে গেলে মস্‌জিদ থেকে পাত্র আনিয়ে মৌলবীকে 'ফাতিহা' পড়তে বলতেন। তারপর তিনি মহালসাপতি ও তাত্‌য়া পাটীলের প্রসাদের ভাগ আলাদা রেখে বাকীটা গরীব ও অনাথ লোকেদের খাইয়ে তাদের তৃপ্ত করতেন। সত্যি ওরা ধন্য। বাবার তৈরী করা সেই খাবার তাঁরই হাতে যাঁরা খেতে পেয়েছিলেন তাঁরা সত্যিই ধন্য ও ভাগ্যবান। এবার অনেকে ভাবতে পারে যে তিনি কি নিরামিষ এবং আমিষ খাদ্য পদার্থর প্রসাদ হিসেবে একই সঙ্গে বিতরণ করতেন? এর উত্তর একদম সরল ও সোজা। যারা আমিষ খেত তাদের

হাঁড়ি থেকেই প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হত এবং অন্যদের সেটা স্পর্শও করতে দিতেন না। তিনি কাউকে কখনো আমিষ খাবার খেতে উৎসাহিত করেননি এবং তাঁর কখনোই এই ইচ্ছে ছিল না যে এটা কারো অভ্যাস হয়ে দাঁড়াক। এটা একটা খুব পুরনো নিয়ম যে যখন গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন তখন যদি শিষ্য সেটা গ্রহন করতে সন্দেহ বা দ্বিধা বোধ করে তাহলে তাঁর অধঃপতন ঘটে। এই নীতি ভক্তরা কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছে তা জানবার জন্য বাবা মাঝে-মাঝে পরীক্ষা করতেন। একবার একাদশীর দিন তিনি দাদা কেলকরকে কিছু টাকা দিয়ে মাংস কিনে আনতে বলেন। দাদা কেলকর ছিলেন প্রকৃত কর্মকাণ্ডী এবং প্রায় সব নিয়মগুলিই পালন করতেন। ওঁর এই দৃঢ় মত ছিল যে দ্রব্য, অন্ন এবং বস্ত্র ইত্যাদি গুরুকে অর্পণ করা পর্যাপ্ত নয়। তাঁর আদেশ শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করলেই তিনি প্রসন্ন হন। এটাই তাঁর দক্ষিণা। দাদা তক্ষুনি কাপড় পরে একটা থলে নিয়ে বাজার যেতে উদ্যত হন। তখন বাবা ওঁকে ফেরত ডেকে বলেন- "তুমি যেও না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও।" তখন দাদা নিজের চাকর পাণ্ডুকে পাঠান। ওকে যেতে দেখে বাবা ওকেও ফেরত ডেকে এই কাজটা স্থগিত করে দেন।

আরেকবার তিনি দাদাকে বলেন- "দেখো তো নোনতা পোলাও-য়ের স্বাদটা ঠিক আছে কি না।" দাদা না দেখেই বলেন- "ভালো, ঠিক আছে।" তখন বাবা ওকে বলেন- "তুমি ত ভালো করে চোখ দিয়ে দেখলে না, জিভ দিয়ে একটু চাখলেও না। তাহলে কি করে বলছ যে খুব ভালো হয়েছে? একটু ঢাকনাটা সরিয়ে দেখো।" বাবা দাদার হাত ধরে জোর করে পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে বলেন- "নিজের গোঁড়ামি ছেড়ে একটু চেখে দেখো।" যখন মায়ের প্রকৃত প্রেম সন্তানের উপর উপছে পড়ে তখন মা তাকে চিমটিও কাটেন। কিন্তু সন্তানের চেঁচান বা কান্না দেখে শুনে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এই ভাবেই বাবা সাত্বিক মাতৃ-প্রেমের বশীভূত হয়েই দাদার এইরূপ হাত ধরেন। কোন সন্ত বা গুরু নিজের কর্মকাণ্ডী শিষ্যকে বর্জিত ভোজনের জন্য আগ্রহ করে নিজের অপকীর্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন না।

এইভাবে এই হাঁড়ির পরম্পরা ১৯১০ সাল পর্যন্ত চলে এবং তারপর বন্ধ হয়ে যায়। একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে দাসগণু নিজের কীর্তনের মাধ্যমে সমস্ত বম্বে প্রদেশে বাবার কীর্তি দূরদূরান্তে প্রচার করেন। তাই এই প্রান্ত থেকে লোকেদের দল শিরডী আসতে শুরু করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই শিরডী পবিত্র তীর্থস্থলে পরিণত হয়। ভক্তরা নৈবেদ্য রূপে বাবার জন্য নানা রকমের সুস্বাদু ব্যঞ্জন আনত। সেগুলি

এত বেশী মাত্রায় জড়ো হয়ে যেত যে ফকিরদের ও ভিখিরীদের পেট ভরে খাওয়ানোর পরও বেঁচে যেত। নৈবেদ্য বিতরণের বিধি বর্ণনা করার আগে আমরা নানাসাহেব চাঁদোরকরের ঐ কথাটি বর্ণনা করব যেটি স্থানীয় দেবী-দেবতাদের ও মূর্তির প্রতি বাবার সম্মান -ভাবনার দ্যোতক।

নানাসাহেব দ্বারা দেবমূর্তির উপেক্ষা ঃ-

কিছু লোক নিজেদের কল্পনা অনুসারে বাবাকে ব্রাহ্মণ এবং কিছু তাঁকে মুসলমান বলে মানতো। কিন্তু আসলে তাঁর কোন জাতি ছিল না। তাঁর এবং ঈশ্বরের কেবল একটাই জাতি। কেউই নিশ্চিত রূপে এটা জানতে পারেনি যে তিনি কোন কুলে জন্মান এবং তাঁর মা-বাবা কে ছিলেন? তবে তাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলে কি করে ঘোষণা করা যেতে পারে? যদি তাঁকে মুসলমান বলা হয় তাহলে মস্‌জিদে সব সময় 'ধুনি' এবং তুলসী বৃন্দাবন কেন রাখতেন এবং শঙ্খ, ঘন্টা ও অন্য বাদ্যযন্ত্র কেনই বা বাজতে দিতেন? হিন্দুদের বিভিন্ন রকমের পূজো কেন স্বীকার করতেন? যদি সত্যি তিনি মুসলমান ছিলেন তাহলে ওঁর কানে ফুটো কেন ছিল এবং হিন্দু মন্দিরগুলির জীর্ণতা সংস্কার কেন করিয়ে ছিলেন? তিনি হিন্দুদের মূর্তি পূজো বা দেবী-দেবতাদের এতটুকু উপেক্ষা কখনো সহ্য করেন নি।

একবার নানাসাহেব চাঁদোরকর নিজের ভায়রা ভাই শ্রী বিণীবলের সাথে শিরডী আসেন। যখন তাঁরা মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন, বাবা কথা বলতে বলতে হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেন- "তুমি দীর্ঘকাল থেকে আমার সঙ্গে রয়েছো, তবে এই ধরনের ব্যবহার কেন করো?" নানাসাহেব প্রথমে এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। অতএব বিনীতভাবে তাঁর অপরাধ বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুত্তরে বাবা বললেন- "তুমি কখন কোপরগ্রাম এলে এবং তারপর ওখান থেকে কেমন করে শিরডী পৌঁছলে?" নানাসাহেব নিজের ভুল অবিলম্বে বুঝতে পারেন। ওঁর একটা নিয়ম ছিল যে শিরডী আসার আগে উনি কোপরগ্রামে গোদাবরীর তীরে শ্রীদত্তাত্রেয়ের মন্দিরে পূজো করতেন। কিন্তু সেবার একটি বিশেষ কারণে, ঐ আত্মীয় দত্ত উপাসক হওয়া সত্ত্বেও- ওঁকে হতোৎসাহিত করে, দুজনে সোজা শিরডী এসে পৌঁছন। নিজের দোষ স্বীকার করে উনি বলেন- "গোদাবরীতে স্নান করার সময় পায়ে একটা বড় কাঁটা ফুঁটে যায়। খুব কষ্ট হচ্ছিল।" বাবা বললেন- "এটা তো তোমার ভুলের খুব ছোট্ট শাস্তি।" ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সজাগ থাকতে বাবা তাঁকে সাবধান করেন।

নৈবেদ্য বিতরণ ঃ-

এবার আমরা নৈবেদ্য বিতরণের দৃশ্য বর্ণনা করব। আরতি শেষ হওয়ার পর বাবার আশীর্বাদ ও উদী নিয়ে যখন ভক্তরা নিজের-নিজের বাড়ী চলে যেত তখন বাবা পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে খাবার খাওয়ার জন্য আসন গ্রহণ করতেন। ভক্তদের দুটো সারি ওঁর কাছে বসত। যারা নৈবেদ্য নিয়ে আসত তারা নানা প্রকারের খাবার যেমন- লুচি, পেঁড়া, বর্ফী, ভাত ইত্যাদি থালায় সাজিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিত। তারপর বাইরেই প্রতীক্ষা করত প্রসাদের জন্য। সমস্ত রকম খাবার একসঙ্গে মিশিয়ে বাবার সামনে রাখা হত। বাবা সম্পূর্ণটা ভগবানকে উৎসর্গ করে স্বয়ং গ্রহণ করতেন। তার থেকে খানিকটা বাইরে অপেক্ষামান ভক্তদের দিয়ে বাকীটা ভিতরের ভক্তদের পরিবেশন করা হতো। বাবা সবার মাঝে এসে বসলে ভক্তরা প্রাণ ভরে খেত। ভিতরের সবাইকে রোজ এই প্রসাদ পরিবেশন করে খাওয়ানোর ভার এবং তাদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব শামা ও নিমোনকরের উপর বাবা ন্যস্ত করেছিলেন। ওঁরা এই কাজটি বড় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে সম্পন্ন করতেন। এই ভাবে পাওয়া প্রত্যেক গ্রাস ভক্তদের দিত দৈহিক পুষ্টি ও মনের সন্তোষ। কত সুস্বাদু, পবিত্র ও প্রেমরসপূর্ণ ছিল সেই প্রসাদান্ন।

ঘোলের প্রসাদ ঃ-

এই সৎসঙ্গে বসে একবার যখন হেমাডপন্ত পেট ভরে খাবার খেয়ে নিয়েছেন সেই সময় বাবা ওঁকে এক পেয়ালা ঘোল খেতে দেন। তার সাদা রঙ ওঁকে প্রফুল্লিত করে, কিন্তু পেটে এতটুকু জায়গা ছিল না। তাই কেবল এক চুমুক খেয়ে দেখলেন। ওঁর এই ধরনের উপেক্ষা দেখে বাবা বলেন- "সবটা খেয়ে নাও। এর পর এই সুযোগ আর আসবে না।" তখন উনি পুরো ঘোলটা খেয়ে নেন। হেমাডপন্ত বাবার সাংকেতিক নির্দেশের অর্থ শীঘ্রই বুঝতে পারেন! কারণ এই ঘটনার কিছুদিন পরই বাবা সমাধিস্থ হন। পাঠকবৃন্দ! আমাদের হেমাডপন্তের প্রতি নিশ্চয় কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। তিনি এক পেয়ালা ঘোলই পান করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তে আমাদের জন্য রেখে গেছেন বাবার লীলামৃত- যা পেয়ালার পর পেয়ালা পান করেও শেষ হয় না।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৩৯

বাবার গীতা-শ্লোক ব্যাখ্যা, সমাধি মন্দির নির্মাণ।

এই অধ্যায়তে বাবা গীতার একটা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়েছেন। কিছু লোকেদের এই ধারণা ছিল যে বাবা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না এবং নানাসাহেবও তাই ভাবতেন। হেমাডপন্ত মূল মারাঠী গ্রন্থের অধ্যায় ৫০ তে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছেন। অধ্যায় ৩৯ ও ৫০ এর বিষয়বস্তু একরকম হওয়ার দরুণ এখানে সে দুটি সম্মিলিত ভাবে দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

শিরড়ীর সৌভাগ্যের বর্ণনা কে করতে পারে? দ্বারকামাঈও ধন্য যেখানে শ্রীসাই এসে থাকেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

শিরডীর স্ত্রী পুরুষও ধন্য, যাদের অনুগৃহীত করে সাই এতদূর তাদের গ্রামে এসে সেখানে বসবাস করেন। শিরডী আগে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। কিন্তু শ্রী সাইয়ের সংস্পর্শে এসে তার গুরুত্ব গেল বেড়ে এবং সেটি তীর্থস্থলে পরিণত হল।

শিরড়ীর মেয়েরাও পরম ভাগ্যবতী। বাবার প্রতি ওদের অসীম ও অচল ভক্তি-প্রেম প্রশংসার অতীত। সারাদিন ঘরে-বাইরের কাজকর্ম করতে- করতে ওরা বাবার কীর্তির গুণগান করত। ওদের ভালবাসার উপমাই বা কি হতে পারে? কি মধুরই না ছিল সেই নামগান যা গায়ক ও শ্রোতাদের মনে নিবিড় শান্তি এনে দিত।

বাবার দ্বারা টীকা ঃ-

কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে বাবা সংস্কৃতও জানেন। একদিন নানাসাহেব চাঁদোরকরকে গীতার একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়ে তিনি লোকেদের হতভম্ব করে দেন। এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রী বি. ভি. দেব মারাঠী সাই লীলা পত্রিকা ৪ তে ছাপান। অন্যটি Sai Baba`s Charters and Sayings পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠে ও The Wonderous Saint Sai Baba পুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৬ তে দেওয়া আছে।

এই দুটি পুস্তকই শ্রী বি. ভি. নরসিংহ স্বামী দ্বারা রচিত। শ্রী বি. ভি. দেব ইংরাজী তারিখ ২৭-৯-১৯১৬ একটা বক্তব্য দেন যেটি শ্রী নরসিংহ স্বামী দ্বারা রচিত পুস্তক 'ভক্তো কে অনুভব' (ভক্তদের অভিজ্ঞতা) এ ছাপা হয়। শ্রী দেব এই বিষয়ে প্রথম বিবরণ নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছে পান। তাই তাঁর কথা নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে-

নানাসাহেব চাঁদোরকর বেদান্তের ভালো ছাত্র এবং অনুরাগী ছিলেন। তিনি টীকা সহিত গীতার অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে খানিকটা অহংকারও ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে বাবার সংস্কৃতের বা এ ধরনের শাস্ত্রের জ্ঞান নেই। বাবা তাঁর এই ভ্রম দূর করবেন বলে স্থির করেন। এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন অল্পসংখ্যক ভক্তরা শিরডী আসত। নানাসাহেব এই সময় বাবার চরণ সেবা করছিলেন এবং অস্পষ্ট শব্দে কিছু গুন গুন করছিলেন।

বাবা - নানা, তুমি ধীরে-ধীরে কি বলছ?

নানা - আমি গীতার একটি শ্লোক পাঠ করছি।

বাবা - কোন্ শ্লোকটা?

নানা - ভগবদ্‌গীতার একটা শ্লোক।

বাবা - একটু জোরে বলো।

তখন নানা ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪ তম শ্লোক পড়তে শুরু করেন-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

বাবা - তুমি এর অর্থ জানো?

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।

বাবা - তবে বলো তো।

নানা - এর অর্থ এই যে - তত্ত্বকে যাঁরা জানেন, সেই জ্ঞানী পুরুষদের প্রণাম করে তাঁদের সেবা করো ও নিষ্কপট ভাবে প্রশ্ন করে সেই 'জ্ঞান' অর্জন করো। তখন সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

বাবা - নানা, আমি এই ধরনের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ চাই না। আমায় প্রত্যেক শব্দের তার ভাষান্তরিত উচ্চারণের সঙ্গে ব্যাকরণসম্মত অর্থ বোঝাও।

এবার নানা এক-একটি শব্দের অর্থ বোঝাতে শুরু করেন।

বাবা - নানা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাটাই কি যথেষ্ট?

নানা - 'নমস্কার করা' ছাড়া আমি 'প্রণিপাত' শব্দের অন্য কোন অর্থ জানি না।

বাবা - 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের অর্থ কী?

নানা - ঐ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।

বাবা - যদি 'পরিপ্রশ্ন' এবং 'প্রশ্ন'-র অর্থ একই তাহলে ব্যাস 'পরি' উপসর্গ ব্যবহার করেন কেন? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়েছিল?

নানা - আমি ত 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের আর কোন অর্থ জানি না।

বাবা - সেবা? এখানে কোন ধরনের সেবার কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

নানা - এই- যে ধরনের সেবা আমরা আপনার করি।

বাবা - এই সেবা কি যথেষ্ট?

নানা - এ ছাড়া 'সেবা' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ আমার জানা নেই।

বাবা - পরের লাইনে 'উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম্', জ্ঞানম্ শব্দের জায়গায় তুমি অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে অর্থ বলতে পারো।

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা - কি শব্দ?

নানা - অজ্ঞানম্।

বাবা - 'জ্ঞানম্'-য়ের এর পরিবর্তে 'অজ্ঞানম্' বসালে কি এই শ্লোকের কোন অর্থ বেরোয়?

নানা - আজ্ঞে না, শঙ্কর ভাষ্যে এই ধরনের কোন ব্যাখ্যা নেই।

বাবা - নেই ত কি হলো? যদি 'অজ্ঞানম্' শব্দটি ব্যবহার করে যদি অর্থ আরো পরিষ্কার হয় তাহলে তাতে আপত্তিটা কি?

নানা - 'অজ্ঞানম্' শব্দটি বসিয়ে এর কি ভাবে অর্থ করা যায় আমি বুঝতে পারছি না।

বাবা - কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম করে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ও সেবা করতে উপদেশ দেন কেন? কৃষ্ণ স্বয়ং কি তত্ত্বদর্শী নন? বস্তুতঃ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ!

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি জ্ঞানাবতার ছিলেন। কিন্তু আমিও বুঝতে পারছি না যে কেন তিনি অর্জুনকে অন্য জ্ঞানীদের কাছে যেতে বললেন।

বাবা - তুমি কি সত্যি বুঝতে পারছ না?

এবার নানাসাহেব হতভম্ব হয়ে যান। ওঁর দর্প চূর্ণ হয়। তখন বাবা স্বয়ং এই ভাবে তার অর্থ বোঝাতে শুরু করেন -

১) জ্ঞানীদের শুধু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেই চলে না। সদগুরুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করতে হবে।

২) কেবল প্রশ্ন করাই যথেষ্ট নয়। কোন কু-প্রবৃত্তি বা বাক্য-জালে ফাঁসাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করা বা গুরুর ভুল ধরার প্রবৃত্তি নিয়ে বা ভণ্ডামি করে প্রশ্ন করা উচিত নয়। বরং যথোচিত মর্যাদা সহকারে, কেবল মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করা উচিত।

৩) "আমি সেবা করার বা না করার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র - করতেও পারি আর নাও করতে পারি"- যে এই ধরনের মনোভাব নিয়ে সেবা করে তার সেবাকে সেবা বলা যায় না। তার বোঝা উচিত যে নিজের দেহের উপর তার কোন অধিকার নেই। এই শরীরের উপর গুরুরই অধিকার এবং শুধু তাঁর কথামত চলে তাঁরই সেবার নিমিত্তেই সেটি বিদ্যমান রয়েছে। এইরূপ আচরণে সদগুরু তোমায় সেই 'জ্ঞান' (যার কথা ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে) কি বস্তু তা দেখিয়ে দেবেন।

নানা বুঝতে পারেন না যে গুরু কিভাবে অজ্ঞানের শিক্ষা দেন।

বাবা - জ্ঞানের উপদেশ কাকে বলে? অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে আত্মানুভূতি লাভ হবে

তার শিক্ষা। অজ্ঞানের নাশ হওয়াই জ্ঞান।

(গীতার শ্লোক ১৮-৬৬ তেই জ্ঞানেশ্বরী ভাষ্যে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - "হে অর্জুন, তোমার ঘুম ও স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তুমি নিজ স্বরূপ হও।" এই রকমই গীতার ৫-১৬ অধ্যায়ের টীকাতে লেখা আছে - জ্ঞানের তাৎপর্য্য অজ্ঞান দূর করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

অন্ধকার নষ্ট হওয়ার অর্থই প্রকাশ। দ্বৈত ভাব দূর করার আলোচনার মানে হল অদ্বৈতের কথা বলা। যখন অন্ধকার দুর করার কথা বলা হয় তখন তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা আলোর কথা বলছি। অদ্বৈতের অবস্থা উপলব্ধি করতে গেলে সর্বাগ্রে দ্বৈতের ভাব দূর করতে হবে। এটাই অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ। দ্বৈত অবস্থায় থেকে অদ্বৈতের আলোচনা কে করতে পারে? যতক্ষণ সেরকম অবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ কি কেউ সেটা অনুভব করতে পারে? শিষ্য সদগুরুর মতই জ্ঞান-মূর্তি। তাঁদের দুজনের মধ্যে শুধু অবস্থা, উচ্চ অনুভূতি, অদ্ভুত অলৌকিক সত্য, অদ্বিতীয় যোগ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। সদগুরু নির্গুন নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আসলে তিনি বিশ্ব ও মানব কল্যাণ হেতুই স্বেচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করেন। কিন্তু নরদেহ ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব সীমাহীন। তাঁর আত্মোপলব্ধি, দৈবিক শক্তি ও জ্ঞান সর্বদা এক রকমই থাকে। আসলে শিষ্যেরও ঐ একই স্বরূপ। কিন্তু অসংখ্য জন্মের সংস্কারের ফলে অবিদ্যার আবরণ তাকে ঢেকে রাখে। তাই ওর ভ্রম হয় এবং নিজের শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ বিস্মৃত হয়। গীতার অধ্যায় ৫এ দেখো - "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্ত জন্তবঃ।" ওর এটা একটা ভ্রম মাত্র- "আমি জীব, একটি প্রাণী, দূর্বল ও অসহায়।" এই অজ্ঞানরূপী জড়কে কেটে ফেলার জন্য গুরুকে উপদেশ দিতে হয়। এই ধরনের শিষ্যকে যে জন্ম জন্মান্তর থেকে এই ধারনা করে বসে আছে যে, "আমি ত জীব, দূর্বল এবং অসহায়", গুরু সহস্র জন্ম ধরে শিখিয়ে যাচ্ছেন- "তুমিই ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান এবং সর্বসমর্থ।" তবে গিয়ে তার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস হয় যে- "যথার্থে আমি ঈশ্বর।" সর্বদা মোহগ্রস্থ হয়ে থাকার দরুণ ওর এইরূপ মনে হয়- "আমি শরীর, একটি জীব এবং ঈশ্বর ও এই বিশ্ব আমার থেকে ভিন্ন বস্তু।" কর্মানুসারে প্রত্যেক প্রাণী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এই মোহ, এই ভ্রান্তি এবং এই অজ্ঞতার জড় নষ্ট করার জন্য আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে এই অজ্ঞতা কোথায় এবং কি করে জন্মাল? শিষ্যের এই অনুসন্ধানের দিগদর্শন করানোকেই উপদেশ বলা হয়।

অজ্ঞানের উদাহরণ ঃ-

১) আমি একটি জীব।

২) শরীরই আত্মা। (আমি আত্মা)

৩) ঈশ্বর, বিশ্ব এবং জীব পৃথক তত্ত্ব।

৪) আমি ঈশ্বর নই।

৫) শরীর আত্মা নয়- এর বোধ না হওয়া।

৬) এর জ্ঞান না থাকা যে ঈশ্বর, বিশ্ব এবং জীব এক ও অভিন্ন।

যতক্ষন শিষ্যের সামনে এই ভুলগুলি তুলে না ধরা হয় ততক্ষন সে এটা অনুভবই করতে পারে না যে ঈশ্বর, জীব এবং শরীর কি; তাদের মধ্যে পারস্পরিক কি সম্বন্ধ এবং ওরা পরস্পর ভিন্ন না অভিন্ন? এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রম দূর করাকেই 'অজ্ঞান' এর জ্ঞানোপদেশ বলা হয়। এবার প্রশ্ন এই যে- "জীব- যে নিজেই জ্ঞান-মূর্তি, তার জ্ঞানের কি দরকার?" উপদেশের তাৎপর্য্য তো শুধু ত্রুটিগুলি তার সামনে তুলে ধরে তার অজ্ঞান দূর করা। বাবা এও বলেন -

১) 'প্রণিপাত' এর অর্থ 'শরণাগতি'।

২) দেহ, মন ও অর্থ - সব কিছু সমর্পণ করা উচিত।

৩) কৃষ্ণ অন্য জ্ঞানীদের দিকে কেন সংকেত করেন? সদভক্তের জন্য তো প্রত্যেক তত্ত্বই বাসুদেব (ভগবৎ গীতা অধ্যায় ৭-১৯। অর্থাৎ যে কোন গুরুই শিষ্যর জন্য কৃষ্ণ)। গুরুও শিষ্যকে বাসুদেব বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ এঁদের দুজনকে নিজের প্রাণ ও আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে এমন অনেক ভক্ত ও গুরু বিদ্যমান আছেন। তাই তাদের মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেন।

সমাধি মন্দিরের নির্মাণ ঃ-

বাবা যা করতে চাইতেন সে বিষয়ে আলোচনা বা হৈ-চৈ করতেন না। পারিপার্শিক অবস্থা এমন করে দিতেন যে লোকেদের তার মন্থর অথচ নিশ্চিত পরিণাম দেখে বড়ই আশ্চর্য্য লাগত। সমাধি মন্দির এই কথারই উদাহরণ। নাগপুরের প্রসিদ্ধ লক্ষপতি শ্রীমান বাপুসাহেব বুটী সপরিবারে শিরডীতে থাকতেন। একবার ওঁর মনে হয় যে

শিরডীতে ওঁর নিজস্ব একটা বাসস্থান (বাড়ী) থাকা উচিত। কিছু দিন পর দীক্ষিত 'ওয়াড়া'য় ঘুমিয়ে থাকার সময় তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন- বাবা বলছেন- "তুমি নিজের একটা 'ওয়াড়া' ও একটা মন্দির তৈরী করাও।" শামাও সেখানে শুয়েছিলেন এবং উনিও ঠিক এই একই স্বপ্ন দেখেন। বাপুসাহেব ঘুম থেকে ওঠে দেখেন শামা কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শামা বলেন- "এক্ষুনি আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম যে বাবা একেবারে আমার কাছে এসে স্পষ্ট শব্দে বললেন যে মন্দিরের সাথে 'ওয়াড়া' বানাও। আমি সব ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করব। বাবার মধুর ও প্রেমপূর্ণ শব্দ শুনে আমারও প্রেম উপছে পড়ে এবং গলা রুদ্ধ হয়ে চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল।" তাই আমি জোরে-জোরে কাঁদছিলাম। বাপুসাহেব বুটী খুবই অবাক হন যে দুজনেরই স্বপ্ন এক রকম কি করে হতে পারে? অর্থশালী তো তিনি ছিলেনই। তাই একটা 'ওয়াড়া' নির্মাণ করাবেন স্থির করেন। শামার সাথে বসে একটা নক্সা আঁকেন। কাকাসাহেব দীক্ষিতও সেটা অনুমোদন করেন। এবার সেই নক্সা বাবার সামনে রাখা হয়। তিনিও ততক্ষণাৎ স্বীকৃতি দিয়ে দেন। তখন নির্মাণকার্য্য শুরু করে দেওয়া হয় এবং শামার তত্ত্বাবধানে প্রথম তলা, মাটির নীচের ঘর ও কুয়ো তৈরী হয়ে যায়। বাবা লেন্ডীবাগ যেতে আসতে কখনো-কখনো কিছু পরামর্শ দিতেন। এরপর এই কাজটি বাপুসাহেব যোগকে দেওয়া হয়। যখন এই ভাবে কাজ এগোচ্ছিল সেই সময় একদিন বাপুসাহেবের খেয়াল হয় যে একটু খোলা জায়গাও অবশ্যই রাখা উচিত এবং তার ঠিক মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনা করলে ভালো হয়। তিনি নিজের এই প্রস্তাবটি শামাকে জানান এবং বাবার কাছে অনুমতি নিতে অনুরোধ করেন। বাবা সে সময় 'ওয়াড়া'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন শামা তাঁর কাছে এ বিষয়ে অনুমতি চান। শামার কথা শুনে বাবা স্বীকৃতি দিয়ে বলেন- "যখন মন্দিরের কাজ পুরো হয়ে যাবে তখন আমি স্বয়ং সেখানে থাকব।" ওয়াড়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওয়াড়া তৈরী হয়ে গেলে আমরা সবাই সেটা উপভোগ করব। ওখানেই থাকব, ঘুরব-ফিরব এবং পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে আনন্দ সহকারে দিন কাটাব।" তখন শামা জিজ্ঞাসা করেন- "এই মুহূর্তটি মূর্তিকক্ষের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য কি শুভ?" বাবা স্বীকৃতিসূচক উত্তর দেওয়ায় শামা একটা নারকেল এনে ভাঙ্গেন এবং কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। ঠিক সময় সব কাজ পুরো হয়ে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের একটা সুন্দর মূর্তি তৈরী করাবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনও মূর্তির কাজ শুরুও হয়নি, একটা নতুন ঘটনা সবাইকে ব্যস্ত করে তোলে। বাবার স্বাস্থ্য চিন্তাজনক হয়ে দাঁড়ায় এবং মনে হল বাবা দেহরক্ষা করবেন। বাপুসাহেব খুবই হতাশ ও উদাস হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবেন- "বাবা চলে গেলে 'ওয়াড়া' তাঁর পবিত্র চরণের

স্পর্শ হতে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং আমার সব অর্থব্যয় (প্রায় এক লক্ষ টাকা) ব্যর্থ হয়ে যাবে।" কিন্তু শেষ সময় বাবার ইচ্ছে ("আমায় ওয়াড়াতেই রেখো") শুধু বুটী সাহেবকেই নয় বরং প্রতিটি মানুষকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করে। বাবার পবিত্র শরীর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির জায়গায় স্থাপিত হলো। বাবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেন এবং 'ওয়াড়া' সাইবাবার সমাধি মন্দির।

তাঁর অনন্ত লীলার কোন সীমা কেউ পায়নি। শ্রী বাপুসাহেব বুটী ধন্য, যাঁর 'ওয়াড়া'-য় বাবার দিব্য এবং পবিত্র পার্থিব শরীর বিশ্রাম করছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৪০

শ্রী সাইবাবার কাহিনী

১) শ্রী বি. ভি. দেবের মায়ের 'উদ্যাপন' অনুষ্ঠানে যোগদান এবং ২) হেমাড পন্তের গৃহে চিত্ররূপে আগমন।

এই অধ্যায়ে দুটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে - ১) বাবা কিভাবে শ্রীমান দেবের মায়ের বাড়ীতে 'উদ্যাপন' অনুষ্ঠানে এবং ২) বান্দ্রাতে হেমাডপন্তের বাড়ীতে দোলের দিন মধ্যেহ্ন ভোজে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রস্তাবনা ঃ-

শ্রীসাই সমর্থ ধন্য, যাঁর নাম বড় সুন্দর! তিনি সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক, দুই বিষয়েই নিজের ভক্তদের উপদেশ দেন এবং ভক্তদের নিজের জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সাহায্য করে, ওদের নিজের শক্তি প্রদান করেন। তিনি ভেদ-বুদ্ধি নষ্ট করে তাদের অপ্রাপ্য বস্তুরও প্রাপ্তি করান। ভক্তরা সাইয়ের চরণে ভক্তিসহ নত হয় এবং শ্রী সাইবাবাও অভেদ জ্ঞানে প্রেম পূর্বক ভক্তদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি ভক্তদের সঙ্গে এমন ভাবে একাত্ম হয়ে যান যেমন বর্ষা ঋতুতে জল নদীর সাথে মিশে তাকে শক্তি ও মান দেয়।

শ্রীমতি দেবের উদ্যাপন অনুষ্ঠান ঃ-

শ্রী বি. ভি. দেব ডহানুতে (জেলা - ঠানে) মামালৎদার ছিলেন। ওঁর মা প্রায় পঁচিশ-তিরিশটা বিভিন্ন সংকল্প পালন করেছিলেন। একটি উদ্যাপন প্রয়োজন। উদ্যাপনের সাথেই প্রায় একশো-দুশোজন ব্রাহ্মণ ভোজ-এরও আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রী দেব একটি দিন ঠিক করে বাপুসাহেব জোগকে একটা চিঠি লেখেন- "তুমি আমার হয়ে শ্রীসাই বাবাকে উদ্যাপন ও ভোজে আসার জন্য অনুরোধ কোর এবং তাঁকে জানিও যে তাঁর অনুপস্থিতিতে উৎসব অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি অবশ্যই ডহানু এসে দাসকে কৃতার্থ করবেন।"

বাপুসাহেব যোগ বাবাকে সেই চিঠিটি পড়ে শোনান। বাবা চিঠিটা মন দিয়ে শোনেন এক শুদ্ধ চিত্তের সরল আমন্ত্রণ লক্ষ্য করে তিনি বলেন- "**যে আমায় স্মরণ করে তার কথা আমার সর্বদা মনে থাকে। কোথাও যাওয়ার জন্য আমার কোন**

গাড়ী, টাঙ্গা বা বিমানের দরকার হয় না। যে আমায় ভালোবেসে ডাকে তার সামনে আমি অবিলম্বে উপস্থিত হই। ওকে চিঠি মারফৎ জানিয়ে দাও যে আমি আরো দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে অবশ্যই যাব।" শ্রী যোগ সে কথা শ্রীদেবকে লিখে পাঠিয়ে দেন। চিঠি পড়ে দেব খুব খুশী হন; কিন্তু উনি এও জানতেন যে বাবা শুধু রাহাতা, রুই এবং নিমগ্রাম ছাড়া আর কোথাও যাওয়া-আসা করেন না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়- "বাবার পক্ষে কিই বা অসম্ভব? তিনি তো অসংখ্য চমৎকার দেখিয়েছেন। তিনি সর্বব্যাপী যে কোন বেশেই অনায়াসেই আবির্ভূত হয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারেন।"

উদ্‌যাপনের কিছু দিন আগে এক সন্ন্যাসী ডহানু স্টেশনে নামে। তার বেশভূষা বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মত ছিল এবং দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন গোরক্ষা সংস্থানের স্বেচ্ছাসেবক। সে সোজা স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে চাঁদার জন্য নিবেদন করে। তিনি ওকে বলেন- "তুমি এখানকার মাম্‌লৎদার শ্রীদেবর কাছে যাও এবং ওঁর সাহায্যে তুমি যথেষ্ট চাঁদা পেতে পারবে।" ঠিক সেই সময় মাম্‌লৎদারও সেখানে এসে পৌঁছন। তখন স্টেশন মাস্টার সন্ন্যাসীর সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন এবং দুজনে প্ল্যাটফর্মে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাম্‌লৎদার বলেন- "এখানকার প্রধান নাগরিক শ্রী রাওসাহেব নরোত্তম সেঠ, ধার্মিক কার্য্যের জন্য একটা ফর্দ তৈরী করেছেন। অতএব এখন আরেকটা ফর্দ তৈরি করা একটু অনুচিত মনে হচ্ছে। তাই ভালো হয় যদি আপনি দু-চার মাস পর এখানে আসেন।" এই কথা শুনে সন্ন্যাসী সেখান থেকে চলে যায় এবং এক মাস পর শ্রীদেবের বাড়ীর সামনে তাকে টাঙ্গা থেকে নামতে দেখা যায়। ওকে দেখে শ্রীদেব মনে-মনে ভাবেন- "নিশ্চয় চাঁদা চাইতে এসেছে।" উনি শ্রী দেবকে ব্যস্ত দেখে বলেন- "শ্রীমান! আমি চাঁদা নিতে আসিনি। খাবার খেতে এসেছি।" শ্রীদেব উত্তর দিলেন- "খুব আনন্দের কথা। বসুন, এ তো আপনারই বাড়ী।"

সন্ন্যাসী - আমার সাথে আরও দুটি ছেলে আছে।

দেব - দয়া করে ওদেরও নিয়ে আসুন।

খাবার পরিবেশন হতে এখনো দু-ঘন্টা সময় ছিল। তাই শ্রীদেব জিজ্ঞাসা করেন- 'যদি বলেন তো আমি কাউকে ওদের ডাকতে পাঠিয়ে দিই।"

সন্ন্যাসী - আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা ঠিক সময় পৌঁছে যাব।

দেব ওকে দুপুরে আসতে অনুরোধ করেন। ঠিক বারোটার সময় তিন জন ওখানে এসে পৌঁছয় এবং ভোজে সম্মিলিত হয়ে খাবার খেয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

উৎসব শেষ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীদেব শ্রীযোগকে বাবার 'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ'র বিষয় নালিশ করে চিঠি লেখেন। শ্রীযোগ সেই চিঠিটা নিয়ে বাবার কাছে যান। কিন্তু চিঠি পড়ার আগেই বাবা ওঁকে বলেন- "আরে, আমি ওকে যা কথা দিয়েছিলাম সে কথার খেলাপ করিনি। ওঁকে জানিয়ে দাও যে আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ওর ভোজে ঠিকই উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু ও আমায় চিনতেই পারেনি। তাহলে নেমন্তন্ন করার কষ্ট কেন করল? ওঁকে লেখো যে ও বোধহয় ভেবেছিল সেই সন্ন্যাসী চাঁদা চাইতে এসেছে। কিন্তু আমি কি ওর সন্দেহ দূর করে দিইনি? আমি কি বলিনি আরো দুজনকে নিয়ে আসব? আর সেই ত্রিমূর্তি কি ঠিক সময় ভোজে সম্মিলিত হয়নি? দেখো, **আমি নিজের কথা রাখার জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেব। আমার কথার কখনো খেলাপ হয় না।**"

এই উত্তর শুনে যোগের মনে খুব আনন্দ হয় এবং উনি পুরো ব্যাপারটা লিখে শ্রীদেবকে পাঠিয়ে দেন। চিঠিটা পড়তে পড়তে শ্রীদেবের চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। ওঁর নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিল। মিছিমিছি বাবার উপর দোষারোপ করলেন। অবাক হয়ে ভাবছিলেন যে সন্ন্যাসীর প্রথম বারের আগমন তাকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করল। "আরো দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ভোজে আসব," সন্ন্যাসীর এই কথার প্রকৃত অর্থও তিনি ধরতে পারলেন না!

এই ঘটনাটি আমাদের শুধু এটাই বোঝায় যে **যখন ভক্ত অনন্য ভাবে সদগুরু শরণে যায় তখন সে অনুভব করতে শুরু করে যে গুরু কৃপায় তার সমস্ত ধার্মিক অনুষ্ঠান সুচারুভাবে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।**

হেমাডপন্তের দোলের ভোজ ঃ-

এবার আমার একটা অন্য ঘটনা নিই যাতে বলা হয়েছে যে বাবা কিভাবে ছবির মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে নিজের ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করেন। **১৯১৭ সালে দোল পূর্ণিমার দিন হেমাডপন্ত একটা স্বপ্ন দেখেন যে বাবা ওঁকে জাগিয়ে বলছেন- "আমি আজ তোমার বাড়ীতে খেতে আসব।"**

জাগানোটা স্বপ্নেরই একটা অংশ ছিল। কিন্তু যখন ওঁর সত্যি-সত্যি ঘুম ভাঙ্গে

তখন উনি বাবাকে বা অন্য কোন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান না। একটু সজাগ হয়ে ভাবতেই সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা ওনার মনে পড়ে যায়। যদিও উনি বাবার সঙ্গে গত সাত বছর ধরে ছিলেন এবং নিরন্তর তাঁরই ধ্যান করতেন, তবুও এটা কখনোই আশা করেননি যে বাবা ওঁর বাড়ীতে এসে খাবার খেয়ে ওঁকে কৃতার্থ করবেন। বাবার কথা স্মরণ করে অতি খুশী হয়ে উনি নিজের স্ত্রীকে বলেন- "আজ দোলের দিন। এক সন্ন্যাসী অতিথি খেতে আসবেন। তাই খাবার একটু বেশী করে তৈরী কোর। ওঁর স্ত্রী অতিথির বিষয় জিজ্ঞাসা বাদ করায় হেমাডপন্ত কোন কথা না লুকিয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। তখন ওঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন যে- "তিনি কি শিরডীর অত ভালো খাবার ছেড়ে এতদূর বান্দ্রাতে আমাদের সাদা-মাটা খাবার খেতে আসবেন?" হেমাডপন্ত নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন- "বাবার জন্য অসম্ভবই বা কি? হতে পারে তিনি স্বরূপে না এসে অন্য কোন রূপ ধারণ করে আসবেন!" এরপর খাবার তৈরীর সব রকম ব্যবস্থা শুরু হয়। দোল পূজো শুরু হলে শালপাতা বিছিয়ে তার চারিদিকে আল্পনা দেওয়া হয়। দুটি সারি ও তার মাঝখানে রইল অতিথির জন্য স্থান। বাড়ীর সব লোকেরা যথা পুত্র, নাতি, মেয়ে-জামাই নিজের-নিজের স্থান গ্রহণ করে এবং পরিবেশন শুরু হয়। প্রত্যেকে উৎসুক হয়ে সেই অজ্ঞাত অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিল। বারোটা বেজে গেল, কেউ এসে পৌঁছল না। এবার দরজা বন্ধ করে অন্নশুদ্ধির জন্য ঘি বিতরণ করে অগ্নিদেবকে আহুতি দিয়ে শ্রী কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করা হল। সবাই খাবার খেতে শুরু করবে, এমন সময় সিঁড়িতে কারো পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। হেমাডপন্ত তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা খোলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে দুটি লোক ১) আলী মোহম্মদ ২) মৌলানা ইস্মু মুজাওয়ার। সবাই খাবার-খেতে বসেছে দেখে এঁরা দুজনে বিনীত ভাবে বলেন- "আপনাদের বড় অসুবিধেয় ফেললাম। তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি থালা ছেড়ে উঠে এসেছেন এবং সবাই আপনার জন্যই প্রতীক্ষা করেছেন। তাই আপনি দয়া করে আপনার এই সম্পদ সামলান। এর সম্বন্ধে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা অন্য কোন সময় শোনার।" এই বলে ওঁরা একটা পুরনো খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট বার করে সেটা খুলে সামনের টেবিলে রাখেন। কাগজের আবরণ সরাতেই বাবার একটা বড়, সুন্দর ছবি দেখে হেমাডপন্ত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি মনে মনে ভাবেন- "বাবা এই ছবির মাধ্যেমেই আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।" উনি আলী মুহম্মদকে প্রশ্ন করেন- "বাবার এই সুন্দর ছবিটি আপনি কোথায় পেলেন?" আলী মুহম্মদ তখন জানান- "আমি এইটি একটা দোকান থেকে কিনেছিলাম। এর বিষয় বাকী কথা পরে জানাব। আপনি দয়া করে

এবার খেতে বসুন, সবাই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে।" হেমাডপন্ত ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করেন। এরপর মাঝখানে পাতা আসনটির ওপর ছবিটি রেখে বিধিপূর্বক নৈবেদ্য অর্পণ করেন। সবাই ঠিক সময়ে খেতে শুরু করে। ছবিটিতে বাবার সুন্দর মনোহর রূপ দেখে সবাই পরম প্রীত হয়ে ভাবতে বাধ্য হয় যে এই আশ্চর্য ঘটনা কি ভাবে ঘটল? বাবা এই ভাবে হেমাডপন্তকে স্বপ্নে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করলেন।

এই ছবির বিষয়ে বিবরণ অর্থাৎ আলী মুহম্মদ ছবিটি কি করে পান এবং কেনই বা সেটা হেমাডপন্তকে উপহার দেন, এই বিষয়ে বর্ণনা পরের অধ্যায়ে করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৪১

ছবির কথা, ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরী পড়ার কাহিনী।

গত অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার ন' বছর পর আলী মুহম্মদ হেমাডপন্তের সাথে দেখা করেন এবং নিজের গল্পটা এই ভাবে পুরো করেন -

"একদিন বম্বেতে বেড়াতে-বেড়াতে আমি একটা দোকান থেকে বাবার একটা ছবি কিনি। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজের বাড়ীর দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিই। বাবার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক প্রেম ছিল। যখন আমি আপনাকে (হেমাডপন্তকে) সেই ছবিটি দিই তার তিন মাস আগে আমার পা'য়ে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। সেটি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল। আমি নিজের শ্যালক নূর মুহম্মদের বাড়ীতে ছিলাম। আমার বান্দ্রার বাড়ীতে তিন মাস ধরে তালা দেওয়া ছিল এবং সেই সময় ওখানে কেউ থাকত না। শুধু সুপ্রসিদ্ধ বাবা আব্দুল রহমান, মৌলানা সাহেব, মুহম্মদ হুস্সেন, সাই বাবা, তাজুদ্দীন বাবা এবং অন্যান্য সন্তরা ছবির রূপে সেখানে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু কালচক্র তাঁদেরও নিস্তার দেয় না। আমি ওখানে (বম্বেতে) রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাহলে আর আমার বাড়ীতে লোকেদের (ছবি) কষ্ট দেওয়া কেন? আমার মনে হয় যেন তাঁরাও জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত নন। অন্যসব ছবিগুলির ভাগ্যে যা ছিল তাই-ই হয়। কিন্তু শ্রী সাইবাবার ছবিটি কি করে রক্ষা পেল, এর রহস্য উদ্‌ঘাটন এখনো পর্যন্ত কেউ করে উঠতে পারেনি। এ থেকে শ্রী সাইবাবার সর্বব্যাপকতা এবং তাঁর অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছু বছর আগে মুহম্মদ হুসেন থাবিয়া টোপন্ আমাকে (সন্ত) বাবা আব্দুল রহমানের একটা ছবি দেন। সেটা আমি নিজের শ্যালক নূর মুহম্মদ পীর ভাইকে দিয়ে দিই। সেটা গত আট বছর থেকে ওঁর টেবিলেই পড়েছিল। একদিন ছবিটির উপর ওঁর চোখ পড়ে তখন সেটা ফোটোগ্রাফারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওটাকে বড় করিয়ে তার প্রতিলিপি কয়েকজন আত্মীয়কেও দেন। একটা প্রতিলিপি আমিও পাই, যেটা আমি নিজের ঘরে রেখেছিলাম। নূর মুহম্মদ সন্ত আব্দুল রহমানের শিষ্য ছিলেন। এক দিন রহমান বাবার দরবারে সব লোকেদের সামনেই নূর মুহম্মদ তাঁকে সেই

ছবিটি উপহার দেওয়ার জন্য তাঁর সামনে রাখেন। ছবিটি দেখেই তিনি রেগে গিয়ে মুহম্মদকে মারতে ছোটেন এবং ওঁকে বাইরে বার করে দেন। নূর মুহম্মদ অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও বিষন্ন হন। উনি ভাবেন অতগুলো টাকা মিছিমিছিই খরচ করলেন যার পরিণামে কেবল গুরুর বিরূপতা ও অসন্তোষ জুটলো। ওঁর গুরু মূর্তি পূজোর বিরোধী ছিলেন। নূর মুহম্মদ ছবিটা হাতে নিয়ে 'অপোলো' বন্দর পৌঁছন এবং একটা নৌকো ভাড়া করে সমুদ্রের মাঝামাঝি সেই ছবিটা বিসর্জন দিয়ে আসে। উনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে সব ছবিগুলি (মোট ছটি) ফেরত আনিয়ে নেন। এক জেলের সাহায্যে সব ক'টি ছবি বান্দ্রার কাছে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

সে সময় আমি আমার শ্যালকের বাড়ীতে ছিলাম। নূর মুহম্মদ আমায় পরামর্শের সুরে বলেন- "যদি তুমি সব সন্তদের ছবি সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও তাহলে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।" এই শুনে আমি ম্যানেজার মেহতাকে নিজের বাড়ী পাঠাই এবং বাড়ীতে টাঙ্গানো সব ছবিগুলো সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে বলি। পাঁচ মাস পর বাড়ী ফিরে বাবার ছবিটি যেমন-কে-তেমন টাঙ্গানো দেখে আমার খুব আশ্চর্য্য লাগে। আমি বুঝে উঠতে পারি না যে মেহতা অন্য সব ছবিগুলো তো বার করে ভাসিয়ে দেয়, তবে কেবল এই ছবিটিই কি করে থেকে গেলো। আমি তক্ষুনি সেটি নামিয়ে নিই এই ভেবে যে, আমার শ্যালকের চোখ পড়লে সে এটাও নষ্ট করে ফেলবে। যখন আমি এই চিন্তা করছিলাম যে কে এই ছবিটি যত্ন করে সামলে রাখতে পারবে, তখন যেন স্বয়ং সাইবাবাই আমায় নির্দেশ দেন- 'ইস্মু মুজাওরের কাছে গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করো এবং তার কথা মত কাজ করো।' আমি মেঠলানা সাহেবের সাথে দেখা করি এবং ওঁকে সব কথা জানাই। কিছুক্ষণ ভাবার পর উনি এই স্থির করেন যে সেটি আপনাকেই (হেমাডপন্ত) দেওয়া উচিত। একমাত্র আপনিই এইটি ভালো ভাবে সামলে রাখতে পারবেন। তাই আমরা দুজনে আপনার বাড়ী আসি এবং উপযুক্ত সময় এই ছবিটি আপনাকে দিই। এই ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে বাবা ত্রিকালদর্শী এবং তিনি কি অপূর্ব কৌশলে সমস্যার সমাধান করে ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করেন।"

নিম্ন লিখিত কাহিনী এই বিষয়ের প্রতীক যে যাঁরা অধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের বাবার কত ভালোবাসতেন এবং কিভাবে তাঁদের সমস্ত অসুবিধে দূর করে তাঁদের সুখী করতেন।

ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরীর পঠন ঃ-

শ্রী বি. ভি. দেবের বহু দিনের ইচ্ছে অন্যান্য ধার্মিক গ্রন্থ গুলির সাথে সাথে 'জ্ঞানেশ্বরী'ও পাঠ করেন। (জ্ঞানেশ্বরী শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজের দ্বারা রচিত ভগবদ্গীতার মারাঠী টীকা) উনি রোজ ভগবদ্গীতার একটা অধ্যায় এবং অন্যান্য গ্রন্থের কিছু-কিছু অংশ পাঠ করতেন। কিন্তু জ্ঞানেশ্বরীর পাঠ শুরু করতেই কোন না কোন বাধা উপস্থিত হত। তিন মাসের ছুটি নিয়ে উনি শিরডী আসেন। সেখান থেকে নিজের বাড়ী যান বিশ্রামের জন্য। অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থ তো উনি পড়তেন ঠিকই কিন্তু যেই 'জ্ঞানেশ্বরী' খুলে বসতেন অমনি নানা রকমের এলোমেলো দুঃশ্চিন্তা ওঁকে এমন ভাবে ঘিরে নিত যে অগত্যা তাঁকে পাঠ বন্ধ করতে হত। অনেক চেষ্টা করার পরও যখন দু-চার লাইনও পড়ে উঠতে পারলেন না, তখন উনি স্থির করেন- "যখন দয়ানিধি শ্রী সাই-ই কৃপা করে এই গ্রন্থপাঠ করার আদেশ দেবেন তখনই শুরু করব।' ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উনি সপরিবারে শিরডী আসেন। শ্রীযোগ ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি রোজ জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করেন?" শ্রীদেব উত্তর দেন যে- "আমার ইচ্ছে তো খুব হয় কিন্তু এখনো সফল হতে পারিনি। যখন বাবা আদেশ করবেন তখনই পাঠ শুরু করব।" শ্রী যোগ পরামর্শ দেন- "গ্রন্থটির একটি প্রতিলিপি কিনে বাবাকে নিবেদন করুন। তিনি সেটি স্পর্শ করে ফিরিয়ে দেওয়ার পর পাঠ শুরু করলে লাভ হবে।" শ্রীদেব বলেন- "আমি এই প্রণালীটি ঠিক মনে করি না। বাবা তো অন্তর্যামী এবং আমার হৃদয়ের ইচ্ছে তাঁর কাছে কি করে গুপ্ত থাকতে পারে? তিনি স্পষ্ট শব্দে আদেশ দিয়ে আমার মনের ইচ্ছে কি পূরণ করবেন না?"

শ্রীদেব বাবার দর্শন করেন এবং এক টাকা দক্ষিণা দেন। তখন বাবা ওঁর কাছে আরো কুড়ি টাকা দক্ষিণা চান, সেটিও দিলেন। রাত্রে শ্রীদেব বালকরামের সাথে দেখা করেন এবং ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি কি ভাবে বাবার ভক্তি ও কৃপা প্রাপ্ত করেন?" বালকরাম বলেন- "আমি কাল আরতি শেষ হওয়ার পর আপনাকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শোনাব।" পরের দিন যখন শ্রীদেব দর্শনার্থে মস্জিদে যান তখন বাবা ওঁর কাছে আবার কুড়ি টাকা দক্ষিণা চান এবং উনি খুশী হয়ে সেটি দেন। মস্জিদে ভীড় দেখে উনি একদিকে গিয়ে একান্তে বসেন। বাবা ওঁকে ডেকে নিজের কাছে বসান।

আরতি শেষ হওয়ার পর যখন সবাই নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে গেছে, তখন শ্রীদেব বালক রামের সঙ্গে দেখা করে ওঁর পূর্ব ইতিহাস জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং বাবার দেওয়া উপদেশ ও ধ্যানাদির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বালকরাম এই

সব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় চন্দ্রু এসে জানায় যে শ্রীদেবকে বাবা ডাকছেন। শ্রীদেব মস্‌জিদে যেতেই বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে উনি কার সাথে এবং কি কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীদেব উত্তর দেন যে উনি শ্রী বালকরামের কাছে তাঁর কীর্তির গুণগান শুনছিলেন। তখন বাবা ওঁর কাছে আবার ২৫ টাকা দক্ষিণা নিয়ে ওঁকে ভেতরে নিয়ে যান। আসন গ্রহণ করার পর ওঁর উপর দোষারোপ করে বলেন- "আমাব অনুমতি না নিয়েই তুমি আমার ন্যাকড়া (পুরনো কাপড়ের টুকরো) চুরি করেছ।" শ্রীদেব উত্তর দেন- "ভগবান! যতদূর আমার মনে পড়ে, আমি তো এরকম কোন কাজ করিনি।" কিন্তু বাবা কারো কথা কোথায় শুনতেন? তিনি শ্রীদেবকে ভালভাবে খুঁজতে বলেন। শ্রীদেবও তন্নতন্ন করে খোঁজেন, কিন্তু কোথাও কিছু পান না। তখন বাবা রেগে গিয়ে বলেন- "এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমিই চোর। তোমার চুল তো পেকে গেছে আর এত বুড়ো হয়ে গিয়েও কি না তুমি এখানে চুরি করতে এসেছ?" এরপর বাবার চোখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তিনি ভীষণ ভাবে গালাগালি করতে শুরু করেন। শ্রীদেব শান্ত হয়ে সব শুনছিলেন। মনে ভাবলেন- এরপর বুঝি মারই খেতে হবে। প্রায় এক ঘন্টা পর বাবা ওঁকে 'ওয়াড়া'য় ফিরে যেতে বলেন। ওয়াড়ায় ফিরে উনি যোগ ও বালকরামকে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বললেন। দুপুরের পর বাবা সবার সাথে শ্রীদেবকেও ডেকে পাঠান। বলেন- "বোধহয় আমার কথাগুলি এই বৃদ্ধের মনে কষ্ট দিয়েছে। ইনি চুরি করেছেন কিন্তু স্বীকার করছেন না।" তিনি শ্রীদেবের কাছে আবার বারো টাকা দক্ষিণা চান। শ্রীদেব সেটি আনন্দ সহকারে জোগাড় করে বাবাকে দিয়ে প্রণাম করেন। তখন বাবা দেবকে বলেন- "তুমি আজকাল কি করছ?" দেব উত্তর দেন- "কিচ্ছু না।" তখন বাবা বলেন- "পুঁথি (জ্ঞানেশ্বরী) পাঠ করা শুরু করো। যাও, ওয়াড়ায় বসে রোজ পড় আর যেটুকু তুমি পড়বে তার অর্থ অন্যদের প্রেম ও ভক্তি ভরে বোঝাবে। আমি তোমায় সোনার কাজ-করা দামী শাল উপহার দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত রয়েছি। তাহলে তুমি অন্যদের কাছে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর আশায় কেন যাও? এটা কি তোমায় শোভা দেয়?"

পুঁথি পড়ার আদেশ পেয়ে দেব অতি প্রসন্ন হন। উনি ভাবেন- "আমি যা চাইছিলাম সেটাই পেয়ে গেছি এবং এবার আমি সচ্ছন্দে (জ্ঞানেশ্বরী) পড়তে পারব।" উনি বাবাকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন এবং বলেন- "হে প্রভু! আমি আপনারই শরণে এসেছি। আপনার অবোধ শিশু। আমায় পাঠ করতে সাহায্য করবেন।" এবার উনি ন্যাকড়ার অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারেন। বালকরামের কাছে যা জানতে চাইছিলেন সেটা ন্যাকড়া (টুকরো) তুল্য। এই সব বিষয়ে বাবা এই ধরনের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। তিনি

স্বয়ং সব রকমের প্রশ্নের উত্তর বা সন্দেহ দূর করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। অন্যদের কাছে নিরর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করা তিনি ভালোবাসতেন না। তাই তিনি শ্রীদেবের উপর রেগে যান এবং ওঁকে বকেন। শ্রীদেব এই শব্দগুলিকে বাবার শুভ আশীর্বাদ মনে করেন এবং সন্তুষ্ট মনে বাড়ী ফিরে যান।

এই ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় না। আদেশ দেওয়ার পর বাবা শান্ত হয়ে বসে থাকেন নি। এক বছর পর তিনি শ্রী দেবের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন পুঁথি পাঠ কতদূর এগোল। ২রা এপ্রিল ১৯১৪ সাল, বৃহস্পতিবার বাবা স্বপ্নে শ্রীদেবকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কি পুঁথি ঠিক ভাবে বুঝতে পারছ?" দেব উত্তর দেন- 'না'। তখন বাবা বলেন- "আর কখন বুঝবে?" শ্রীদেবের চোখ থেকে টপ্-টপ্ করে জল পড়তে থাকে এবং উনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন- "হে ভগবান, যতক্ষন আপনার কৃপা রূপী মেঘ বর্ষন না হবে ততক্ষন তার অর্থ বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই পাঠ ভারস্বরূপই রয়ে যাবে।" তখন বাবা বলেন- "আমার সামনে পড়ে শোনাও। তুমি পড়ার সময় বড্ড তাড়াহুড়ো করো।" তারপর জিজ্ঞাসা করায় তিনি আধ্যাত্ম বিষয়ক অংশটি পড়তে বলেন। শ্রীদেব পুঁথি আনতে যান এবং এই সময়ে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবার পাঠক স্বয়ং এই কথা কল্পনা করতে পারেন যে দেব এই স্বপ্নের পর কতখানি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। শ্রীদেব এখনো (১৯৪৪ সাল) জীবিত আছেন এবং চার-পাঁচ বছর আগে ওঁর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। আমি যতদূর জানি উনি এখনো জ্ঞানেশ্বরী পাঠ করেন। ওঁর জ্ঞান অগাধ ও পূর্ণ। সাই লীলার বিষয়ে লেখা ওঁর প্রবন্ধে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় (তারিখ ১৯.১০.১৯৪৪)।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪২

মহাসমাধির দিকে (১)

পূর্ব্বাভাস, রামচন্দ্র দাদা পাটীল এবং তাত্য়া কোতে পাটীলের মৃত্যু এড়ানো, লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে দান, শেষ মুহূর্ত।

প্রস্তাবনা ঃ-

গত অধ্যায়ের ঘটনাগুলি হ'তে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে গুরু-কৃপার কেবল একটি রশ্মি ভবসাগরের ভয় থেকে মুক্ত করে দেয় এবং মুক্তির পথ সুগম ক'রে দুঃখকে সুখে পরিবর্ত্তিত করে। যদি সদ্‌গুরুর মোহবিনাশকারী পূজণীয় চরণ দুটি সর্বদা স্মরণ করতে থাকো তাহ'লে তোমার সমস্ত কষ্ট এবং ভবসাগরের দুঃখ শেষ হয়ে যাবে। তাই যারা নিজের কল্যাণের জন্য চিন্তিত তাদের সাই সমর্থের অলৌকিক মধুর লীলামৃত পান করা উচিত। এই ভাবে তাদের মন শুদ্ধ হবে। প্রারম্ভে ডাক্তার পণ্ডিতের পূজো এবং কিভাবে উনি বাবাকে ত্রিপুন্ড লাগিয়ে ছিলেন এর উল্লেখ মূল গ্রন্থে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গের বর্ণনা ১১-ই অধ্যায়ে করা হয়ে গেছে, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়।

পূর্ব্বাভাস

পাঠকগণ, আপনারা এতদিন শুধু বাবার জীবনের কাহিনী শুনেছেন। এবার আপনারা মন দিয়ে বাবার মহাপ্রয়ানের কাহিনী শুনুন। ২৮সেপ্টেম্বর, ১৯১৮ বাবার সামান্য জ্বর হয়। এই জ্বর দু-তিন দিন থাকে। এরপর বাবা খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেন। তাতে ক্রমশঃ তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে গেল। ১৭ দিন পর অর্থাৎ ১৫-ই অক্টোবর, ১৯১৮ বেলা দুটো বেজে তিরিশ মিনিটে তিনি এই দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেন (এই সময়টি প্রোফেসর জি. জি. নারকের পত্রের অনুসারে লেখা হয়েছে। এই পত্রটি উনি ৫.১১.১৯১৮ তে দাদা সাহেব খাপার্ডেকে লিখেছিলেন এবং সেই বছর সাইলীলা পত্রিকার ৭-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল)। এর দু-বছর আগে বাবা তাঁর লোকান্তর গমনের পূর্ব্বাভাস দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন কেউই বুঝতে পারেনি।

ঘটনাটি এইরূপ - বিজয় দশমীর দিন যখন সবাই সন্ধ্যার সময় বিসর্জনের পর ফিরছিল, তখন বাবা হঠাৎই রেগে ওঠেন। মাথার কাপড়, কফ্নী এবং কৌপীন খুলে সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে জ্বলন্ত ধুনিতে ফেলে দেন। বাবার দেওয়া আহুতি পেয়ে ধুনি দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে এবং বাবার মুখের প্রভা তার চেয়েও উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল। তিনি পূর্ণ নগ্নবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তাঁর চোখ দুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল। তিনি আবেশে চিৎকার করে বলেন- "তোরা এখানে আয়। আমায় ভালো করে দেখে নে, আমি হিন্দু না মুসলমান।" সবাই ভয়ে কাঁপছিল। কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস করল না। কিছুক্ষণ পর ভাগোজী শিন্দে (যিনি মহারোগে ভুগছিলেন) সাহস করে বাবার কাছে যান এবং কোনরকমে তাঁর কৌপীনটি বেঁধে বলেন- "বাবা! এ কি কথা? দেব, আজ যে দশমীর উৎসব।" তাতে তিনি নিজের দন্ডটা মাটিতে ঠুকে বলেন- "এটা আমার সীমোল্লঙঘন।" প্রায় রাত ১১-টা পর্যন্ত তাঁর রাগ শান্ত হয় না এবং ভক্তদের 'চাওড়ী' শোভাযাত্রা বেরোবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। এক ঘন্টার পর বাবা শান্ত হন এবং পোষাক-আশাক পরে 'চাওড়ী' মিছিলে সম্মিলিত হন। এই ঘটনাটির মাধ্যমে বাবা ইঙ্গিত দেন যে তাঁর পক্ষে জীবন-রেখা পার হয়ে যাবার 'দশেরা' বা 'বিজয়া-দশমী'ই উচিত দিন। কিন্তু সেই সময় কেউ তার আসল অর্থ বুঝতে পারেনি। বাবা আরোও অনেক আভাস দেন। যেমন -

রামচন্দ্র দাদা পাটীলের মৃত্যু এড়ানো ঃ-

এর কিছুদিন পর রামচন্দ্র পাটীল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। উনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। সব রকমের চিকিৎসা করা হয় কিন্তু কিছুতেই লাভ হয় না। হতাশ হয়ে মৃত্যুরূপী শেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করেন। সেই সময় একদিন মাঝরাতে বাবা ওঁর মাথার কাছে এসে দাঁড়ান। পাটীল ওঁর পা জড়িয়ে ধরে বলেন- "আমি বাঁচার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছি। এবার কৃপা করে আমায় বলুন আমার প্রাণ কখন বেরোবে?" দয়াসিন্ধু বাবা বলেন- "চিন্তা কোর না। তোমার 'হুন্ডী' ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তুমি খুব শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার শুধু তাত্য়ার জন্য ভয় হচ্ছে - ১৯১৮ সালে 'বিজয়া-দশমী'র দিন সে দেহ ত্যাগ করবে। কিন্তু এই কথাটা কাউকে বোল না এবং ওকেও জানিও না। ও তাহলে ভয় পেয়ে যাবে।" রামচন্দ্র এরপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন কিন্তু ওঁর তাত্য়ার জন্য ভয় হত। উনি জানতেন যে বাবার কথা কখনো মিথ্যা হয় না এবং দু-বছর পরই তাত্য়ার মৃত্যু অবধারিত। উনি এই

কথাটি বালাশিম্পী ছাড়া কাউকে জানান নি। দুটি ব্যক্তি - রামচন্দ্র দাদা এবং বালাশিম্পী তাত্য়ার জীবন সম্বন্ধে চিন্তাগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত ছিলেন।

রামচন্দ্র বিছানা ছেড়ে চলতে-ফিরতে শুরু করেন। সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। ১৯১৮ সালে ভাদ্রমাস্ শেষ হয়ে আশ্বিন মাস শুরু হবে, এমন সময় বাবার কথা পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়। তাত্য়া অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ওঁর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। উনি বাবার দর্শন করতেও যেতে পারতেন না। তাত্য়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাবার উপর এবং বাবার শ্রীহরির উপর, যিনি তাঁর সংরক্ষক। তাত্য়ার অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে গেল। এখন উনি আর নড়তে-চড়তেও পারতেন না এবং সর্বদা বাবাকেই স্মরণ করতেন। এদিকে বাবাও জ্বরে ভুগছিলেন এবং তাঁর অবস্থাও দিনের-পর-দিন শোচনীয় হতে লাগল। তারপর নির্দ্ধারিত 'বিজয়া-দশমী'র দিনও কাছে এসে পড়ল। তখন রামচন্দ্র দাদা ও বালাশিম্পী খুবই ঘাবড়ে যান। শরীর কাঁপতে থাকে এবং ভয়ে গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। বিজয়া-দশমীর দিন তাত্য়ার নাড়ীর বেগ কমে যায় এবং মনে হচ্ছিল যেন ওঁর মৃত্যু শিয়রে। ঠিক এই সময় একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। তাত্য়ার ফাঁড়া কেটে গেল। ওঁর প্রাণ বেঁচে গেল, পরিবর্তে বাবাই চলে গেলেন। মনে হল যেন পরস্পর হস্তান্তরণ হয়ে গেল। সবাই বলে যে বাবা তাত্য়ার জন্য প্রাণত্যাগ করেন। এমনটি তিনি কেন করলেন সেটা শুধু তিনিই জানেন। এই কথাটি আমাদের বুদ্ধির বাইরে। এমনও হতে পারে যে, বাবা নিজের শেষ সময়ের ইঙ্গিত তাত্য়ার নাম নিয়ে দিয়েছিলেন।

পরের দিন ১৬ই অক্টোবর ভোরবেলা বাবা দাসগণুকে পন্ঢরপুরে স্বপ্ন দেন যে, "মস্‌জিদ হঠাৎ পড়ে গেছে। শিরডীর সব তেল-ওয়ালা আর মুদিরা আমায় উত্যক্ত করত। তাই আমি ঐ স্থান ছেড়ে দিলাম। আমি তোমায় এই বলতে এসেছি যে, তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে আমায় সব রকমের ফুল দিয়ে ঢেকে দাও।" দাসগণু শিরডী থেকেও একটা চিঠি পান। উনি নিজের শিষ্যদের নিয়ে শিরডী আসেন এবং বাবার সমাধির সামনে অখন্ড কীর্তন ও হরিনাম জপ শুরু করেন। উনি নিজে ফুলের মালা গেঁথে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বাবার সমাধিতে অর্পণ করেন। বাবার নামে খুব বড় দরিদ্র-নারায়ণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

লক্ষ্মীবাঈকে দান ঃ-

বিজয়া-দশমীর দিন হিন্দুদের জন্য খুবই পবিত্র। যদিও কিছুদিন থেকে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আন্তরিক রূপে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। শেষ মুহূর্তের ঠিক আগে তিনি কারো সাহায্য না নিয়ে সোজা হয়ে ওঠে বসেন এবং তাঁকে দেখে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছিল। লোকেরা ভাবে- "যে ফাঁড়া কেটে গেছে এবং ভয়ের আর কিছু নেই। এবার বাবা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।" কিন্তু তিনি জানতেন যে এবার তাঁর যাবার সময় এসে গেছে। তাই তিনি লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে কিছু দান দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে বাবার বাস ঃ-

শ্রীমতি লক্ষ্মীবাঈ শিন্দে এক অবস্থাপন্ন ও মধুরস্বভবা মহিলা। উনি মস্‌জিদে বাবার দিন-রাত সেবা করতেন। ভগত মহালসাপতি, তাত্‌য়া ও লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া রাতে মস্‌জিদের সিঁড়িতে কেউ পা রাখতে পারত না। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা যখন তাত্‌য়ার সাথে মস্‌জিদে বসেছিলেন সেই সময় লক্ষ্মীবাঈ এসে তাঁকে প্রণাম করেন। বাবা বললেন- "আরে লক্ষ্মী, আমার ভীষন ক্ষিধে পেয়েছে।" "বাবা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুনি আপনার জন্য রুটি নিয়ে আসছি"- এই বলে লক্ষ্মীবাঈ বাড়ী ফিরে যান। একটু পরেই বাবার জন্য রুটি ও শাক নিয়ে এসে বাবার সামনে রাখেন। বাবা সেগুলি একটা ক্ষুধার্ত কুকুরকে দিয়ে দেন। তখন লক্ষ্মীবাঈ বলেন- "বাবা, এ কি? আমি আপনার জন্য নিজের হাতে রুটি বানিয়ে আনলাম। আপনি এক টুকরোও মুখে না দিয়ে সেটা কুকুরকে দিয়ে দিলেন? তাহলে আপনি আমায় শুধু-শুধু কষ্ট দিলেন কেন?" বাবা উত্তর দেন- "মিছিমিছি দুঃখ পেও না। কুকুরের ক্ষিধে শান্ত করা আমাকে তৃপ্ত করারই সমান। কুকুরেরও তো আত্মা আছে। প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতি যদিও বিভিন্ন রকমের হয়, যেমন কেউ কথা বলতে পারে এবং কেউ মূক, কিন্তু ক্ষিধে তো সবারই পায়। এটা তুমি সর্বদা মনে রেখো যে, যে ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ায় সে আসলে আমাকেই খাওয়াচ্ছে। এটা একটা অকাট্য সত্য।" এই সাধারণ ঘটনাটির দ্বারা বাবা একটা মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করেন যে, কাউকে মনে কষ্ট না দিয়ে কিভাবে আমাদের নিত্য ব্যবহার করা উচিত। এরপর লক্ষ্মীবাঈ রোজ প্রেম ও ভক্তিপূর্বক দুধ, রুটি ও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসতে শুরু করেন এবং বাবাও সেগুলি ভালবেসে খেতেন। খানিকটা খেয়ে বাকীটা লক্ষ্মীবাঈকে দিয়ে রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। রাধাকৃষ্ণমাঈ এই উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রসাদ মনে করে প্রেমপূর্বক গ্রহণ

করতেন। এই রুটির ঘটনাটি অপ্রাসঙ্গিক ভাবা উচিত নয়। এতে দেখানো হয় যে সাইবাবা সর্বজীবে কি ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েও তদুর্দ্ধে উঠেছিলেন। তিনি সর্বব্যাপী, জন্মমৃত্যুহীন এবং অমর।

বাবা লক্ষ্মীবাঈয়ের সেবা সদৈব মনে রাখেন। বাবা সে সব ভুলতেও বা কি করে পারতেন? দেহত্যাগের ঠিক আগে তিনি নিজের পকেটে হাত দিয়ে প্রথমে ৫ টাকা এবং পরে ৪ টাকা, - মোট ৯ টাকা ওঁকে দেন। এই ন'-য়ের সংখ্যা এই বইতে (অধ্যায় ১২) বর্ণিত নববিধা ভক্তির দ্যোতক। বা এটি সীমোল্লঙ্ঘনের সময় দেওয়া দক্ষিণাও হতে পারে। লক্ষ্মীবাঈ এক অর্থবতী মহিলা ছিলেন। ওঁর টাকার কোন অভাব ছিল না। তাই হতে পারে বাবা প্রধান রূপে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত দশম অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছিলেন। এই শ্লোকে[১] উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্তদের ন'টি লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে পাঁচটি এবং পরে চারটি লক্ষণ ক্রমশঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাবাও সেই ক্রমই অনুসরন করেন (প্রথম ৫ এবং পরে ৪ মোট ৯)। কেবল ন' টাকাই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা লক্ষ্মীবাঈয়ের হাতে আসা-যাওয়া করেছে। কিন্তু বাবার দেওয়া ন' টাকা উনি চিরকাল মনে রাখবেন।

শেষ মুহূর্ত্ত ঃ-

বাবা সব সময় সজাগ ও সচেতন থাকতেন এবং শেষ সময়ও সম্পূর্ণ সাবধান ছিলেন। তিনি সেই সময় সবাইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। কাকাসাহেব, শ্রীমান বুটী ও অন্যান্যরা- যাঁরা মস্‌জিদে বাবার কাছে বসেছিলেন, তাঁদেরও বাবা খাবার খেয়ে ফিরে আসতে বলেন। এই অবস্থায় ওঁরা বাবাকে একলা ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু বাবার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনও তো করতে পারতেন না। তাই ওঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত মনে 'ওয়াড়া'য় ফিরে গেলেন। ওঁরা জানতেন যে বাবার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং এই ভাবে তাঁকে একলা ছেড়ে আসা ওঁদের উচিত হয়নি। ওঁরা খেতে তো বসেন কিন্তু মন পড়ে ছিল অন্য কোথাও (বাবার কাছে)। তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আর বাবার নশ্বর শরীর ত্যাগ করার সংবাদ এসে পৌঁছয়। ওঁরা খাবার থালা ছেড়ে মস্‌জিদে দৌড়ন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, বাবা চিরকালের মত বায়াজী আপ্পাকোতের কোলে বিশ্রাম করছেন। তিনি না নীচে ঢলে পড়েন আর নাই তাঁকে বিছানায় শুতে হয়। নিজেরই আসনে শান্ত ভাবে বসে নিজের হাতে দান করার ভঙ্গিমায়

মানব শরীর ত্যাগ করলেন। সন্তরা স্বয়ংই দেহ ধারণ করেন এবং কোন নিশ্চিত লক্ষ্য নিয়ে এই জগতে প্রকট হন। যখন সেই লক্ষ্য পূরণ হয়, তখন যেমন সরল ও আকস্মিক ভাবে প্রকট হয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই লুপ্ত হয়ে যান।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ ষষ্ঠ বিশ্রাম

১) অমান্যমৎসবো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ় সৌহৃদঃ।
অসত্বরোহর্থজিজ্ঞাসুরণসূয়ূর মোঘবাক্।।

৬ শ্লো, ১০অ, ১১স্ক (ভাগবৎ)

বঙ্গানুবাদ ঃ "গুরুসেবকের ধর্ম এই যে শিষ্য ব্যক্তি অভিমানশূণ্য, নিরহঙ্কৃত অনলস, মমতারহিত, সৌহৃদ্যবিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূণ্য ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন।"

অধ্যায় - ৪৩-৪৪

মহাসমাধির দিকে (২)

সমাধি মন্দির, ইঁট খন্ডন, ৭২ ঘন্টার সমাধি; বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস, বাবার অমৃততুল্য বচন।

মূল গ্রন্থে ৪৩ ও ৪৪ অধ্যায়ে বাবার নির্বাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই গ্রন্থে সেগুলি সংযুক্ত রূপে লেখা হচ্ছে।

পূর্বপ্রস্তুতি- সমাধি মন্দির ঃ-

হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে মরণাপন্ন মানুষকে ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে শোনান হয়। এর প্রধান কারণ শুধু একটাই যাতে তার মন সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যুক্ত হয়। সেই প্রাণী কর্মবশ পরের জন্মে যে দেহ ধারণ করবে, তাতে যেন সে সদ্‌গতি প্রাপ্ত করে। সবাই জানে যে যখন রাজা পরীক্ষিতকে ব্রহ্মর্ষি পুত্র শাপ দেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল তখন মহাত্মা শুকদেব ওঁকে সেই সাতদিন শ্রীমদ্ ভাগবৎ পুরাণ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ফলে রাজা পরীক্ষিত মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। এই প্রথাটি এখনো অনুসরণ করা হয়। গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদি পবিত্র গ্রন্থ আজও মরণোন্মুখ মানুষকে শোনান হয়। বাবা তো স্বয়ং ঈশ্বরাবতার। তাই তাঁর কোন বাহ্য সাধন ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেবল লোকেদের কাছে উদাহরণ প্রস্তুত করার জন্যই তিনি এই প্রথা উপেক্ষা করেননি। যখন তিনি জানতে পারেন যে এবার শীঘ্রই এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন তখন তিনি শ্রী ওয়ঝেকে 'রাম বিজয়' প্রকরণ পড়ে শোনাতে আদেশ দেন। শ্রী ওয়ঝে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পাঠ করেন। এরপর বাবা ওঁকে আট প্রহর 'পাঠ করার আজ্ঞা দেন। শ্রীওয়ঝে ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আবৃত্তি তিন দিনে শেষ করে ফেলেন এবং এই ভাবে ১১ দিন কেটে যায়। এরপর উনি আরো তিন দিন পাঠ করেন। এবার শ্রীওয়ঝে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েলেন। বাবা শান্ত ও আত্মস্থিত হয়ে শেষ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করতে শুরু করেন। এর দু-তিন দিন আগেই বাবা তাঁর ভোরবেলায় বেড়ানো এবং ভিক্ষা সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি মস্‌জিদেই বসতে শুরু করেন। নিজের শেষ সময়ের প্রতি পূর্ণ রূপে সচেতন ছিলেন। ভক্তদের ধৈর্য্য রাখতে বলতেন কিন্তু নিজের মহানির্বাণের নিশ্চিত সময় প্রকাশ করেননি। এই সময় কাকাসাহেব দীক্ষিত

ও শ্রীমান বুটী রোজ বাবার সঙ্গে একত্রে মস্‌জিদে আহার করতেন। মহানির্বাণের দিন (১৫-ই অক্টোবর) আরতি শেষ হওয়ার পর বাবা ওঁদের নিজের 'ওয়াড়া'য় খাওয়ার জন্য ফিরে যেতে বলেন। তবুও লক্ষ্মীবাঈ শিন্দে, ভাগোজী শিন্দে, বয়াজী লক্ষ্মণ বালাশিম্পী এবং নানাসাহেব নিমোনকর সেখানেই বসে রইলেন। শামা মস্‌জিদের সিঁড়িতে বসে ছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে ন' টাকা দেওয়ার পর বাবা বলেন- "আমার মস্‌জিদে আর ভালো লাগছে না, তাই আমায় বুটীর পাথর ওয়াড়ায় নিয়ে চলো, সেখানে আমি ভালো থাকব।" এই শেষ কথাগুলি বলে বাবা বয়াজীর দেহের উপর ভর দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভাগোজী দেখেন যে বাবার শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেছে। নানাসাহেব নিমোনকরকে ডেকে এই কথা জানান। নানাসাহেব একটু জল এনে বাবাকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা বাইরেই গড়িয়ে পড়ে। সেই দেখে উনি চেঁচিয়ে ওঠেন- "ও দেব!" তখন বাবাকে দেখে মনে হয় যেন তিনি ধীরে করে চোখ খুলে হাল্কা স্বরে 'আহ্' বললেন। কিন্তু এবার পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি সত্যি সত্যি পঞ্চভূতের শরীর ত্যাগ করেছেন। "বাবা সমাধিস্থ হয়েছেন" - এই হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদ দাবানলের মত তক্ষুনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাতারে কাতারে লোক- আবালবৃদ্ধবনিতা মস্‌জিদে দৌড়য়। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সবার হৃদয়ের উপর যেন বজ্রপাত হয়। শোকে ব্যাকুল হয়ে কেউ জোরে-জোরে কাঁদছিল, কেউ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছিল তো কেউ অজ্ঞান হয়ে শিরডীর রাস্তার উপর পড়েছিল। প্রত্যেকে বেদনায় ম্রিয়মান। শিরডীতে গ্রামবাসীদের কান্নায় ও আর্তনাদে প্রলয় কালের তান্ডব নৃত্যের দৃশ্য ভেসে উঠল। ওদের এই মহান দুঃখে কে এসে সান্ত্বনা দেবে যখন ওরা সাক্ষাৎ সগুণ পরমব্রহ্মের সান্নিধ্য হারিয়ে ফেলেল? এই দুঃখের বর্ণনাই বা কে করতে পারে? এবার কয়েকজন ভক্তের বাবার কথাগুলি মনে পড়ে। কেউ বলল- "মহারাজ (সাই বাবা) বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি আট বছরের বালকের রূপে আবার প্রকট হবেন।" কৃষ্ণবতারেও চক্রপানী (ভগবান বিষ্ণু) এমনি লীলা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মা দেবকীকে আট বছরের এক বালকের রূপে দেখা দেন। তাঁর দিব্য তেজোময় স্বরূপ ও চার হাতে আয়ুধ (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম) শোভা পাচ্ছিল। নিজের সেই অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূ-ভার হাল্কা করেছিলেন। সাইবাবা তাঁর এই অবতারে নিজের ভক্তদের সঙ্গে এই জন্মের সম্বন্ধ বিকশিত করে যেন কোন কাজে কোথাও চলে গেছেন এবং ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন।

এবার সমস্যা হল যে বাবার শবদাহ কার্যাদি কিভাবে করা হবে। কয়েকজন মুসলমান বলেন যে তাঁর দেহকে কবরস্থানে সমাধিস্থ করে তার উপরে একটা সমাধি

মন্দির বানানো উচিত। খুশালচন্দ ও আমীর শক্করেরও এই মত ছিল। কিন্তু গ্রাম্য অধিকারী শ্রী রামচন্দ্র পাটীল দৃঢ় ও নিশ্চয়সূচক স্বরে বলেন- "তোমাদের এই নির্ণয়ে আমি রাজী নয়। তাঁর পবিত্র শরীরকে বুটী 'ওয়াড়া' ছাড়া অন্যত্র কোথাও রাখা হবে না।" এই ভাবে ভক্তদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং বাদ-বিবাদ ৩৬ ঘন্টা অবধি চলে। বুধবার ভোরবেলা বাবা লক্ষ্মণ মামা যোশীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং ওঁর হাত টেনে বলেন- "তাড়াতাড়ি ওঠো। বাপু সাহেব ভাবছে যে আমি মরে গেছি। তাই ও তো আসবে না। তুমি পূজো ও কাকড় আরতি করো।" লক্ষ্মণ মামা গ্রামের জ্যোতিষী, শামার মামা ও এক কর্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। উনি রোজ ভোরবেলা বাবার পূজো করতেন এবং তারপর গ্রামের দেবী-দেবতাদের। ওঁর বাবার প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাই এই দৃষ্টান্তের পর উনি পূজোর সামগ্রী সাজিয়ে আনলেন। বাবার মুখের আবরণ সরাতেই সেই নির্জীব অলৌকিক মহান প্রদীপ্ত প্রতিভার দর্শন করে উনি স্তব্ধ হয়ে যান। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই মৌলবীদের বিরোধের চিন্তা না করে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজো ও 'কাকড়' আরতি করেন। দুপুরে বাপুসাহেব যোগ অন্য ভক্তদের নিয়ে সেখানে আসেন এবং নিয়মমত মধ্যাহ্ন আরতিও করেন।

বাবার শেষ শ্রী বচন শ্রদ্ধা পূর্বক স্বীকার করে লোকেরা তাঁর পবিত্র দেহটিকে বুটী ওয়াড়াতে সমাধিস্থ করতে রাজী হয়। এবার সেই জায়গাটির মধ্যভাগ খোঁড়া আরম্ভ হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাহাতা থেকে সাব্ ইন্সপেক্টর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক লোকেরা সেখানে এসে জড়ো হয়। পরের দিন সকাল বেলা বম্বে থেকে আমীর ভাই ও কোপরগ্রাম থেকে মাম্লৎদারও সেখানে এসে পৌঁছন। কিন্তু ওঁরা এসে দেখেন যে লোকেরা এখনো একমত নয়। তখন ওঁরা মতদান করান এবং দেখেন যে অধিকাংশ লোক 'ওয়াড়া'র পক্ষতেই মত দিয়েছিল। তবুও ওঁরা এই বিষয়ে কালেক্টারের স্বীকৃতি অতি আবশ্যক মনে করেন। তখন কাকাসাহেব স্বয়ং আহমদনগর যেতে উদ্যত হন। কিন্তু বাবার প্রেরণায় বিপক্ষীরাও প্রস্তাব সহর্ষে স্বীকার করে নেয় এবং ওঁরা সবাই নিজেদের মতও ওয়াড়ার পক্ষেই দেন। অতএব বুধবার সন্ধ্যাবেলার বাবার পবিত্র শরীর খুব ধুমদাম করে ওয়াড়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বাবাকে সমাধিস্থ করা হল। কত ভক্তের দল আজও সেখানে আসে এবং এসে সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত করে। বালাসাহেব ভাটে এবং বাবার এক অনন্য ভক্ত শ্রী উপাসনী বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এ কথাটা প্রোফেসর নারকেও লক্ষ্য করেন যে বাবার শরীর ৩৬ ঘন্টা খোলা থাকা সত্ত্বেও শক্ত হয়ে যায় নি। তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ নমনীয় ছিল। তাই তাঁর কফ্নী খোলার সময় সেটা ছিঁড়তে হয়নি এবং সহজেই

খুলে নেওয়া হয়।

ইট ভাঙ্গা ঃ-

বাবার মহাপ্রয়াণের কয়েকদিন আগে একটা কুলক্ষণ ঘটে- যেন ভাবী দুর্য্যোগের ইঙ্গিত। মস্‌জিদে একটা পুরানো ইঁট ছিল যার উপরে বাবা হাত রেখে বসতেন। রাত্রিবেলা বাবা তার উপরে মাথা রেখে শুতেন। এই ব্যবস্থাটা অনেক বছর চলে। সেইদিন বাবার অনুপস্থিতিতে একটি ছেলে ঝাড়ু দেওয়ার সময় ইঁটটা হাতে ওঠায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁটটা ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে দুটুকরো হয়ে যায়। বাবা যখন এই কথাটা জানতে পারেন তখন তিনি খুব দুঃখিত হন এবং বলেন- "এই ইঁটটা ভাঙ্গায় আমার ভাগ্যই ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। ঐটি ছিল আমার জীবনসঙ্গিনী। ওঁকেই কাছে রেখে আমি আত্মচিন্তন করতাম। ঐটি আমার প্রাণপ্রিয় ছিল। আজ ও আমায় ছেড়ে চলে গেল।" অনেকে ভাবতে পারে যে বাবার কি ইঁটের মত তুচ্ছ জিনিষের জন্য শোক করা উচিত ছিল? এর উত্তর হেমাডপন্ত এই ভাবে দেন যে সাধু-সন্তরা জগতের উদ্ধার এবং দীন ও অনাশ্রিতদের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হন। তাঁরা যখন নরদেহ ধারণ করেন তখন তাঁরা তদোনুরূই আচরণ করেন অর্থাৎ বাহ্য রূপে অন্যান্য লোকেদের মতই হাসেন, খেলেন এবং কাঁদেন। কিন্তু অন্তরে তাঁরা নিজেদের অবতার কার্য্য এবং তার লক্ষ্যের বিষয় সদৈব সজাগ থাকেন।

৭২ ঘন্টার সমাধি ঃ-

এই ঘটনার ৩২ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃীষ্টাব্দে বাবা একবার জীবনরেখা পার করার একটা প্রয়াস করেছিলেন। একটি অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দিনে বাবার হাঁপানিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা নিজের 'প্রাণ' ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ হওয়া স্থির করেন। অতএব উনি ভগত মহালসাপতিকে বলেন- "তুমি আমার দেহটা তিন দিন পাহারা দিও। আমি যদি ফিরে আসি তো ভালো, নাহলে ঐ স্থানে (একটা জায়গা ইঙ্গিত করে) আমার সমাধি বানিয়ে দিও এবং দুটো ধ্বজা চিহ্নস্বরূপ লাগিয়ে দিও।" এই বলে বাবা প্রায় রাত দশটার সময় মাটিতে শুয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল যেন তাঁর শরীরে প্রাণই নেই। লোকেরা, যাদের মধ্যে গ্রামবাসীরাও ছিল, সেখানে একত্রিত হয়েছিল। শরীরটি পরীক্ষা করার পর বাবা যেখানে বলেছিলেন, সেখানে তাঁর দেহটি সমাধিস্থ করার আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু ভগত মহালসাপতি তাদের বাধা দেন। বাবার নিশ্চল

দেহটি নিজের কোলে রেখে তিন দিন অবধি সেটি রক্ষা করেন। তিন দিন কেটে গেলে রাত্তির প্রায় তিনটে নাগাদ প্রাণ ফেরার চিহ্ন দেখা যায়। তাঁর নির্জীব শরীর জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শ্বাস-প্রশ্বাস আবার সাধারণ হয়ে গেল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ে-চড়ে উঠল। তিনি চোখ খোলেন এবং জ্ঞানে ফিরে আসেন। এইটি এবং আরো অন্য প্রসঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবার আমরা এটি পাঠকদের উপরই ছাড়ছি যে, তাঁরাই নির্ণয় করুন যে বাবা অন্য লোকেদের মত সাড়ে তিন হাত লম্বা এক দেহধারী মানব ছিলেন, যিনি কিছু বছর দেহ ধারণ করার পর সেটি ত্যাগ করেন, না কি তিনি স্বয়ং আত্মজ্যোতিস্বরূপ। পাঁচ মহাভূত দ্বারা নির্মিত হওয়ার দরুণ শরীরের নাশ হওয়া তো সুনিশ্চিত। কিন্তু সদ্‌বস্তু (আত্মা) অন্তঃকরণে বিরাজমান, যথার্থে সেই সত্য। তার রূপ নেই, শেষ নেই আর বিনাশও নেই। এই শুদ্ধ চৈতন্যধন বা ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণকারী যে তত্ত্ব, সেইটিই সাই, যিনি সংসারের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান এবং যেনি সর্বব্যাপী। নিজের অবতার কার্য্য করার জন্য তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন। সেই কাজ পুরো হওয়ায় পর তিনি দেহ ত্যাগ করে আবার শাশ্বত স্বরূপ ধারণ করেন। শ্রী দত্তাত্রয়ের পূর্ণ অবতার গাণগাপুরের শ্রী নৃসিংহ সরস্বতীর ন্যায় শ্রী স্বাই-এর মৃত্যু নেই। তাঁর নির্বাণ তো শুধু একটা নিয়মপালন মাত্র। তিনি জড় ও চেতন সব পদার্থেই ব্যাপ্ত এবং সর্বভূতের অন্তঃকরণের সঞ্চালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। এই সত্যটি এখনো অনুভব করা যেতে পারে এবং অনেকে এরকম অনুভব করেছে- যারা অনন্য ভাবে তাঁর শরণে গেছে এবং যারা অন্তঃকরণ হতে তাঁর উপাসক। যদিও বাবার স্বরূপ এখন আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তবুও শিরডীতে গেলে মস্‌জিদে রাখা তাঁর জীবন্ত চিত্রটি (বাবার এক প্রসিদ্ধ শিল্পী ভক্ত শ্রী শামরাও জয়কর এটি এঁকেছিলেন) দেখতে পাব। এক কল্পনাশীল ও ভক্তিমান দর্শককে এই চিত্রটি এখনো বাবার সাক্ষাৎ দর্শনের সন্তোষ ও সুখ প্রদান করে। বাবা এখন আর দেহে নেই। কিন্তু তিনি সর্বভূতে ব্যাপ্ত এবং ভক্তদের কল্যাণ করছেন ও করবেন- যেমনটি তিনি জীবিতকালে করতেন। বাবা তো সন্তদের ন্যায় অমর। যদিও আবরণ রূপী নরদেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তো স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি যিনি সময় সময় ভূতলে অবতীর্ণ হন।

বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস :-

যোগে সন্ন্যাসের বিষয়ে আলোচনা করে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করেছেন। শ্রী সখারাম হরি ওরফে বাপুসাহেব যোগ পুণের বিষ্ণু বুওয়া যোগের কাকা ছিলেন।

উনি লোক নির্মান বিভাগে (P.W.D.) পর্যবেক্ষক ছিলেন। অবসর গ্রহণ করার পর সপত্নীক শিরডীতে এসে থাকতে আরম্ভ করেন। ওঁর কোন ছেলেপিলে ছিল না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই শ্রী সাই চরণে অচল শ্রদ্ধা ছিল। ওঁরা দুজনে বাবার পূজো ও সেবাতেই নিজেদের দিন কাটাতেন। মেঘার মৃত্যুর পর বাপুসাহেব বাবার মহাসমাধি পর্যন্ত মস্‌জিদে ও চাওড়ীতে আরতি করতেন। ওঁকে সাঠে ওয়াড়াতে শ্রী জ্ঞানেশ্বরী ও শ্রী একনাথী ভাগবৎ পড়ার ও তার ভাবার্থ শ্রোতাদের বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই ভাবে অনেক বছর সেবা করার পর উনি একবার বাবার কাছে প্রার্থনা করেন- "হে আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয়। আপনার পূজনীয় চরণ দর্শন করে সমস্ত প্রাণীরা পরম শান্তি অনুভব করে। আমি এই শ্রীচরণের ছায়ার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমার চঞ্চল মন শান্ত ও স্থির হল না। এত বছরের আমার সন্ত সমাগম কি ব্যর্থ হবে? আমার জীবনে সেই শুভ দিন কবে আসবে, যখন আপনার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পড়বে?"

ভক্তের প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয়। তিনি উত্তর দেন- "কিছুদিনের মধ্যেই তোমার অশুভ কর্ম শেষ হয়ে যাবে এবং পাপ-পুণ্য শীঘ্রই জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। আমি তোমায় সেদিন ভাগ্যবান মনে করব, যেদিন তুমি ঐন্দ্রিক বিষয়গুলিকে তুচ্ছ মনে করে সমস্ত পদার্থের প্রতি উদাসীন হয়ে অনন্য ভাবে ঈশ্বর ভক্তি প্রাপ্ত করে সন্ন্যাস ধারণ করবে।" কিছুদিন পর বাবার কথা সত্য প্রমাণিত হয়। ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওর আর কোন দায়িত্ব বাকী থাকে না। উনি এবার স্বতন্ত্র হলেন। মৃত্যুর আগে সন্ন্যাস ধারণ করে নিজের জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে সফল হন।

বাবার অমৃততুল্য কথা ঃ-

দয়ানিধি কৃপালু শ্রীসাই সমর্থ মস্‌জিদে (দ্বারকা মাই) অনেক বার নিম্নলিখিত অমৃত বচন বলতেন- "**যে আমায় অত্যধিক ভালবাসে, সে সদাই আমার দর্শন পায়। ওর জন্য আমি ছাড়া সমগ্র জগত শূণ্য। ও কেবল আমারই শরণাপন্ন হয় এবং সর্বদা আমাকেই স্মরণ করে নিজের উপর ওর সেই ঋণ ওকে মুক্তি (আত্মোপলব্ধি) প্রদান করে চুকিয়ে দিই। যে আমারই চিন্তন করে এবং আমার প্রেমই যার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, সে আমার সঙ্গে মিলে ঐরূপ একাকার হয়ে যায় যেমন নদী সমুদ্রের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। অতএব মহত্ত্ব ও অহংকার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে আমার প্রতি, যিনি তোমার হৃদয়ে আসীন, পূর্ণ**

রূপে সমর্পিত হয়ে যাওয়া উচিত।"

এই 'আমি' কে? ঃ-

শ্রী সাইবাবা অনেক বার বুঝিয়েছেন এই 'আমি'টি কে। এই আমিকে খোঁজবার জন্য বেশী দূর যাওয়ার দরকার নেই। তোমার নাম ও চেহারা বাদ দিলে 'আমি' তোমার অন্তঃকরণে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যধন স্বরূপ বিদ্যমান এবং এটাই 'আমি'-র স্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা **তুমি নিজের ও সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আমাকেই দর্শন করো। যদি তুমি নিত্য এই রূপ অভ্যাস করো তাহলে আমার সর্বব্যপকতা শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারবে এবং আমার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করবে।**

অতএব হেমাডপন্ত পাঠকদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে তাঁদের অনুরোধ করছেন যে তাঁরা যেন সকল দেবী-দেবতা, সন্ত ও ভক্তদের শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। বাবা সদৈব বলতেন- "যে **অন্যদের দুঃখ দেয় সে আমার হৃদয়কে ব্যথা দেয়, এবং আমাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু যে স্বয়ং কষ্ট সহ্য করে, সে আমার বেশী প্রিয়।**" বাবা সব প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাদের সব দিক দিয়ে রক্ষা করেন। সমস্ত প্রাণীদের ভালবাসো, এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে। এই ধরনের বিশুদ্ধ অমৃতময় স্রোত তাঁর শ্রীমুখ থেকে সর্বদা প্রবাহিত হত। অতএব যারা প্রেমপূর্বক বাবার লীলাগান করবেন ও সেগুলি ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করবেন, তাঁরা সাইয়ের সাথে অবশ্যই অভিন্নতা প্রাপ্ত করবেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৫

কাকাসাহেব দীক্ষিতের সন্দেহ এবং আনন্দ রাও-য়ের স্বপ্ন, বাবার শোওয়ার তক্তা।

প্রস্তাবনা ঃ-

গত তিন অধ্যায়ে বাবার নির্বাণের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এখন বাবার সাক্ষাৎ স্বরূপ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর নিরাকার স্বরূপ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। এ পর্যন্ত বাবার জীবিতকালের ঘটনা ও লীলাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সমাধিস্থ হওয়ার পরও অনেক লীলা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে **বাবা অমর এবং আগের মতনই নিজের ভক্তদের সাহায্য প্রদান করছেন**। জীবিতকালে বাবার সংস্পর্শ বা সৎসঙ্গ যারা লাভ করেছিল তাদের ভ্যাগের প্রশংসা কেই বা করতে পারে? তবুও যদি তাদের মধ্যে কারও-কারও ঐন্দ্রিক ও সাংসারিক সুখের প্রতি বৈরাগ্য না এসে থাকে তাহলে সেটাকে তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যে কথাটি সে সময় অনুসরণ করা উচিত ছিল এবং এখনো করা উচিত সেটা হল অনন্য ভাবে বাবার প্রতি ভক্তি। সমস্ত চেতনা, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও মনকে একাগ্র করে বাবার পূজো বা ধ্যানাদি করার অভিলাষ যদি থাকে তো সেটা শুদ্ধ মন ও অন্তঃকরণ দিয়ে করা উচিত।

পতিব্রতা স্ত্রীর পতিপ্রেমের উপমা কখনো-কখনো লোকেরা গুরু-শিষ্যর প্রেমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে। তবুও শিষ্য ও গুরুর প্রেমের তুলনায় পতিব্রতার প্রেম শুষ্ক এবং অসাড়। মা, বাবা, ভাই বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন জীবনের লক্ষ্য (আত্মসাক্ষাত্কার) প্রাপ্ত করাতে কোন সাহায্য করতে পারে না। তার জন্য আমাদের স্বয়ং নিজের পথ অন্বেষণ করে আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হতে হয়। সত্য ও অসত্যের বিবেক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখের ত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং শুধুমাত্র মোক্ষের ইচ্ছে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। অন্যদের উপর নির্ভর না করে নিজেদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে। যদি আমরা এই ভাবে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কর্ম করার অভ্যাস করি তাহলে সহজেই অনুভব করতে পারব যে, এই সংসার নশ্বর ও মিথ্যা। তখন সাংসারিক পদার্থের প্রতি আমাদের আসক্তি উত্তরোত্তর কম হতে থাকবে এবং শেষে তাদের প্রতি বৈরাগ্য সহজেই উৎপন্ন হবে। তার পরই এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে যে ব্রহ্ম আমাদের গুরু

ভিন্ন আর কেউ নন। বরং আসলে তিনি সদ্‌বস্তু (পরমাত্মা) এবং এই দৃশ্যমান জগৎ তাঁরই প্রতিবিম্ব। অতএব এই ভাবে প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে তাঁকেই দর্শন করে তাঁর পূজো করা উচিত। এই সাম্য ভাবই দৃশ্যমান জগতের প্রতি ঔদাসীন্য জাগরিত করার জন্য মূল মন্ত্র। এই সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর হয়ে ব্রহ্ম বা গুরুকে অনন্য ভাবে ভক্তি করলে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আত্মবোধ অর্জন করা যায়। সংক্ষেপে, গুরুর কীর্তন ও তাঁর ধ্যান আমাদের সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন করার যোগ্যতা প্রদান করে এবং তার ফলেই পরমানন্দ লাভ হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত ঘটনা এই তথ্যের প্রমাণ-

কাকাসাহেবের সন্দেহ ও আনন্দরাও-এর স্বপ্ন ঃ-

সকলেই জানে যে বাবা শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিতকে শ্রী একনাথ মহারাজের দুটি গ্রন্থ ১) শ্রীমদ্‌ভাগবৎ ২) ভাবার্থ রামায়ণ রোজ পাঠ করার আদেশ দিয়েছিলেন। বাবার জীবৎকালে কাকাসাহেব এই গ্রন্থগুলি প্রত্যহ পাঠ করতেন (বাবার দেহরক্ষার পরও সেই অভ্যাস ত্যাগ করেননি)। একবার চৌপাটীতে (বম্বে) কাকাসাহেব ভোরবেলা একনাথী ভাগবৎ পাঠ করছিলেন। মাধবরাও দেশপান্ডে (শামা) এবং কাকা মহাজনীও ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুজনেই মন দিয়ে পাঠ শ্রবণ করছিলেন। সেই সময় একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়া হচ্ছিল। গ্রন্থের এই অংশ বিশেষটিতে 'নবনাথ' এবং তাঁদের ভক্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ঋষভ বংশের নয় জন নাথ বা সিদ্ধযোগী যেমন- কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন ভাগবৎ ধর্মের মহিমা রাজা জনককে বুঝিয়েছিলেন। রাজা জনক এঁদের প্রত্যেককে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং এঁরা সবাই সন্তোষজনক উত্তর দেন। কবি ভাগবত ধর্ম, হরি ভক্তির বৈশিষ্ট্য, অন্তরিক্ষ মায়া কি, প্রবুদ্ধ মায়া থেকে মুক্তির বিধি, পিপ্পলায়ন পরমব্রহ্মের স্বরূপ, আবিহোত্র কর্মের স্বরূপ, দ্রুমিল পরমাত্মার অবতার ও লীলা, চমস নাস্তিকের মৃত্যুর পর গতি এবং করভাজন কলিকালে ভক্তির পদ্ধতির যথাবিধি বর্ণনা করেন। এই সবের একটাই মানে বেরোয় যে কলিযুগে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন কেবল হরিকীর্তন বা গুরু চরণের চিন্তন। গ্রন্থ পাঠ শেষ হলে কাকাসাহেব খুবই নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে মাধররাও এবং অন্য উপস্থিত লোকেদের বলেন- "নবনাথদের ভক্তি-পদ্ধতির গরিমা কে না গায়? কিন্তু সেগুলি অভ্যাস করা কত দুষ্কর? তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত। কিন্তু আমাদের মত মূর্খদের মধ্যে কোন ধরনের ভক্তি উৎপন্ন হওয়া কি কখনো সম্ভব হতে পারে? অনেক জন্মের পরও ঐ রকম ভক্তি প্রাপ্ত হয় না। তাহলে আর মুক্তি পাব কি করে? আমার তো মনে হচ্ছে যে আমাদের জন্য কোন আশাই নেই।" মাধবরাও -য়ের এই ধরনের নিরাশাবাদ ধারণা

ভাল লাগে না। উনি বলেন- "আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমরা বাবার মত অমূল্য হীরে (গুরু-রত্ন) পেয়েছি। তাই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বাবার প্রতি অচল বিশ্বাস থাকলে চিন্তার কোন কারণ দেখি না? নবনাথদের ভক্তি হয়ত অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী দৃঢ় এবং প্রবল, কিন্তু আমরাও কি প্রেম ও শ্রদ্ধাপূর্বক ভক্তি করছি না? বাবা অভ্রান্ত ভাবে ও অধিকার পূর্ণ শব্দে বলেননি কি যে শ্রীহরি বা গুরুর নাম জপ করলেই মুক্তি লাভ হবে? তবে আর ভয় বা চিন্তার কি কারণ থাকতে পারে?" কিন্তু মাধবরাও-য়ের এই আশ্বাসে কাকাসাহেবের সন্দেহ দূর হয় না। উনি সারাদিন চিন্তিত ও ব্যগ্র হয়ে থাকেন। এই চিন্তাতেই ডুবে ছিলেন যে কি ভাবে নবনাথদের মত ভক্তি প্রাপ্ত করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে আনন্দরাও পাখার্ডে নামক এক ভদ্রলোক মাধবরাওকে খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছন। সেই সময় ভাগবৎ পাঠ চলছিল। শ্রী পাখার্ডেও মাধবরাও-য়ের কাছে গিয়ে বসেন ও ওঁর সাথে ফিস্-ফিস্ করে কথা বলতে শুরু করেন। উনি নিজের স্বপ্ন মাধবরাওকে শোনাচ্ছিলেন। এঁদের কানাঘুষায় পাঠে বাধা পড়ছিল। অতএব কাকাসাহেব পাঠ বন্ধ করে মাধবরাওকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি ব্যাপার, কি কথা হচ্ছে?" মাধবরাও বলেন- "গতকাল তুমি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে, এইটি তারই সমাধান। গতকাল বাবা শ্রী পাখার্ডেকে স্বপ্ন দেন, সেটি ওঁর কাছেই শোন। **এতে বলা হয়েছে যে বিশেষ বা অসাধারণ ভক্তির কোন প্রয়োজন নেই। কেবল গুরুকে নমন এবং তাঁর চরণপূজোই যথেষ্ট।**"

সবারই স্বপ্নটি শোনার তীব্র উৎকণ্ঠা হচ্ছিল, বিশেষ করে কাকাসাহেবের। সবার অনুরোধে শ্রী পাখার্ডে নিজের স্বপ্নের বিষয়ে বলতে শুরু করেন- "আমি দেখলাম যে এক গভীর সাগরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কোমর অবধি জল এবং হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই শ্রী সাইবাবাকে দেখতে পেলাম। তিনি একটি রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে বসে পা ডুবিয়ে আছেন। এই সুন্দর দৃশ্য ও বাবার মনোহর স্বরূপ দেখে আমার চিত্ত বড়ই প্রসন্ন হয়। এই দর্শন এত বাস্তব যে স্বপ্ন বলে আমার মনেই হচ্ছিল না। আমি দেখি যে মাধবরাওও সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি আমায় আবেগের সঙ্গে বলেন, "আনন্দরাও! বাবার শ্রীচরণ ছোঁও।" আমি উত্তর দিই- "আমিও ত তাই করতে চাই, কিন্তু ওঁর শ্রীচরণ তো জলের নীচে। এবার বলো আমি কি করে নিজের মাথা, ওঁর চরণে রাখি? আমি নিরুপায়!" এই শুনে শামা বাবাকে বলেন- "ও দেব! দয়া করে আপনার পা দুটি জল থেকে তুলুন।" বাবা তক্ষুনি তাঁর পা দুটি তুললেন এবং তৎক্ষণাৎ আমিও তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি। বাবা আমায় আশীর্বাদ করে বললেন - "তোমার কল্যাণ হোক। তুমি পরমার্থ লাভ করবে। ঘাবড়াবার বা চিন্তা করার কোন দরকার

নেই।" উনি আমায় এও বলেন- "একটি জরি পাড়ের ধুতি আমার শামাকে দিও, তাতে তোমার খুব লাভ হবে।"

বাবার আদেশানুযায়ী শ্রী পাখার্ডে একটা ধুতি এনেছিলেন এবং কাকাসাহেবকে অনুরোধ করেন- "দয়া করে এটি মাধবরাওকে দিন।" কিন্তু মাধবরাও সেটি নিতে রাজী হন না।

উনি বলেন- "বাবা যদি আমাকে গ্রহণের জন্য কোন আভাস বা ইঙ্গিত দেন তবেই আমি এটি নেব, নাহলে নয়।" একটু তর্ক-তর্কির পর কাকাসাহেব দৈব-আদেশসূচক চিরকূট বার করে এই সমস্যার সমাধান করা স্থির করেন। কাকাসাহেবের নিয়ম ছিল যে যখনই উনি কোন সন্দেহের সম্মুখীন হতেন তখন দুটি চিরকুটের উপর 'স্বীকার' 'অস্বীকার' লিখে তার থেকে একটা তুলে নিতেন। তাতে যা উত্তর পেতেন সেই মতই কাজ করতেন। তাই উপযুক্ত বিধি অনুসারে দুটো চিরকুট লিখে বাবার ছবির সামনে রাখা হল এবং একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে তোলানো হল। 'স্বীকার' লেখা কাগজটি ওঠায় মাধবরাওকে ধুতিটি গ্রহণ করতে হল। এই ভাবে আনন্দরাও এবং মাধবরাও সন্তুষ্ট হন এবং কাকাসাহেবের সন্দেহও দূর হয়। ঘটনাটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে **অন্যান্য সাধু-সন্তদের বক্তব্যকে শ্রদ্ধা করা উচিত। নিজের মা অর্থাৎ গুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা অতি আবশ্যক। আমাদের কল্যাণের বিষয়ে অন্য লোকেদের চেয়ে তাঁর চিন্তা থাকে বেশী।**

বাবার নিম্নলিখিত কথাগুলি নিজের হৃদয় পটলে অঙ্কিত্ করে নাও - "এই বিশ্বে **অসংখ্য সাধু-সন্ত রয়েছেন। কিন্তু নিজের পিতাই (গুরু) আসল পিতা (আসল গুরু)। অন্যরা যতই-মধুর উপদেশ দিন, নিজের গুরুর উপদেশ ভোলা উচিত নয়।** সংক্ষেপে সার এই যে প্রাণ দিয়ে গুরুকে ভালবাসো, তাঁর শরণে যাও এবং তাঁকে শ্রদ্ধাবনত হয়ে প্রণাম করো। তবেই তুমি দেখতে পাবে যে তোমার সামনে ভবসাগরের অস্তিত্ব ঠিক তেমনি, যেমন সূর্য্যের সামনে অন্ধকার।"

বাবার শয়নের জন্য কাঠের তক্তা -

বাবা নিজের জীবনের পূর্বার্দ্ধে একটা কাঠের তক্তার উপর শুতেন। সেই তক্তাটি চার হাত লম্বা এবং এক হাত চওড়া ছিল, যার চার কোণায় চারটি মাটির প্রদীপ জ্বলতো। পরে বাবা সেটি টুকরো-টুকরো করে ফেলে দেন (এর বর্ণনা দশম অধ্যায়ে করা হয়েছে)। এক সময় বাবা ঐ তক্তাটির মাহাত্ম্য কাকাসাহেবকে বর্ণনা করে

শোনাচ্ছিলেন। কাকাসাহেব সব শুনে বলেন- "এখনো যদি আপনার তক্তায় শুতে ভালো লাগে তাহলে মস্‌জিদে একটা অন্য তক্তা ঝুলিয়ে দিচ্ছি। আপনি স্বচ্ছন্দে তার উপর শুতে পারেন। তখন বাবা বলেন- "মহালসাপতিকে নীচে ছেড়ে এখন আর আমি উপরে শুতে চাই না।" কাকাসাহেব বলেন- "যদি অনুমতি দেন তাহলে মহালসাপতির জন্য আমি আরেকটা তক্তা টাঙ্গিয়ে দিচ্ছি।"

বাবা বলেন- "সে তক্তার ওপর কি করে শুতে পারবে? এ কি অত সহজ কাজ? অনেক গুণ থাকলে তবেই পারা যায়। যে খোলা চোখে ঘুমোতে পারে সেইই এর যোগ্য পাত্র। আমি ঘুমোবার সময় প্রায়ই মহালসাপতিকে আমার পাশে বসে আমার বুকের উপর হাত রেখে হরি নাম জপ হচ্ছে কি না লক্ষ্য করতে বলি। যদি আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে তাহলে যেন তক্ষুনি জাগিয়ে দেয়। কিন্তু এতটুকুও সে করতে পারে না। সে নিজেই ঝিমুতে থাকে। যখন ভগতের হাত আমার ভারী মনে হয় তখন আমি জোরে ডেকে উঠি 'ও ভগত।' তখন ও ঘাবড়ে গিয়ে চোখ খোলে। যে মাটিতেই (ভূমিতে) ভালভাবে বসতে শুতে পারে না, যার আসন স্থির নয় এবং যে নিদ্রার দাস, সে কি ঝোলান তক্তায় শুতে পারবে?" অনেক সময়ই বাবা ভক্তদের বলতেন- "আমি আমার মত, সে তার মত।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৬

বাবার গয়া যাত্রা, দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কাহিনী।

এই অধ্যায়ে শামার কাশী, প্রয়াগ ও গয়া যাত্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বাবা (ছবিরূপে) কেমন করে সেখানে এঁদের আগেই পৌঁছেছিলেন সে কথা বলা হয়েছে এবং দুটি ছাগলের গত জন্মের ইতিহাসের বিষয়ে লেখা হয়েছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে সাই! আপনার শ্রীচরণ ধন্য এবং তার স্মৃতি কত আনন্দদায়ক। আপনার ভয়বিনাশকারী স্বরূপও ধন্য, যার প্রভাবে কর্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যদিও এখন আর আমরা আপনার সগুণ স্বরূপের দর্শন পাই না তবুও আপনি আপনার শ্রীচরণের শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দেন। আপনি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ শক্তি দিয়ে কাছের বা দূরের ভক্তদের নিজের কাছে টেনে তাদের এক দয়াময়ী মায়ের মতন জড়িয়ে ধরেন। হে সাই! ভক্তরা জানে না আপনার বাসস্থান কোথায়। কিন্তু আপনি এমন কৌশলে তাদের প্রেরণা দেন যে মনে হয় যেন আপনার অভয়হস্ত ওদের মাথার উপর সদাই রয়েছে। এইটি আপনারই কৃপা দৃষ্টির পরিণাম যে ওরা এক অজ্ঞাত সাহায্য সর্বদাই পায়। অহংকারের বশবর্ত্তী হয়ে উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান ও চতুর পুরুষও এই ভবসাগরের পাঁকে তলিয়ে যায়। কিন্তু হে সাই! আপনি কেবল নিজের শক্তির সাহায্যে অসহায় ও সরল ভক্তদের এই পাঁক থেকে বার করে তাদের রক্ষা করেন। পর্দার আড়ালে থেকে আপনিই সব খেলা খেলছেন। তবুও এমন অভিনয় করেন যেন সেগুলির সাথে আপনার কোন সম্পর্কই নেই। কেউই আপনার সম্পূর্ণ জীবনগাথা জানতে পারেনি। সে জন্য আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো পথ হচ্ছে- অনন্য ভাবে আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত হয়ে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একমাত্র আপনারই নাম স্মরণ করা। আপনি নিষ্কাম ভক্তদের সমস্ত ইচ্ছে পুরণ করে তাদের পরমানন্দ দেন। আপনার মধুর নামের উচ্চারণেই ভক্তদের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক গুণ হ্রাস হয়ে সাত্বিক ও ধার্মিক গুণের বিকাশ হয়। তার সাথে-সাথেই ওরা ধীরে-ধীরে বিবেক, বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করে। তখন আত্মস্থিত হয়ে গুরুর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত

হয় এবং এরই আরেক অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি অনন্য ভাবে শরণাগত হওয়া। এর নিশ্চিত প্রমাণ শুধু এটাই যে তখন আমাদের মন স্থির এবং শান্ত হয়। এই শরণাগতি, ভক্তি ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য অদ্বিতীয়। এর ফলেই ক্রমে ক্রমে আসে শান্তি, বৈরাগ্য, যশ ও মুক্তি। যদি বাবা তাঁর ভক্তদের উপর অনুগ্রহ করেন তাহলে তিনি সর্বদা তাদের কাছেই থাকেন। তাঁর ভক্তরা যেখানেই যাক না কেন তিনি কোন-না-কোন রূপে আগে থেকেই সেখানে পৌঁছে যেতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তারই উদাহরণ।

গয়া যাত্রা ঃ-

বাবার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার কয়েক বছর পর কাকাসাহেব দীক্ষিত নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাপুর নাগপুরে 'উপনয়ন' সংস্কার করাবেন স্থির করেন। প্রায় সেই সময়ই নানাসাহেব চাঁদোরকরও নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন স্থির করেন। দীক্ষিত ও চাঁদোরকর দুজনেই শিরডী এসে বাবাকে আন্তরিক ভাবে নিমন্ত্রণ করেন। বাবা তাঁর প্রতিনিধি শামাকে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু যখন ওঁরা বাবাকেই স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি উত্তর দেন- "বেনারস ও প্রয়াগ পেরিয়ে যাওয়ার পর আমি শামার আগেই পৌঁছে যাবো।" পাঠকগণ, এই শব্দগুলি একটু মনে রাখবেন কারণ, এইগুলি বাবার সর্বজ্ঞতার দ্যোতক।

বাবার অনুমতি নিয়ে শামা এই উৎসবগুলিতে যোগদান দিতে প্রথমে নাগপুর, গোয়ালিয়র এবং তারপর কাশী, প্রয়াগ ও গয়া যাওয়া স্থির করেন। আপ্পা কোতের শামার সঙ্গে যাওয়া ঠিক করেন। প্রথমে ওঁরা নাগপুর পৌঁছন। সেখানে কাকাসাহেব দীক্ষিত শামাকে হাতখরচের জন্য দুশো টাকা দেন। সেখান থেকে দুজনে গোয়ালিয়র যান। ওখানে নানাসাহেব চাঁদোরকর ১০০ টাকা ও তাঁর এক আত্মীয় শ্রী জাঠর ১০০ টাকা শামাকে দেন।

এরপর ওঁরা কাশী পৌঁছন যেখানে জাঠরের 'লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির' এবং অযোধ্যাতে 'শ্রীরাম মন্দিরে' ওঁদের সুন্দর আদর-আপ্যায়ণ করেন শ্রী জাঠরের ম্যানেজার। শামা ও কোতে অযোধ্যাতে ২১ দিন এবং কাশীতে (বেনারসে) দু-মাস থেকে গয়ার জন্য রওনা হন। গয়াতে নাকি খুব 'প্লেগ' হচ্ছে এই খবর ট্রেনে পেয়ে এঁদের একটু চিন্তা হয়। তবুও রাত্তিরে গয়া স্টেশনে নেমে ওঁরা একটা ধর্মশালায় গিয়ে ওঠেন। সকালবেলা গয়ার পূজারী (পান্ডা), যে যাত্রীদের থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করত, ওঁদের কাছে এসে বলে- "সব যাত্রীরা চলে গেছে, তাই আপনারাও এবার তাড়াতাড়ি করুন।"

শামা তখন ওকে জিজ্ঞাসা করেন- "এখানে কি প্লেগ ছড়িয়েছে?" তাতে পাণ্ডা উত্তর দেয়- "না, আপনারা নির্বিঘ্নে আমার বাড়ীতে এসে আসল পরিস্থিতিটা দেখতে পারেন।" এরপর ওঁরা ওর বাড়ী যান। বাড়ীতো নয়, এক বিশাল ভবন। সেখানে যাত্রীদের বিশ্রাম করার জায়গা ছিল। শামাকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। থাকার জায়গার সুবন্দোবস্ত দেখে শামার খুব ভালো লাগে। কিন্তু বাড়ীর সামনে এবং ঠিক মাঝখানে বাবার এক বড় প্রতিকৃতি দেখে শামা আনন্দে ও আবেগে আত্মহারা হয়ে যান। বাবার শব্দগুলি মনে পড়ে যায়- "আমি কাশী ও প্রয়াগ পেরিয়ে যাওয়ার পর শামার আগেই পৌঁছে যাবো।" শামার চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। ভাবাবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে গলা রুদ্ধ হল। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁর মুখ থেকে কোন কথা বেরোয় না। শামার এইরূপ অবস্থা দেখে পাণ্ডা ভাবে- "মনে হয় প্লেগের ভয়ে কাঁদছে।" কিন্তু শামা ওর কল্পনার বিপরীতই প্রশ্ন করে বসেন- "বাবার এই ছবিটি তুমি কোথায় পেলে?" তখন সে উত্তর দেয়- "আমার মনমাড়ে ও পূর্ণতাম্বেতে দু-তিন শো দালাল কাজ করে গয়া-যাত্রীদের সুখ-সুবিধা দেখবার জন্য। তাদের কাছেই শিরডীর সাই মহারাজের খ্যাতির কথা শুনতে পাই। প্রায় বারো বছর আগে আমি শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করি এবং ওখানেই শামার বাড়ীতে টাঙ্গানো এই ছবিটি আমায় আকর্ষিত করে। তখন বাবার নির্দেশ অনুযায়ী শামা আমায় যে ছবিটা উপহার দেন, এটি সেই ছবি।" শামার তখন সব কথা মনে পড়ে। গয়ার পাণ্ডা যখন জানতে পারে যে ইনি সেই শামা যিনি তাকে এই চিত্রটি দিয়ে অনুগৃহীত করেছিলেন এবং আজ তার বাড়ীতে অতিথি হয়ে এসেছেন, তখন ওর আনন্দের সীমা রইল না। দুজনেই এই সাক্ষাতে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এরপর সে শামাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাল। সে ছিল একজন ধনীলোক। নিজে পাল্কীতে চড়ে ও শামাকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে শহর ভ্রমণ করায় এবং সব রকম ভাবে শামার সুখ-সুবিধের খেয়াল রাখে। গল্পটির নীতি হচ্ছে এই যে বাবার কথা সর্বদাই সত্য হত। তাঁর নিজের ভক্তদের প্রতি তো স্নেহ ছিলই, তাছাড়া তিনি সব প্রাণীদেরই এইরূপ ভালবাসতেন এবং তাদের নিজেরই স্বরূপ মনে করতেন। নীচের গল্পটিতে এই কথারই আভাস পাওয়া যাবে।

দুটি ছাগল ঃ-

একবার লেন্ডী বাগান থেকে ফেরার সময় বাবা এক পাল ছাগল দেখতে পান। তাদের মধ্যে দুটি ছাগলের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাবা গিয়ে তাদের উপর হাত বোলান এবং ৩২ টাকায় দুটিকে কিনে নেন। বাবার এই বিচিত্র ব্যবহার দেখে ভক্তরা

খুব অবাক হয়। ওদের মনে হয় এই লেনদেনে বাবা ঠকে গেছেন, কারণ একটা ছাগলের দাম সেই সময় তিন-চার টাকার চেয়ে বেশী ছিল না। ঐ দুটি ছাগল আট টাকায় সহজেই পাওয়া যেতে পারত।

বাবাকে তাই ও ব্যাপারে খানিক কথা শুনতে হল। কিন্তু বাবা শান্ত হয়ে বসে রইলেন। এবার শামা ও তাত্য়া ছাগল কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাবা উত্তর দেন- "আমার কোন ঘর-সংসার বা স্ত্রী-পুত্র তো নেই, যাদের জন্য টাকা সঞ্চয় করে রাখতে হবে।" তারপর তিনি চার সের ডাল কিনে ছাগল দুটিকে খাওয়ান। খাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হলে তিনি ছাগল দুটিকে তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর তাদের পূর্বজন্মের কাহিনী এইরূপ শোনান- "শামা, তাত্য়া! তোমরা ভাবছ আমি ঠকে গেছি? কিন্তু তা নয়, এদের কাহিনী শোন। গত জন্মে এরা সহোদর ভাই ছিল এবং প্রথমে এদের মধ্যে পরস্পর খুব ভাব-ভালবাসা ছিল। কিন্তু পরে একজন অন্যজনের কট্টর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। বড় ভাই অলস প্রকৃতির ছিল। কিন্তু ছোট ভাই ছিল খুবই পরিশ্রমী এবং যথেষ্ট ধন উপার্জন করেছিল। তাই বড় ভাই ছোট ভাইকে হিংসে করত এবং তাকে মেরে তার ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা স্থির করে। ওরা নিজেদের সম্বন্ধের কথা ভুলে বিশ্রী ভাবে লড়াই-ঝগড়া করত। বড় ভাই অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ছোট ভাইকে মারতে পারে না। শেষে একদিন ছোট ভাইয়ের মাথায় লাঠি দিয়ে প্রহার করে। তখন ছোট ভাইও কুড়ুল দিয়ে বড় ভাইয়ের মাথা ফাটাল। দুজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল। তারপর নিজেদের কর্ম অনুসারে ওরা ছাগল হয়ে জন্মায়। ওরা যখন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমার ওদের পূর্ব ইতিহাস মনে পড়ায় দয়া হয়। তাই ওদের কিছু খাইয়ে দাইয়ে একটু আনন্দ দিতে ইচ্ছে হয়। কিছু টাকা তাই খরচ হয়ে গেল। আর তোমরা সেজন্য আমায় বকছ। তোমাদের এই লেনদেন ভালো লাগল না বলে আমি ওদের মেষ পালককে ফেরত দিয়ে দিই।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৭

পূর্বজন্ম ঃ বীরভদ্রাপ্পা এবং চেনবাসাপ্পার (সাপ ও ব্যাঙ্গ) কাহিনী

গত অধ্যায়ে দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়তে আরো কয়েকটি পূর্বজন্মের স্মৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

হে ত্রিগুণাতীত জ্ঞানবতার শ্রী সাই! তোমার মুখ মণ্ডল কত সুন্দর! হে অন্তর্যামী! তোমার শ্রীমুখের প্রভা ধন্য। সেটি ক্ষণিকের জন্য দেখলে পূর্বজন্মের সমস্ত দুঃখ নাশ হয়ে সুখের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু হে আমার প্রিয় শ্রী সাই! যদি তুমি নিজের স্বাভাবিক ও অহেতুক কৃপাদৃষ্টির আশীর্বাদ দাও তবেই এরকমটি হওয়া সম্ভব। তোমার দৃষ্টিমাত্রেই আমাদের কর্ম-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় এবং আমরা পরমানন্দ অনুভব করি। গঙ্গায় স্নান করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গঙ্গামাও সন্তদের আগমনের জন্য সর্বদা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করেন যে কবে তাঁরা এসে নিজেদের চরণধূলি দিয়ে তাঁকে পবিত্র করবেন। শ্রী সাই ত সন্ত চূড়ামণি! এবার তাঁরই শ্রীমুখ থেকে চিত্তশুদ্ধকারী একটি কাহিনী শুনুন।

সাপ এবং ব্যাঙ ঃ-

শ্রী সাইবাবা বলতে শুরু করেন - "একদিন সকালবেলা প্রায় ৮টা নাগাদ জলখাবারের পর আমি বেড়াতে বেরোই। হাঁটতে-হাঁটতে একটা ছোট নদীতীরে এসে পৌঁছই। আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই ওখানেই একটু বিশ্রাম করতে বসি। একটুক্ষণ পর স্নান করি। তখন গিয়ে আমার ক্লান্তি দূর হয় এবং আমি খানিকটা আরাম পাই। ঐ জায়গাটির কাছেই একটা গরুর গাড়ীর যাওয়ার মত সরু রাস্তা ছিল। তার দুদিকে ঘন গাছ ছিল। মৃদু মৃদু বাতাস বইছিল। আমি ছিলিম ভরতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা ব্যাঙের কর্কশ আওয়াজ শুনতে পাই। ঠিক সেই সময় একটি পথিক সেখানে এসে পৌঁছয় এবং আমাকে প্রণাম করে আমার কাছে এসে বসে। এরপর আমায় ওর বাড়ীতে গিয়ে খেতে ও বিশ্রাম করতে অনুরোধ করে। সে নিজেই ছিলিমটি ধরিয়ে আমায় দিল। এমন সময় ব্যাঙের ডাক শুনে সে তার রহস্য জানবার জন্য

উৎসুক হয়ে ওঠে। আমি ওকে জানাই- "একটা ব্যাঙ বিপদে পড়েছে এবং নিজের পূর্বজন্মের কর্মের ফল ভুগছে। **পূর্বজন্মের কু-কর্মের ফল এই জন্মে ভুগতেই হয়। অতএব এখন চেঁচিয়ে কিছু লাভ হবে না।**" এরপর লোকটি তামাক টেনে ছিলিমটি আমাকে দিয়ে বলে- "একটু দেখি ত ব্যাপারটা কি?" এই বলে সে উঠে দাঁড়ায়। তখন আমি ওকে জানাই যে একটা বড় সাপ ঐ ব্যাঙটাকে নিজের মুখে ধরে রেখেছে, তাই ও চেঁচাচ্ছে। দুজনেই পূর্বজন্মে বেজায় বদমাস ছিল। তাই এই জন্মে নিজেদের কর্মের ফল ভুগছে। আগন্তুক ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে যে সত্যি-সত্যি একটা বিরাট সাপ একটা বড় ব্যাঙকে মুখে ধরে রেখেছে। ও ফিরে এসে আমায় জানায় যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপটা ব্যাঙটাকে গিলে ফেলবে। আমি বললাম- "না, তা কখনোই হবে না। আমি ওর সংরক্ষক পিতা এবং এই সময় এইখানে উপস্থিত আছি। তবে সেই সাপের কি ক্ষমতা আছে যে সে ব্যাঙটাকে গিলে ফেলে? আমি কি শুধু শুধুই এখানে বসে আছি? এবার দেখো, আমি কি করে ওকে রক্ষা করি।" আবার ছিলিমে টান দিয়ে আমরা সেই স্থানে যাই। আগন্তুক ভয় পেয়ে সাপটির খুব কাছে যেতে আমায় মানা করে। আমি ওর কথায় কান না দিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং দুজনকে বললাম- "আরে, বীরভদ্রাপ্পা, তোমার শত্রু ব্যাঙ হয়ে জন্মে উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে যায়নি কি? ও ব্যাঙ হয়ে আর তুমিও সাপ হয়ে জন্মে এখনও তার শত্রুতা করছ? কত লজ্জার কথা! যাও, ঘৃণা ছেড়ে শান্তিতে থাক গে।' এই কথা শুনে সাপটা তাড়াতাড়ি ব্যাঙটাকে ছেড়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ব্যাঙটাও লাফিয়ে পালায় এবং ঝোপে লুকিয়ে যায়। ঐ পথিকটি এসব দেখে খুবই অবাক হয়। সে বুঝে উঠতে পারে না যে আমার শব্দগুলি শুনে সাপটা ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিল কেন এবং বীরভদ্রাপ্পা কে? ওদের শত্রুতার কারণ কি ছিল? এই সব প্রশ্নগুলি ওর মাথায় ঘুরছিল। আমি ওর সঙ্গে আবার ঐ গাছটার নীচে ফিরে এলাম। দুজনে মিলে খানিকটা ছিলিম টেনে নিয়ে আমি তখন ওর কাছে এর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করি -

"আমার বাড়ীর থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে একটা পবিত্র স্থানে মহাদেবের একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটির অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থা দেখে স্থানীয় লোকেরা সেটি মেরামত করাবার জন্য কিছু চাঁদা তোলে। বেশ কিছু টাকা সংগ্রহ হয়ে যায় এবং সেখানে নিত্য পূজোর ব্যবস্থা করে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একজন ধনী ব্যক্তিকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে তাকে সমস্ত কাজের ভার দেওয়া হয়। তার কাজ ছিল ব্যয় ইত্যাদির যথোচিত বিবরণ রেখে সততার সঙ্গে হিসেব রাখা। কিন্তু শেঠ ছিল এক নম্বরের কৃপন। সে মেরামতের কাজে খুবই কম টাকা খরচ করে। তাই

কাজও সেই অনুপাতে হয়। সব টাকা সে আত্মসাৎ করে বসল, নিজের তরফ থেকে একটা পয়সাও খরচ করল না। ওর কথাবার্তা ছিল খুব মিষ্টি। কাজ যে কিছুই এগোচ্ছে না- এ প্রশ্ন উঠলেই সে মিষ্টি কথায় লোকেদের ভুলিয়ে দিত। কাজটা আগের মতই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। লোকেরা আবার সংগঠিত হয়ে ওর কাছে গিয়ে বলে- 'শেঠ সাহেব, দয়া করে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন। আপনি চেষ্টা না করলে এই কাজটি শেষ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব আপনি আবার পরিকল্পনাটি তৈরী করুন। আমরা আরো চাঁদা তুলে আপনাকে দেব।" ওরা আবার চাঁদা তুলে শেঠকে দেয়। সে টাকাটা তো নিয়ে নেয়। কিন্তু আগের মতই চুপচাপ বসে রইল। কিছুদিন পর ওর স্ত্রীকে মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন- "ওঠো, মন্দিরের চূড়াটি তৈরী করাও। তুমি যতটা টাকা এই কাজের জন্য ব্যয় করবে তার শতগুণ আমি তোমায় দেব।" এই স্বপ্নের কথা ও নিজের স্বামীকে বলে। শেঠ ভয় পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। এই রকম কাজে তো অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে। তাই সে এ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে- "এ নিছক স্বপ্ন, একবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি সেরকম হত তাহলে মহাদেব আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকেই তো আদেশ দিতে পারতেন। আমি কি তোমার কাছ থেকে বেশী দূরে ছিলাম? এই স্বপ্ন শুভ নয়- এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষা-কষি পাকিয়ে তুলবে। তাই তুমি এ বিষয়ে চুপ থাকো। ভগবান অনিচ্ছায় দেওয়া দামী বস্তু বা অজস্র ধনের আশা কখনোই করেন না। তিনি তো প্রেম ও ভক্তি সহকারে দেওয়া একটা তুচ্ছ তামার টাকাই গ্রহণ করে নেন।" মহাদেব আবার স্ত্রীটিকে স্বপ্ন দেন- "তুমি তোমার স্বামীর নিরর্থক কথার ও তার সঞ্চিত টাকার গ্রাহ্য কোর না এবং ওকে মন্দির মেরামতের কাজেও জোর দিও না। আমি তো শুধু তোমারই প্রেম ও ভক্তি চাই। তোমার যতটা খরচ করতে ইচ্ছে হয়, নিজের সামর্থ হিসেবে করো।" পত্নী তখন তার বাবার দেওয়া গয়নাগুলো বিক্রী করবে ঠিক করে। এইবার কৃপণ শেঠ অশান্ত হয়ে ওঠে। সে ভগবানকেও ঠকাতে উদ্যত হয়। সে কেবল এক হাজার টাকায় স্ত্রীর সমস্ত গয়না নিজেই কিনে নেয় এবং একটা অনুর্বর জমি মন্দিরের জন্য দিয়ে দেয়। ওর স্ত্রীও চুপচাপ সেটা স্বীকার করে নেয়। শেঠ যে জমির টুকরোটি দেয় সেটা ওর নিজের ছিল না। একটি গরীব মহিলা 'দুবকী' সেটা শেঠের কাছে দুশো টাকায় বন্ধক দিয়েছিল। অনেক দিন পর্যন্ত ঋণ শোধ করে জমি ছাড়াতে পারেনি। ঐ ধূর্ত কৃপন নিজের স্ত্রী, 'দুবকী' ও ভগবানকেও ঠকালো। জমিটি ছিল একবারে বন্ধ্যা- বর্ষা ঋতুতেও কোন ফসল হত না। পরে সেটা মন্দিরের পুরোহিতের হাতে দেওয়া হয় এবং সে ওটা পেয়ে খুবই খুশী হয়।"

"কিছুদিন পর একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ভয়ানক ঝড় ওঠে এবং প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। ঐ কৃপণের বাড়ীতে বাজ পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মারা যায়। দুবকীও শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। পরের জন্মে ঐ কৃপণ মথুরার এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মায় এবং ওর নাম বীরভদ্রাপ্পা রাখা হয়। ওর স্ত্রী ঐ মন্দিরের পুরোহিতের বাড়ীতে মেয়ে হয়ে জন্মায় এবং ওর নাম 'গৌরী' রাখা হয়। "দুবকী" পুরুষ হয়ে মন্দিরের সেবাইতের পরিবারে জন্মায় এবং ওর নাম হল চেনবাসাপ্পা। পুরোহিত আমার বন্ধু ছিল এবং প্রায় আমার কাছে আসত, গল্পগুজব করত এবং আমার সঙ্গে তামাক টানত। ওর মেয়ে গৌরীও আমার ভক্তছিল। মেয়েটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। ওর বাবা ওর জন্য সৎপাত্রের খোঁজে জুটল। আমি ওকে জানাই- "চিন্তা করার দরকার নেই। বর নিজেই তোমার বাড়ীতে মেয়ের খোঁজে আসবে।" কিছুদিন পরই বীরভদ্রাপ্পা নামক একটি যুবক ভিক্ষে চাইতে-চাইতে ওর বাড়ীতে এসে পৌঁছয়। আমার সম্মতিতে গৌরীর বিয়ে ওর সাথে সম্পন্ন হয়। প্রথমে ও আমার ভক্ত ছিল, কিন্তু পরে সে কৃতঘ্ন হয়ে গেল। এই নতুন জন্মেও ওর ধন-তৃষ্ণা মেটেনি। ও আমার কাছে ব্যবসা ইত্যাদির বিষয়ে পরামর্শ চায়, কারণ ও তখন বিবাহিত। এই সময়ই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে যায়। গৌরীর ভাগ্যক্রমে জমিটির দাম বেড়ে যায় এবং পুরো ভাগটা এক লক্ষ টাকায় (গহনার দামের ১০০ গুণ) বিক্রী হয়ে যায়। এই ঠিক করা হয় যে ৫০ হাজার টাকা নগদ এবং ২০০০ টাকা প্রতি বছর কিস্তিতে শোধ করা হবে। সবাই এই বিষয়ে একমত হল। কিন্তু সেই টাকার ভাগের ব্যাপারে ঝগড়া বাঁধল। আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলে আমি বলি- "এই জমিটি তো ভগবানের এবং সেটি পুরোহিতকে দেওয়া হয়েছিল। এর কর্ত্রী তো গৌরীই এবং এক পয়সাও ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে খরচ করা উচিত নয়। ওর স্বামীর এর উপর কোন অধিকার নেই।' আমার কথা শুনে বীরভদ্রাপ্পা আমার উপর বেজায় রেগে উঠল। সে বলে- "তুমি গৌরীকে ফুসলিয়ে ওর টাকা হাতিয়ে নিতে চাও।" এই কথা শুনে আমি ভগবানের নাম নিয়ে চুপ করে বসে যাই। বীরভদ্রাপ্পা নিজের বৌকে মারেও। গৌরী দুপুর বেলা এসে আমায় বলে- "আপনি ওদের কথায় দুঃখ পাবেন না। আমি তো আপনার মেয়ে। আমার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।" ও যখন এই ভাবে আমার শরণ নিল, তখন আমি ওকে কথা দিই যে আমি সাত সমুদ্র পার করেও তাকে রক্ষা করব। সেই রাতেই গৌরী স্বপ্ন দেখল। মহাদেব ওকে বলছেন- "এই সব সম্পত্তি তোমারই এবং এর থেকে কাউকে কিছু দিও না। চেনবাসাপ্পার সাথে পরামর্শ করে কিছু টাকা মন্দিরের জন্য খরচ করো। যদি অন্য কোন ব্যাপারে খরচ করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মস্‌জিদে

গিয়ে বাবার (স্বয়ং আমি) সাথে পরামর্শ করো।" গৌরী নিজের স্বপ্নের কথা আমায় বলে এবং আমি ওকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে বলি- "মূল রাশি তুমি নাও ও সুদের অর্দ্ধেক ভাগ চেনবাসাপ্পাকে দাও। বীরভদ্রাপ্পার এর সাথে কোন সম্বন্ধ নেই।" আমরা যখন এই সব কথা বলছিলাম, ঠিক সেই সময় বীরভদ্রাপ্পা ও চেনবাসাপ্পা ঝগড়া করতে-করতে সেখানে এসে পৌঁছয়। আমি দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করি এবং গৌরীর স্বপ্নের কথাও উল্লেখ করি। কিন্তু বীরভদ্রাপ্পা রাগে পাগল হয়ে চেনবাসাপ্পাকে টুকরো-টুকরো করে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। চেনবাসাপ্পা একটু ভীতু প্রকৃতির লোক ছিল। সে আমার পা ধরে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে। তখন আমি শত্রুর হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে নিই। কিছুকাল পর দু-জনেই মারা যায়। বীরভদ্রাপ্পা সাপ হয়ে এবং চেনবাসাপ্পা ব্যাঙ হয়ে জন্মায়। চেনবাসাপ্পার ডাক শুনে এবং পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আমি নিজের কর্তব্য পালন করি। **বিপদের সময় ভগবান দৌড়ে নিজের ভক্তের কাছে যান। তিনি আমায় এখানে পাঠিয়ে চেনবাসাপ্পাকে বাঁচিয়ে নিলেন। এই সব ঈশ্বরীয় লীলা।"**

শিক্ষা ঃ-

এই কাহিনীর শিক্ষা হল যে- যে যেরকম কর্ম করে সে সেরকমই ফল পায়। আগের ঋণ এবং অন্য লোকেদের সাথে দেওয়া-নেওয়া যতক্ষন শোধ না হয়, ততক্ষন নিস্তার নেই। ধনতৃষ্ণা মানুষের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষে এরই জন্য বিনাশ ঘটে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪৮

সদ্গুরুর লক্ষণ, ভক্তদের আপদ নিবারণ - ১) শ্রী শেওড়ে ২) শ্রী সপ্টণেকর ও শ্রীমতী সপ্টণেকর ৩) সন্ততি দান।

অধ্যায়টি শুরু করার আগে কেউ হেমাডপন্তকে প্রশ্ন করে যে শ্রী সাইবাবা গুরু ছিলেন না সদ্গুরু। এর উত্তরে হেমাডপন্ত সদ্গুরুর ব্যাখ্যা এই ভাবে বর্ণনা করেছেন-

সদগুরুর লক্ষণ ঃ-

যে বেদ বেদান্ত এবং ছটি শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করে, ব্রহ্মবিষয়ক মধুর ব্যাখ্যা দিতে পারে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে সহজে ধ্যান মুদ্রায় বসে মন্ত্রোপদেশ দেয়, নিশ্চিত সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করার আদেশ দিয়ে কেবল নিজের বাক্চাতুর্য্যের সাহায্যে জীবনের লক্ষ্যের দর্শন করায় এবং যে নিজে আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করেনি, সে সদ্গুরু নয়। বরং যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে লৌকিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি ঔদাসীন্য উৎপন্ন করে আমাদের আত্মানুভূতির রসাস্বাদন করান এবং যিনি নিজের ভক্তদের কার্যকরী ও প্রত্যক্ষ (আত্মানুভূতি) করিয়ে দেন, তাঁকেই সদ্গুরু বলা হয়। যার নিজেই আত্মজ্ঞান হয় নি শিষ্যদের তা দেবেন কি করে? সদ্গুরু স্বপ্নেও নিজের শিষ্যদের কাছে কোন সেবা লাভ আশা করেন না, বরং স্বয়ং ওদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি এও কখনো মনে করেন না যে আমি একজন মহান লোক এবং আমার শিষ্য তুচ্ছ। তিনি শিষ্যকে নিজের ন্যায় (বা ব্রহ্মস্বরূপ) মনে করেন। সদ্গুরুর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর হৃদয়ে সর্বদা পরম শান্তি বিদ্যমান থাকে। তিনি কখনো অস্থির বা ব্যাকুল হন না এবং তাঁর নিজের জ্ঞানের বিষয়ে লেশমাত্র গর্ব রাখেন না। তাঁর কাছে রাজা-কাঙ্গাল, ছোট-বড় সব সমান।

হেমাডপন্ত বলেন- "আমার গত জন্মের সঞ্চিত পূণ্যফলেই শ্রী সাইবাবা মত সদ্গুরুর দর্শন ও তাঁর কৃপা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। বাবা নিজের যুবাবস্থায় ছিলিম ছাড়া কিছু সংগ্রহ করেন নি। তাঁর কোন ছেলে-পিলে, বন্ধু, ঘর সংসার বা অন্য কোন সহায় ছিল না। ১৮ বছর বয়স থেকেই তাঁর মনোনিগ্রহ বড়ই বিলক্ষণ ছিল। তিনি নির্ভয়ে নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং সর্বদা আত্মমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল- **"আমি সর্বদা ভক্তের অধীন।"** তিনি যখন বেঁচে ছিলেন সেই সময় ভক্তদের যে রকম অভিজ্ঞতা দিয়েছিলেন, মহাসমাধির পর আজও তাঁর প্রতি

অনুরক্ত ভক্তরা সে অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকেন। ভক্তদের শুধু নিজেদের হৃদয়ে প্রদীপটিতে ভক্তি-প্রেমের সল্‌তে জ্বালাতে হবে। জ্ঞান-জ্যোতি (আত্মসাক্ষাৎকার) নিজেই প্রকাশিত হয়ে উঠবে। **প্রেমের অভাবে শুষ্ক জ্ঞান বৃথা। এমন জ্ঞান কারো জন্যই লাভপ্রদ হয় না।** তাই আমাদের প্রেম অসীম এবং অটুট হওয়া উচিত। প্রেমের কীর্তির গুণগান কেই বা করতে পারে? তার তুলনায় সমস্ত বস্তু তুচ্ছ মনে হয়। প্রেমাঙ্কুর উদয় হতেই ভক্তি ও বৈরাগ্য, শান্তি এবং কল্যাণরূপী সম্পত্তি সহজেই প্রাপ্ত হয়। ঐকান্তিক ইচ্ছে না হলে কোন ভাবেই প্রেম লাভ হওয়া সম্ভব নয়। তাই যেখানে **ব্যাকুল ভাব ও প্রেম আছে সেখানে ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত হন। ভাবেই প্রেম অন্তর্নিহিত থাকে এবং সেটাই মোক্ষ প্রদান করে।** চালাকি করেও যদি কেউ কোন খাঁটি সন্তের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ ধরে নেয় তাহলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত উদ্ধার পাবে। এমনি একটি ঘটনা নীচে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী শেওড়ে ঃ-

আক্কালকোটের (সোলাপুর জিলা) শ্রী সপ্টণেকর তখন আইনের ছাত্র। একদিন ওঁর এক সহপাঠী শ্রী শেওড়ের সাথে দেখা হয়। অন্যান্য বিদ্যার্থীরাও সেখানে ছিল এবং কার কতটা পড়াশুনা এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তরে বোঝা যায় যে সব চেয়ে কম অধ্যয়ন শ্রী শেওড়ে করেছিলেন এবং পরীক্ষায় বসার মত প্রস্তুতিও তাঁর ছিল না। সবাই মিলে ওঁকে বিদ্রুপ করে। কিন্তু শেওড়ে বলেন- "যদিও আমার অধ্যয়ন অপূর্ণ, তবুও আমি পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হব। আমার সাইবাবাই সবাইকে সফলতা দেন।" শ্রী সপ্টণেকর এই কথা শুনে খুব অবাক হন এবং উনি শ্রী শেওড়েকে জিজ্ঞাসা করেন- "এই সাইবাবা কে, যার তুমি এত প্রশংসা করছ?" শ্রী শেওড়ে উত্তর দেন যে- "তিনি এক ফকির এবং শিরডীতে একটি মস্‌জিদে থাকেন। তিনি এক মহান পুরুষ। অনেক সাধু-সন্তই আছেন। কিন্তু তার তুলনা নেই। যতক্ষন পূর্বজন্মের পূণ্য সঞ্চিত না হয় ততক্ষন তাঁর দর্শন হওয়া দুর্লভ। আমি তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করি। তাঁর শ্রীমুখ থেকে যে কথা বেরোয় সেটা কখনো মিথ্যে হয় না। তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে আমি পরের বছর ঠিক পাশ করবো। আমারও এই বিশ্বাস যে আমি তাঁর কৃপায় পরীক্ষায় নিশ্চয়ই সফলতা পাব।" শ্রী সপ্টণেকরের বন্ধুর এইরূপ বিশ্বাস দেখে হাসি পায়। বন্ধুর সাথে-সাথে উনি শ্রী সাইবাবারও উপহাস করেন।

শ্রী সপ্টণেকর ঃ-

শ্রী সপ্টণেকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আক্কালকোটেই থাকতেন এবং সেখানেই ওকালতি শুরু করেন। দশবছর পর ১৯১৩ সালে ওঁর একমাত্র পুত্রের গলার রোগে মৃত্যু হয়। তাই ওঁর মন প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে ওঠে। মানসিক শান্তির খোঁজে উনি পন্ঢরপুর, গাণগাঙ্গাপুর এবং অন্যান্য তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। কিন্তু ওঁর মনের আশান্তি দূর হয় না। উনি বেদান্তের পাঠও শ্রবণ করেন- তাতেও কোন লাভ হয় না। হঠাৎ ওঁর শ্রী শেওড়ের শ্রী সাইবাবার প্রতি বিশ্বাসের কথা মনে পড়ে এবং উনি স্থির করেন যে- উনিও শিরডী গিয়ে শ্রী সাইবাবার দর্শন করবেন। ছোট ভাই পণ্ডিতরাওকে নিয়ে উনি শিরডী আসেন। বাবার দর্শন করে ওঁর খুবই আনন্দ হয়। বাবার কাছে গিয়ে প্রণাম করে শুদ্ধ মনে একটা শ্রীফল অর্পণ করতে যাবেন, এমন সময় বাবা রেগে ওঠে বলেন- "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" শ্রী সপ্টণেকরের মাথা নত হয়ে যায় এবং উনি একটু সরে পেছনে গিয়ে বসেন। কি ভাবে বাবার কাছে যাওয়া সম্ভব- সে বিষয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইতেন। কেউ একজন ওঁকে বালাশিম্পীর কাছে যেতে বলে। শ্রী সপ্টণেকর তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। তখন ওঁরা দুজনে বাবার একটা ছবি কিনে মস্‌জিদে আসেন। বালাশিম্পী নিজের হাতের ছবিটা বাবাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন- "এটা কার ছবি?" বাবা সপ্টণেকরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "এটা তো আমার বন্ধুর।" এই বলে তিনি হাসতে আরম্ভ করেন। বালাশিম্পী ইঙ্গিত করাতে শ্রী সপ্টণেকর যেই বাবাকে প্রণাম করতে যান অমনি বাবা আবার চেঁচিয়ে বলেন- "বাইরে যাও।" শ্রী সপ্টণেকর বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি করলে ভালো হয়।। তখন ওঁরা দুজনে বাবার সামনে গিয়ে বসেন কিন্তু বাবা ওঁদের তক্ষুনি চলে যেতে আদেশ দেন। ওঁরা খুবই নিরাশ হন। তাঁর আদেশ কেই বা অবহেলা করতে পারত? অবশেষে শ্রী সপ্টণেকর খিন্ন হৃদয়ে শিরড়ী থেকে ফিরে যান। উনি মনে-মনে প্রার্থনা করেন- "হে সাই! আমি আপনার কাছে দয়ার ভিক্ষে চাইছি। এতটা ভরসা দিন যে ভবিষ্যতে কখনো না কখনো আপনার শ্রী দর্শনের অনুমতি আমি অবশ্যই পাব।"

শ্রীমতি সপ্টণেকর ঃ-

এক বছর কেটে যায়, তাও ওঁর মন শান্ত হয় না। গাণগাঙ্গাপুর গিয়ে ওঁর মনের অশান্তি আরো বেড়ে যায়। তারপর উনি মাঢগ্রাম বিশ্রাম করতে যান এবং সেখান থেকে কাশী যাবেন স্থির করেন। রওনা হওয়ার দুদিন আগে ওঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেন যে উনি একটা কলসী নিয়ে কূয়াতে জল ভরতে যাচ্ছেন। সেখানে নিম গাছের নীচে

একটি ফকির বসে আছেন। ফকির ওঁর কাছে এসে বলেন- "খুকুমণি, তুমি মিছিমিছি কেন কষ্ট করছ? দাও আমি তোমার কলসীতে পরিষ্কার জল ভরে দিচ্ছি।" ফকিরের ভয়ে উনি খালি কলসী নিয়ে ফিরে আসেন। ফকিরও ওর পেছন-পেছন ধাওয়া করতেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং চোখ খুলে উঠে বসেন। এই স্বপ্নের কথা উনি নিজের স্বামীকে জানান। এটা একটা শুভ লক্ষণ মনে করে দুজনে শিরডী যাওয়া স্থির করেন। এবার যখন ওঁরা মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন তখন বাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি লেন্ডী বাগানে গিয়েছিলেন। ওঁরা ওখানেই বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন বাবা ফিরে আসেন তখন তাঁকে দেখে শ্রীমতি সপ্টণেকর খুবই অবাক হয়ে যান। স্বপ্নে দেখা ফকির হুবহু বাবার মতই দেখতে ছিল। উনি বাবাকে প্রণাম করে সেখানে বসে-বসেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওঁর বিনম্র স্বভাব দেখে বাবা অত্যন্ত প্রসন্ন হন। নিজের পদ্ধতি অনুসারে উনি এক তৃতীয় ব্যক্তিকে একটা গল্প শোনাতে শুরু করেন- "আমার হাতে, পেটে, কোমরে এবং সারা শরীরে অনেক দিন ধরে ব্যথা হচ্ছিল। আমি অনেক চিকিৎসা করাই কিন্তু কোন লাভ হয় না। ওষুধ খেয়ে-খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু এখন আমার খুব আশ্চর্য্য লাগছে যে আমার সব ব্যথা হঠাৎই চলে গেছে।" যদিও কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু এই গল্পটি শ্রীমতি সপ্টণেকরের নিজের। ওঁর ব্যথাই দূর হয়ে গিয়েছিল এবং উনি তাতে খুবই খুশী হন।

সন্ততি দান ঃ-

শ্রী সপ্টণেকর দর্শন করার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু বাবার ঐ এক অভ্যর্থনা- "বেরিয়ে যাও।" এবার উনি অনেক ধৈর্য্যশীল ও নম্র হয়ে এসেছিলেন। ওঁর মনে হয় যে গত কর্মের জন্যই বাবা ওনার উপর অপ্রসন্ন হয়েছেন। উনি প্রায়শ্চিত্ত করবেন স্থির করেন। বাবার সাথে একান্তে দেখা করে নিজের গত কর্মের জন্য ক্ষমা চাইবেন এবং করলেনও তাই। বাবার চরণে মাথা রাখলেন এবং তখন বাবা ওঁকে আশীর্বাদ করেন। শ্রী সপ্টণেকর বাবার পা টিপতে বসেছেন। এমন সময় একটি রাখাল মেয়ে এসে বাবার কোমর টিপতে আরম্ভ করে। তখন বাবা তাদের একটা বেনের গল্প বলতে শুরু করেন। যখন তিনি ওঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন এবং ওঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কথা বলেন তখন শ্রী সপ্টণেকরের খুব অবাক লাগে। উনি অবাক হয়ে ভাবেন যে বাবা ওঁর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার বিষয় কি করে জানেন? উনি সহজেই বুঝতে পারেন যে বাবা অন্তর্যামী এবং সবার হৃদয়ের সব রহস্য তিনি জানেন। এই কথা ওর মনে আসতেই, বাবাও এদিকে মেয়েটির সাথে কথা বলতে-বলতে সপ্টণেকরের

দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- "এই ভদ্রলোকটি আমায় দোষ দিচ্ছেন যে আমি এর ছেলেকে মেরে ফেলেছি। আমি কি লোকেদের সন্তানদের প্রাণ নিই? তাহলে এই মহাশয় মস্‌জিদে এসে চেঁচামেচি কেন করছেন? এবার আমি একটা কাজ করব। সেই ছেলেটিকে আবার ওঁর স্ত্রীয়ের গর্ভে এনে দেব।" এই বলে বাবা নিজের অভয়হস্ত সপ্টণেকরের মাথায় রাখেন এবং ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- **"এই চরণ অতি পুরাতন ও পবিত্র। চিন্তামুক্ত হয়ে আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখলে তোমার অভীষ্ট শীঘ্রই পূর্ণ হবে।** শ্রী সপ্টণেকরের হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। চোখের জলে বাবার চরণ ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। পূজোর সামগ্রী ঠিক করে নৈবেদ্য ইত্যাদি নিয়ে উনি সপত্নীক মস্‌জিদে যান। এই ভাবে উনি নিত্য নৈবেদ্য অর্পণ করতেন এবং বাবার কাছ থেকে প্রসাদও পেতেন। মস্‌জিদে অসম্ভব ভীড় থাকা সত্ত্বেও উনি সেখানে গিয়ে বার-বার বাবাকে প্রণাম করতেন। মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগতে দেখে বাবা বলেন- **"প্রেম ও বিনয়ের সঙ্গে একটা নমস্কারই করলেই যথেষ্ট।"** সেই রাত্রেই ওঁর চাওড়ী উৎসব দেখার সৌভাগ্য হয় এবং বাবা ওঁকে পান্ডুরঙ্গের রূপে দর্শন দেন। পরের দিন রওনা হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করার সময় ওঁর মনে হয়- "প্রথমে বাবাকে একটা টাকা দক্ষিণা দেব। যদি তিনি আরেক টাকা চান তাহলে মানা না করে আরেক টাকাও অর্পণ করব। তাও যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট টাকা বাঁচবে।" মস্‌জিদে গিয়ে বাবাকে এক টাকা দক্ষিণা দিতেই ওঁর মনের ইচ্ছে জেনে বাবা আরো এক টাকা চান। শ্রী সপ্টণেকর সেটা সহর্ষে দিতেই বাবা ওঁকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন- "এই নারকেলটি নিয়ে যাও এবং তোমার বৌয়ের কোলে রেখো। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যাও।" শ্রী সপ্টণেকর তাই করেন। এক বছর পর ওঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। আট মাসের শিশুকে নিয়ে ঐ দম্পতি আবার শিরডী আসেন এবং বাবার চরণে শিশুটিকে রেখে এইরূপ প্রার্থণা করেন- "হে শ্রী সাইনাথ! আপনার ঋণ আমরা কিভাবে শোধ করতে পারব, জানি না। আপনার শ্রীচরণে আমরা বারম্বার প্রণাম জানাই। আমরা অসহায় ও অনাশ্রিত। আশীর্বাদ করুন প্রভু, যেন আপনার চরণকমলই আমাদের আশ্রয় হয়। উঠতে-বসতে, শুতে-জাগতে নানা রকম চিন্তা-ভাবনায় আমাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে। আপনার ভজনেই যেন আমাদের মন মগ্ন হয়ে যায় এইরূপ আশীর্বাদ দিন।"

ঐ ছেলেটির নাম 'মুরলীধর' রাখা হয়। পরে তাঁদের আরো দুটি পুত্র (ভাস্কর ও দিনকর) হয়েছিল। সপ্টণেকর দম্পতি এই ভাবে উপলব্ধি করেন যে বাবার কথা কখনো অসত্য হয় না, অপরিপূর্ণ থাকে না।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

অধ্যায় - ৪৯

পরীক্ষা ঃ ১) হরি কনোবা, ২) সোমদেব স্বামী, ৩) নানা সাহেব চাঁদোরকরের কাহিনী

প্রস্তাবনা ঃ-

বেদ ও পুরাণও যেখানে ব্রহ্ম বা সদ্‌গুরুর বর্ণনা করতে নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে সেখানে আমি এক অল্পজ্ঞ প্রাণী সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার বর্ণনা কি করে করতে পারি? আমার ব্যক্তিগত মত এই যে এই বিষয়ে মৌন ধারণ করাই উচিত। মূক থাকাই সদ্‌গুরুর বিমল পতাকারূপী লীলা বর্ণনা করার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ গুণগুলি আমাদের মূক থাকতে দেয় কোথায়? নানা রকমের সুস্বাদু খাবার যদি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন একসাথে বসে না খায় তাহলে সে সব তেমন মুখরোচক হয় না। সেই খাবারই সবার সাথে বসে খেলে তাতে একটা বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায়। এই সত্যটি 'সাই লীলামৃত'-এর বিষয়েও প্রযোজ্য। এর রসাস্বাদন একান্তে কখনোই হতে পারে না। যদি বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকেরা সবাই মিলে এর রস গ্রহন করে তাহলে আরো বেশী আনন্দ হয়। শ্রী সাইবাবা নিজেই অন্তঃপ্রেরণা দিয়ে তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁর কথা আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন। তাই আমাদের শুধু এতটাই কর্তব্য যে অনন্য ভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁরই ধ্যান করি। তপ-সাধন, তীর্থযাত্রা, ব্রত এবং যজ্ঞ ও দানের চেয়ে হরি-ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং সদ্‌গুরুর ধ্যান এদের সবার মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ। তাই সর্বদা মুখ দিয়ে সাইনাম স্মরণ করে উপদেশগুলির নিদিধাসন এবং তাঁর স্বরূপ চিন্তন করে সমস্ত কর্ম তাঁর জন্যই করা উচিত। ভববন্ধন থেকে মুক্তির এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছু নেই। উপরোক্ত ভাবে যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি, তাহলে সাইকে বিবশ হয়ে আমাদের সাহায্য করে মুক্তি প্রদান করতেই হবে। এবার এই অধ্যায়ের ঘটনাগুলি শুনুন।

হরি কনোবা ঃ-

বম্বের শ্রী হরি কনোবা নামক এক ভদ্রলোক নিজের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে শ্রী সাইবাবার অনেক লীলা শুনেছিলেন। কিন্তু ওঁর মনে বিশ্বাস জাগরিত হত না। উনি এক সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। উনি স্বয়ং বাবাকে পরীক্ষা করবেন

স্থির করে কয়েকজন বন্ধুর সাথে বম্বে থেকে শিরডী আসেন। ওঁর মাথায় ছিল একটা জরির পাগড়ী ও পায়ে নতুন চটি। দূর থেকে বাবাকে দেখে কাছে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করতে চাইছিলেন। কিন্তু ওঁর নতুন চটি এই কাজে বাধক হয়ে দাঁড়াল। কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে নিজের চটির জোড়াটি মন্ডপের এক কোণে রেখে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার দর্শন করেন। কিন্তু মনটা চটিতেই পড়েছিল। শ্রদ্ধাপূর্বক বাবাকে প্রণাম করে প্রসাদ এবং উদী নিয়ে উনি ফিরে আসেন। এসে দেখেন যে চটি উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলেন না। শেষে মনঃক্ষুন্ন হয়ে উনি ঘরে ফিরে গেলেন।

স্নান, পূজো ও নৈবেদ্য অর্পন করে খেতে বসলেন। কিন্তু সমস্তটা সময় চটির চিন্তাই মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। খাবার খেয়ে মুখ হাত ধুয়ে উনি বাইরে বেরিয়ে দেখেন একটা মারাঠা ছেলে ওঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। ওর হাতে একটা লাঠির আগায় এক জোড়া চটি ঝুলছিল। বাইরে যারা হাত ধুতে আসছিল তাদের ঐ ছেলেটি বলে- "বাবা আমায় এই লাঠিটা হাতে দিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে 'হরির বেটা, জরির ফেটা'- বলে ডাক দিতে বলেছেন। তিনি এও বলেছেন- যে বলবে এই চটি তার, তাকে আগে জিজ্ঞাসা করবে যে তার নাম কি হরি এবং ওর পিতার নাম কি 'ক' দিয়ে (অর্থাৎ কনোবা) কি না। তার সাথে-সাথে এও দেখতে যে ওর মাথায় জরির ফেটা (পাগড়ী) আছে কি না। তবেই তাকে চটিটা দিও।" ছেলে টির কথা শুনে হরি কনোবার খুব আনন্দ হয় ও আশ্চর্য্যও লাগে। উনি এগিয়ে গিয়ে বলেন- "এটা আমার চটি। আমারই নাম হরি এবং আমিই 'ক'র (কনোবা) ছেলে। এই আমার জরির পাগড়ী দেখো।" ছেলেটি সন্তুষ্ট হয়ে চটি ওঁকে দিয়ে চলে যায়। উনি ভাবেন- "আমার জরির পাগড়ী তো সবাই দেখেছে। হতে পারে বাবার দৃষ্টিও পড়েছিল। কিন্তু আমি প্রথম বার শিরডী এসেছি তবে বাবা কি করে জানতে পারলেন যে আমারই নাম হরি ও আমার পিতার কনোবা?" উনি তো কেবল বাবাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা বাবার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পান। ওঁর ইচ্ছে পুরণ হয় এবং উনি সহর্ষে বাড়ী ফিরে আসেন।

সোমদেব স্বামী ঃ-

এবার আরেক অবিশ্বাসী ব্যক্তির কথা শুনুন। তিনিও বাবাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলেন। কাকাসাহেব দীক্ষিতের ভাই শ্রী ভাইজী নাগপুরে থাকতেন। ১৯০৬ সালে যখন উনি হিমালয়ে যান তখন হরিদ্বারের কাছে উত্তর কাশীতে ওঁর সোমদেব স্বামীর

(এক সাধু) সঙ্গে পরিচয় হয়। দু'জনে পরস্পরের ঠিকানা লিখে নেন। পাঁচ বছর পর সোমদেব স্বামী নাগপুর আসেন এবং ভাইজীর বাড়ীতে এসে ওঠেন। সেখানে শ্রী সাইবাবার খ্যাতি শুনে ওঁর খুব আনন্দ হয় এবং শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করার তীব্র উৎকণ্ঠা জাগে। মনমাড ও কোপরাগ্রাম পেরিয়ে গেলে উনি একটা টাঙ্গায় চড়ে শিরডী রওনা হন। শিরডী পৌঁছে দূর থেকেই মস্‌জিদের ওপরে দুটি পতাকা উড়তে দেখেন। সাধারণত- দেখা যায় যে বিভিন্ন সন্তদের ব্যবহার, চালচলন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা আলাদাই হয়। কিন্তু শুধু তা দিয়েই তাঁদের যোগ্যতা ধার্য্য করাটা ভুল। সোমদেব স্বামী কিন্তু সে কথা বুঝতে পারেন না। পতাকাগুলি উড়তে দেখে উনি ভাবেন- "সন্ত হয়ে বাবার এই পতাকার প্রতি এত অনুরাগ কেন? এতে কি তার সন্তচরিত্র প্রকাশ পায়? আমার তো মনে হয় বাবার নিজের খ্যাতির প্রতি খুব টান।" অতএব উনি শিরডীতে বাবার দর্শন করার ইচ্ছে ত্যাগ করে নিজের সহযাত্রীদের বলেন- "আমি ফিরে যেতে চাই।" তখন ওরা বলে- "তাহলে এত দূর মিছিমিছি এলে? শুধু দুটো পতাকা দেখেই তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ। যখন রথ, পাল্কি, ঘোড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী দেখবে, তখন তোমার কি দশা হবে?" স্বামী এতে আরো ঘাবড়ে যান এবং বলেন- "আমি অনেক সাধু-সন্তের দর্শন করেছি। কিন্তু এই মহাপুরুষ তো বিলক্ষণ, যিনি এইরূপ ঐশ্বর্য্যের সামগ্রী সংগ্রহ করেন। এই ধরনের সাধুর দর্শন না করাই ভালো।" এই বলে উনি ফিরে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু অন্যান্য সহযাত্রীরা ওঁকে প্রতিরোধ করে এরকম সংকুচিত মনোবৃত্তি ছাড়তে বলে। তারা জানায়- "মস্‌জিদে যে সাধু থাকেন তিনি এই পতাকা বা অন্য সামগ্রী বা নিজের খ্যাতির কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। এ সব তাঁর ভক্তরা শ্রদ্ধা, ভক্তি ভালোবাসায় তাঁকে অর্পণ করেছে।" শেষে উনি বাবার দর্শন করতে রাজী হন। মস্‌জিদের মন্ডপে পৌঁছে উনি স্তব্ধ হয়ে যান। উনার চোখ জলে ভরে আসে ও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। এবার ওঁর সব দূষিত ধারণা মন থেকে দূর হয়ে নিজের গুরুর উপদেশ মনে পড়ে- "মন যেখানে অতি প্রসন্ন ও মুগ্ধ হয়, সেই স্থানটিকেই নিজের বিশ্রামধাম মনে কোর।" উনি বাবার চরণে লুটিয়ে পড়তে চাইছিলেন কিন্তু বাবার কাছে যেতেই বাবা সহসা রেগে ওঠেন এবং চেঁচিয়ে বলেন- "আমার জিনিষ-পত্তর আমার কাছেই থাকতে দাও। তুমি নিজের বাড়ী ফিরে যাও। সাবধান! আর কখনো এই মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়ো না। এমন সন্তের দর্শন করার কি দরকার, যে মস্‌জিদের উপর পতাকা ওড়ায়। এটা কি সন্ত হওয়ার লক্ষণ? এক দন্ডও এখানে থেকো না।" এবার স্বামী বুঝতে পারেন যে বাবা ওঁর মনের সমস্ত কথা জানেন এবং তিনি কত সর্বজ্ঞ। নিজের জ্ঞানের কথা ভেবে ওঁর হাসি

পায় এবং উনি অনুভব করেন যে, বাবা কত নির্বিকার ও পবিত্র। উনি দেখেন যে বাবা কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, কাউকে স্পর্শ করছেন, আবার কাউকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। সব ভক্তদেরই 'উদী' প্রসাদ দিয়ে সব রকম ভাবে সন্তোষ প্রদান করছেন। এই সব দেখে ওঁর মনে হয়- "আমার সাথেই এমন কঠিন ব্যবহার কেন?" গভীর ভাবে চিন্তা করার পর বুঝতে পারেন- "এর আসল কারণ আমার অন্তরের বিচারধারা। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমায় নিজেকে বদলানো উচিত। বাবার রাগও আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।" বলাবাহুল্য, উনি তারপর বাবার শরণে গিয়ে তাঁর পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন।

নানা সাহেব চাঁদোরকর ঃ-

এবার নানাসাহেব চাঁদোরকরের কথা লিখে হেমাডপন্ত এই অধ্যায়টি শেষ করছেন। একবার বাবা নানাসাহেব মহালসাপতি এবং অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মস্‌জিদে বসেছিলেন। সেই সময় বীজাপুর থেকে এক মুসলমান ভদ্রলোক সপরিবারে শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে আসেন। বোরখা পরা মহিলাদের লাজুক ভাব দেখে নানাসাহেব সেখান থেকে চলে যেতে চাইলেন। কিন্তু বাবা ওঁকে সেখানেই বসে থাকতে বলেন।। মহিলা দুটি এগিয়ে গিয়ে বাবাকে দর্শন করেন। ওঁদের মধ্যে একজন নিজের মাথার ঘোমটাটি সরিয়ে বাবার চরণে প্রণাম করে আবার ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে নেন। নানাসাহেব মহিলাটির অপরূপ ও বিরল সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষিত হয়ে আরেক বার সেই রূপ দেখার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। মহিলাটি চলে যাওয়ার পর নানার মনের অবস্থা জেনে, বাবা ওঁকে বলেন- "নানা, মিছিমিছি কেন মোহিত হচ্ছ? ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজেদের কাজ করতে দাও। আমাদের তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। ভগবান এই সুন্দর জগত নির্মাণ করেছেন। অতএব আমাদের কর্তব্য তার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা। এই মন তো ধীরে-ধীরেই স্থির হয় এবং যখন সামনের দরজা খোলা আছে, তখন পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার কি দরকার? চিত্ত শুদ্ধ হতেই কোন কষ্ট অনুভব হয় না। যদি আমাদের মনে কোন কুবিচার না থাকে, তাহলে কারো কাছে ভয় পাওয়ার কি দরকার? চোখ দুটিকে নিজের কাজ করতে দাও। তার জন্য তোমার লজ্জিত বা বিচলিত হওয়া উচিত নয়।" সে সময় শামাও সেখানেই ছিলেন। উনি বাবার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন না। তাই মস্‌জিদ থেকে ফেরার পথে নানাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঐ পরম সুন্দরীর রূপ দেখে উনি যে রূপ মোহিত হয়েছিলেন এবং সেই মনোকষ্ট জেনে বাবা ওঁকে যা উপদেশ দেন তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নানাসাহেব শামাকে

এইরূপ বোঝান -

"আমাদের মন স্বভাবতই চঞ্চল, কিন্তু আমাদের তাকে লম্পট হতে দেওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়গুলি তো সব সময় নিজেদের বিষয় পদার্থের প্রতি ধাওয়া করে। কিন্তু তাদের পেছনে আমরা যেন ধাওয়া না করি। এই ভাবে অভ্যাস করলে চঞ্চলতা জয় করা যেতে পারে। যদিও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ (ইন্দ্রিয়গুলি দমন করা) সম্ভব নয় তবুও তাদের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। প্রয়োজান অনুসারে আমাদের ঠিক ঠিক ভাবে সেগুলির গতি অবরোধ করা উচিত। সৌন্দর্য্য তো দেখার জিনিষ, তাই নির্ভয়ে সুন্দর জিনিষগুলি দেখা উচিত। যদি মনে কোন কুবিচার না থাকে তাহলে লজ্জা বা ভয়ের প্রয়োজনই বা কি? ইচ্ছাশূন্য মন নিয়ে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও ইন্দ্রিয়গুলি সহজ ও স্বাভাবিক রূপে আমাদের বশে এসে যাবে। তখন বিষয়ানন্দ উপভোগ করার সময়ও তোমার ঈশ্বরের কথাই মনে পড়বে। যদি মনকে বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি পেছনে ছেড়ে ও সেগুলিতে লিপ্ত থাকতে দাও, তাহলে জন্ম-মৃত্যুর পাশ থেকে কখনো মুক্তি পাবে না। বিষয় পদার্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে সব সময় পথভ্রষ্ট করে। অতএব আমাদের উচিত বিবেককে সারথি করে মনের লাগাম নিজের হাতে নিয়ে ইন্দ্রিয়রূপী ঘোড়াকে কাম্য বস্তুর দিকে না যেতে দেওয়া। এই ভাবে বিবেকরূপী সারথির সাহায্যে আমরা বিষ্ণু-পদ প্রাপ্ত করতে পারব। সেটি হল আমাদের আসল পরম সত্যধাম, এবং সেখানে গিয়ে প্রাণী আর কখনো এখানে ফিরে আসে না।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৫০

১) কাকাসাহেব দীক্ষিত ২) শ্রী টেম্বে স্বামী ৩) বালারাম ধুরন্ধরের কাহিনী।

মূল মারাঠি 'সৎচরিত্র' গ্রন্থের ৫০ তম অধ্যায়টির একই বিষয় বলে এই গ্রন্থে ৩৯ তম অধ্যায়ের সঙ্গে এক সাথে জোড়া হয়েছে। তাই মূল গ্রন্থের ৫১ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে ৫০ তম অধ্যায়ের রূপে দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

সাই মহারাজের জয় হোক, যিনি ভক্তদের অবলম্বন ও সর্বশক্তি দাতা। তিনি গীতাধর্মের উপদেশ দিয়ে আমাদের শক্তি প্রদান করছেন। হে সাই, কৃপাদৃষ্টিসহ আমাদের আশীষ দাও। যেমন মলয় পর্বতের চন্দন বৃক্ষ সব তাপ হরণ করে নেয় অথবা যেভাবে মেঘ জলবৃষ্টি করে লোকেদের শীতলতা ও আনন্দ প্রদান করে বা যেমন বসন্তে ফোটা ফুল ঈশ্বরের পূজোর কাজে লাগে, সেই রকমই শ্রী সাইবাবার লীলা কাহিনীগুলি পাঠক ও শ্রোতাদের ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা প্রদান করে। যারা এই লীলাগান করে বা শোনে তারা দুজনেই ধন্য। কারণ, বলায় মুখ ও শোনায় কান পবিত্র হয়ে যায়।

এটা তো সবাই স্বীকার করবে যে, শত রকমের সাধনা করা সত্ত্বেও সদগুরুর কৃপা না হলে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনুন -

কাকাসাহেব দীক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬) ঃ-

শ্রী হরি সীতারাম ওরফে কাকাসাহেব দীক্ষিত ১৮৬৪ সালে খাণ্ডোয়াতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ওঁর প্রাথমিক শিক্ষা খাণ্ডোয়া ও হিঙ্গন ঘাটে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা নাগপুরে উচ্চ শ্রেণীতে প্রাপ্ত করার পর উনি প্রথমে বিল্সন ও পরে এল্ফিন্সটন কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ সালে স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে L.L.B ও Solicitor

য়ের পরীক্ষা পাশ করে সরকারী Solicitor ফার্ম-মেসার্স লিটিল এ্যাণ্ড কোম্পানীতে কাজ করতে শুরু করেন। কিছুদিন পর উনি নিজের একটা সলিসিটর ফার্ম খোলেন।

১৯০৯ সালের আগে বাবার কথা উনি কখনো শোনেননি। কিন্তু এরপর উনি খুব শীঘ্রই বাবার পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। লোনাওয়ালায় থাকাকালীন ওঁর এক পুরোন বন্ধু শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে হঠাৎ দেখা হয়। দুজনে এদিক ওদিককার আলোচনায় সময় কাটাতেন। কাকাসাহেব ওঁকে জানান যে, যখন উনি লন্ডনে ছিলেন সেই সময় একবার ট্রেনে চড়তে গিয়ে উনি পা ফস্‌কে পড়ে যান। তাতে পায়ে খুব আঘাত পান। ঘটনার বিবরণটি শুনে নানাসাহেব ওঁকে বলেন- "যদি তুমি এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চাও তাহলে আমার সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার শরণে যাও।" উনি বাবার পুরো ঠিকানা দিয়ে তাঁর কথার পুণরাবৃত্তি করেন- **"আমি নিজের ভক্তকে সাত সমুদ্র পার থেকেও এমন ভাবে টেনে আনব যেমন সুতোয় বাঁধা পাখীকে টেনে নিজের কাছে আনা হয়।"** উনি এও স্পষ্ট করে দেন- "তুমি যদি বাবার আপন জন না হও, তাহলে তোমার তাঁর প্রতি আকর্ষণই জাগবে না এবং তাঁর দর্শনও পাবে না।" কাকাসাহেব এই কথা শুনে খুব খুশী হন এবং বলেন যে, শিরডী গিয়ে বাবার কাছে শারীরিক পঙ্গুতার বদলে ওঁর চঞ্চল মনকে পঙ্গু করে পরমানন্দের প্রাপ্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থণা করবেন। কিছুদিন পরই বম্বে বিধান সভার (Legislative Assembly) নির্বাচনে ভোট সংক্রান্ত ব্যাপারে কাকাসাহেব দীক্ষিত আহমদনগর যান এবং প্রত্যেকবারের ন্যায় মিরীকরের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। শ্রী বালাসাহেব মিরীকর- কোপর গ্রামের মাম্‌লৎদার কাকাসাহেব মিরীকরের সুপুত্র- সেই সময় অশ্ব প্রদর্শনী দেখার জন্য আহমদনগর এসেছিলেন। এদিকে পিতা-পুত্র দুজনেই চিন্তা করছিলেন যে, কাকাসাহেবের সঙ্গে কাকে শিরডী পাঠানো যেতে পারে আর ওদিকে বাবা অন্য আর এক ভাবে ওঁকে নিজের কাছে আনার ব্যবস্থা করছিলেন। শামার কাছে টেলিগ্রাম আসে যে, ওঁর শাশুড়ীর অবস্থা খুব শোচনীয় এবং উনি যেন শীঘ্র আহমদনগর আসেন। বাবার কাছে অনুমতি নিয়ে শামা ওখানে গিয়ে নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রদর্শনীতে যাওয়ার সময় নানাসাহেব পানসে ও আপ্পা গরদের দৃষ্টি হঠাৎ শামার উপর পড়ে। ওঁরা শামাকে মিরীকরের বাড়ী গিয়ে কাকাসাহেব দীক্ষিতের সাথে দেখা করতে এবং ওঁকে নিজের সঙ্গে শিরডী নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। শামার আগমনের খবর দীক্ষিত ও মিরীকরকেও দিয়ে দেন। মিরীকর শামার সাথে কাকাসাহেবের পরিচয় করিয়ে দেন এবং এরপর এই স্থির হয় যে, কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শামা রাত দশটার গাড়ীতে

কোপর গ্রাম রওনা হবেন। এই ব্যবস্থার ঠিক পরেই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে। বালাসাহেব মিরীকর বাবার একটা বড় ছবির উপর থেকে কাপড় সরিয়ে কাকাসাহেবকে তাঁর দর্শন করান। এই দেখে কাকাসাহেব খুব আশ্চর্য্য হন এবং ভাবেন- "যাঁর দর্শনের জন্য আমি শিরডী যাচ্ছি, তিনি এই ছবির রূপে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এখানেই বিরাজমান।" স্তব্ধ হয়ে উনি বাবার বন্দনা করেন। এই ছবিটি ছিল মেঘার এবং কাঁচ লাগানোর জন্য মিরীকরের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কাঁচ লাগিয়ে সেটি কাকাসাহেব দীক্ষিত ও শামার হাতে শিরডী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। দশটার আগেই স্টেশনে পৌঁছে ওঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনেন। গাড়ী স্টেশনে এসে পৌঁছলে দেখা যায় যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিল ধারণের স্থান নেই- এত ভীড়। সৌভাগ্যক্রমে গার্ড সাহেব কাকাসাহেবকে চিনতেন এবং উনি এই দুজনকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে দেন। এই ভাবে আরামে যাত্রা করে ওঁরা কোপরগ্রাম স্টেশনে নামেন। স্টেশনেই, শিরডীর জন্য রওনা হতে প্রস্তুত শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরকে দেখে ওঁরা অত্যন্ত খুশী হন। শিরডী পৌঁছে মস্‌জিদে গিয়ে ওঁরা বাবাকে দর্শন করেন। তখন বাবা বলেন- "আমি অনেকদিন থেকেই তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম। আমিই শামাকে তোমায় আনতে পাঠাই।" এরপর কাকাসাহেব অনেক বছর বাবার সঙ্গে কাটান। উনি শিরডীতে একটা 'ওয়াড়া' (দীক্ষিত ওয়াড়া) তৈরী করান, যেটি প্রায় ওঁর স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনি বাবার কাছে যা অনুভূতি প্রাপ্ত করেন, সেগুলি এখানে স্থানাভাবে দেওয়া হচ্ছে না। পাঠকদের অনুরোধ করছি যে, আপনারা শ্রী সাই লীলা পত্রিকার বিশেষাংক (কাকাসাহেব দীক্ষিত) ভাগ ১২ -র ৬-৭ অঙ্ক নিশ্চয়ই পড়বেন। শুধু একটি তথ্য লিখে আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করব। বাবা ওঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে শেষ সময় বাবা ওঁকে বিমানে নিয়ে যাবেন। এ কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়- ৫ই জুলাই (১৯২৬ সাল) কাকাসাহেব হেমাডপন্তের সঙ্গে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছিলেন। উনি বাবার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ ওঁর ঘাড়টা হেমানপন্তের কাঁধের ওপর ঢলে পড়ে। কোনরকম কষ্ট বা যন্ত্রণা ভোগ না করেই উনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

শ্রী টেম্বে স্বামী ঃ-

সন্তরা পরস্পরকে কি ভাবে ভাই-য়ের মত প্রেম করেন, এই কথাটাই এই দ্বিতীয় কাহিনীটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে। একবার শ্রী বাসু দেবানন্দ সরস্বতী, যিনি শ্রীটেম্বে স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন, গোদাবরীর তীরে রাজমহেন্দ্রীতে এসে শিবির গড়লেন। তিনি ভগবান দত্তাত্রয়ের কর্মকাণ্ডী, জ্ঞানী ও যোগী ভক্ত ছিলেন। নাঁদেড়ের (নিজাম

স্টেট) এক উকিল নিজের বন্ধুদের সাথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং কথাবার্তার মাঝে শ্রী সাইবাবার কথা ওঠে। বাবার নাম শুনে স্বামীজী তাঁকে করবদ্ধ প্রণাম করেন এবং পুন্ডলীকরাওকে (উকিল) একটা শ্রীফল দিয়ে বলেন- "তুমি গিয়ে আমার ভাই শ্রীসাইকে প্রণাম করে বোল তিনি আমায় যেন না ভোলেন এবং সদৈব আমার উপর যেন কৃপাদৃষ্টি রাখেন।" তিনি এও বলেন যে সাধারণতঃ একজন সাধু অন্যজনকে প্রণাম করেন না- কিন্তু এখানে বিশেষ রূপে এরকম করা হল। শ্রী পুন্ডলীক রাও শ্রীফলটি নিয়ে বলেন- "আমি এটি বাবাকে অবশ্যই দেব ও আপনার বার্তা পৌঁছে দেব।"

এক মাস পরই পুন্ডলীকরাও অন্য বন্ধুদের সাথে শ্রীফল নিয়ে শিরডী রওনা হন। মনমাড পৌঁছে জল খেতে যান। খালি পেটে জল খাওয়া উচিত নয় ভেবে একটু চিড়ে মুখে দেন। কিন্তু সেটা বিস্বাদ লাগায় একজন একটি নারকেল ভেঙ্গে সেটা চিড়েতে মিশিয়ে দেয়। এই ভাবে চিড়েগুলি সুস্বাদু করে সবাই মিলে খায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে দেখা গেল যে পুণ্ডলীক রাওকে শ্রীটেম্বে স্বামী যে নারকেলটি বাবাকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন সেটিই ভেঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। শিরডী পৌঁছে ওঁরা ভয়ে-ভয়ে বাবার দর্শন করতে যান। এদিকে বাবা তো স্বামীজীর কাছ থেকে নারকেলের বিষয়ে বার্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি প্রথমেই পুন্ডলীকরাওকে বলেন- "আমার ভাইয়ের পাঠানো বস্তুটি আনো।" উনি বাবার পা ধরে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন ও নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। তার পরিবর্তে উনি অন্য নারকেল দিতে চাইলেন, কিন্তু বাবা আপত্তি জানালেন এই বলে- "ঐ নারকেলটির মূল্য এই নারকেলের চেয়ে অনেক বেশী এবং তার ক্ষতিপূরণ সাধারণ নারকেল দিয়ে হতে পারে না। তবে আর চিন্তা করার কিছু নেই। আমারই ইচ্ছায় তোমায় ঐ নারকেলটি দেওয়া হয় এবং পরে আমার ইচ্ছাতেই পথে সেটি ভাঙ্গা হয়। তুমি নিজের ঘাড়ে কর্তা ভাব ("আমি করছি"- এই ভাব) আনছ কেন?[১] যে কোন বড় (ভালো) বা ছোট (মন্দ) কাজ করার সময় নিজেকে কর্তা না মনে করে, অভিমান ও অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে কাজটি করলে তোমার দ্রুত উন্নতি হবে।"[২] কত সুন্দর ছিল তাঁর এই অধ্যাত্মিক উপদেশ।

শ্রী বালারাম ধুরন্ধর (১৮৭৮-১৯১০) ঃ-

সান্তাক্রুজ, বম্বের শ্রী বালারাম ধুরন্ধর 'পাথারে প্রভু' সম্প্রদায়ের এক সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। উনি বম্বের উচ্চ ন্যায়ালয়ে অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন এবং কোন এক সময়

Government Law School য়ের (Bombay) প্রধানাচার্য্যও ছিলেন। পরিবারে সবাই সাত্বিক ও ধার্মিক প্রবৃত্তির ছিলেন। উনি একটি বইও লিখেছিলেন। এরপর ওঁর মন আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়। মন দিয়ে গীতা, তার টীকা জ্ঞানেশ্বরী এবং অন্য দার্শনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। উনি পন্ঢরপুরের ভগবান বিঠোবার পরম ভক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালে উনি শ্রী সাইবাবার দর্শনের সুযোগ পান। ছ' মাস আগে ওঁর ভাই বাবুলজী ও বামনরাও শিরডী এসে বাবার দর্শন করেছিলেন এবং বাড়ী ফিরে নিজেদের মধুর অনুভূতি শ্রী বালারাম ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শুনিয়েছিলেন। তখন সবাই মিলে শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করা স্থির করেন। এইদিকে শিরডীতে ওঁদের পৌঁছবার আগেই বাবা স্পষ্ট শব্দে বলেন- "আজ আমার দরবারের কয়েকটি লোক আসছে।" পরে বাবার এই সুস্পষ্ট উক্তির কথা অন্যদের কাছে শুনে ধুরন্ধর পরিবার মহান আশ্চর্যান্বিত হন- ওঁরা নিজেদের শিরডী যাত্রার খবর কাউকেই দেননি। সবাই এসে বাবাকে প্রণাম করে কথাবার্তা শুরু করেন। বাবা উপস্থিত লোকেদের বলেন- "এরাই আমার দরবারের সেই লোক যাদের বিষয় তোমাদের আগে বলেছিলাম।" তারপর ধুরন্ধর ভাইদের লক্ষ্য করে বলেন- "আমার সাথে তোমাদের পরিচয় ৬০ জন্ম পুরোন।" ওঁদের সবার স্বভাব ভদ্র ও নম্র ছিল। তাই ওঁরা হাত জোড় করে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবাকেই দেখছিলেন। ওঁদের মধ্যে সব প্রকারের সাত্বিক ভাব যেমন অশ্রুপাত্, রোমাঞ্চ, কন্ঠরুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। সবাই খুবই আনন্দিত হন। এরপর ওঁরা খাবার খেতে যান। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর আবার মস্‌জিদে এসে বাবার পা টিপতে শুরু করেন। এই সময় বাবা ছিলিম (কলকে) পান করছিলেন। তিনি বালাসাহেবকে ছিলিমটি দিয়ে একটা টান দিতে বলেন। যদিও আজ পর্যন্ত উনি কখনো ধূমপান করেননি তবুও ছিলিম হাতে নিয়ে অনেক কষ্টে বালারাম একটা টান দেন। তারপর সশ্রদ্ধ ভাবে সেটি বাবাকে ফিরিয়ে দেন। উনি ছ' বছর থেকে হাঁপানিতে ভুগছিলেন। কিন্তু ছিলিমে টান দিতেই রোগমুক্ত হয়ে যান। ছ' বছর পর আরেকবার একটি বিশেষ দিনে সেই কষ্ট দেখা দেয়। সেটি ছিল বাবার মহাসমাধির দিন। বালারাম বৃহস্পতিবারে শিরডী এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে 'চাওড়ী' উৎসব দেখার সুযোগ পান। 'চাওড়ী'তে আরতির সময় বালারামের বাবার মুখ-মন্ডল ভগবান পাণ্ডুরঙ্গের ন্যায় মনে হয়। পরের দিন ভোর বেলা কাকড় আরতির সময় বালারাম নিজের পরম ইষ্টদেব পান্ডুরঙ্গের জ্যোতি বাবার মুখে আবার দেখতে পান।

শ্রীবালারাম ধুরন্ধর মারাঠীতে মহারাষ্ট্রের মহান সন্ত তুকারামের জীবন চরিত্র

লিখেছেন। কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন না। ওঁর ভাইরা এই পুস্তকটি ১৯২৮ সালে প্রকাশ করেন। পুস্তকটির ভূমিকায় বালারামের জীবন-বৃত্তান্তে ওঁর শিরডী-যাত্রার এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

১) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। গীতা ৩/২৭

২) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।। গীতা ৩/১৯

অধ্যায় - ৫১

উপসংহার, সদ্‌গুরু শ্রীসাইয়ের মহানতা, ফলশ্রুতি ও প্রসাদ যাচনা।

অধ্যায় ৫১ শেষ হয়ে গেছে এবং এবার অন্তিম অধ্যায় (মূল গ্রন্থের ৫২ অধ্যায়) লেখা হচ্ছে। এখানে হেমাডপন্ত যবনিকা টেনেছেন এবং ঐ রকম সূচী লেখার কথা দিয়েছেন, যে রকম অন্যান্য মারাঠী ধার্মিক কাব্যগ্রন্থে বিষয়-সূচী হিসেবে শেষে লেখা হয়। দুভার্গ্যক্রমে হেমাডপন্তের সমস্ত কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি করার পরও সেই সূচী পাওয়া যায়নি। তখন বাবার এক পরম ভক্ত, ঠানের অবসরপ্রাপ্ত মাম্‌লৎদার শ্রী বি. ভি. দেব সেটা রচনা করেন। পুস্তকের শুরুতেই বিষয় সূচী দেওয়ার ও প্রত্যেক অধ্যায়ে বিষয়ের সংকেত শীর্ষক রূপে লেখার আধুনিক প্রথা। তাই উল্লেখিত সূচীপত্র এখানে দেওয়া হচ্ছে না। অতএব এই অধ্যায়টিকে উপসংহার মনে করাটাই ঠিক হবে। দূর্ভাগ্য এই যে হেমাডপন্ত নিজের লেখা এই অধ্যায়টির সংশোধন করে উঠতে পারেননি।

সদগুরু শ্রী সাইয়ের মহানতা ঃ-

"হে সাই, আমি আপনার চরণ বন্দনা করে আপনার কাছে 'শরণ' ভিক্ষে চাইছি। আপনিই এই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র আধার।" এই রূপ দৃঢ় ধারণা নিয়ে আমরা তাঁর ভজন-পূজন করলে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে শীঘ্র পুরণ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারব। আজ মায়া -মোহের ঝঞ্ঝায় ধৈর্য্যরূপী বৃক্ষ পড়ে গেছে। অহংকার রূপী হাওয়ার জোরে হৃদয়রূপী সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। ক্রোধ ও ঘৃণার রূপ ধরে কুমীরেরা সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করছে। অহংভাব ও সন্দেহের ঘূর্ণিতে নিন্দে, ঘৃণা ও ঈর্ষারূপী মাছ কিলবিল করে খেলে বেড়াচ্ছে। যদিও এই সমুদ্র এত ভয়ানক, তবুও আমাদের সদ্‌গুরু মহারাজ তার মধ্যে অগস্ত্য মুনিস্বরূপ। তাই ভক্তদের কিঞ্চিৎমাত্র ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আমাদের সদ্‌গুরুই জাহাজ এবং তিনিই আমাদের নিরাপদে ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন।

প্রার্থনা ঃ-

শ্রী সচ্চিদানন্দ সাই মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর চরণ ধরে আমরা সব

ভক্তদের কল্যাণ হেতু তাঁর কাছে প্রার্থনা করি- "হে সাই! আমাদের মনের চঞ্চলতা ও বাসনাগুলি দূর করে দাও। হে প্রভু! তোমার দুটি শ্রীচরণ ছাড়া আমাদের মনে অন্য কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি যেন না থাকে। তোমার এই 'সৎচরিত্র' ঘরে-ঘরে পৌছুক এবং এর যেন নিত্য পাঠ হয়। যে ভক্তরা প্রেমপূর্বক এর অধ্যয়ন করে, তাঁদের সমস্ত বিপদ তুমি দূর কোর।"

ফলশ্রুতি (অধ্যয়নের পুরস্কার) ঃ-

এবার এই গ্রন্থটি পাঠ করলে তার কি ফল প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখছি। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মনোবাঞ্ছিত ফলের প্রাপ্তি হবে। পবিত্র গোদাবরী নদীতে স্নান করে শিরডীর সমাধি মন্দিরে শ্রী সাইবাবার সমাধির দর্শন করার পর এই গ্রন্থটি পাঠ বা শ্রবণ শুরু করলে তোমার ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) বিপত্তি দূর হয়ে যাবে। সময়-সময় শ্রী সাইবাবার বিষয়ে কথা-বার্তা বলতে থাকলে তোমার আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি অভিরুচি জাগবে এবং যদি তুমি এই ভাবে নিয়ম ও প্রেমপূর্বক অভ্যাস করতে থাকো, তাহলে তোমার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। **যদি তুমি সত্যি-সত্যি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাও, তাহলে তোমার সাইলীলাগুলি নিত্য পাঠ ও স্মরণ করা উচিত। তাঁর চরণে প্রগাঢ় প্রীতি থাকা উচিত।[১] সাই লীলারূপী সমুদ্র মন্থন করে তার থেকে প্রাপ্ত রত্নগুলি অন্যদেরও বিতরণ করো।** এর দ্বারা তুমি নিত্য নতুন আনন্দ অনুভব করবে এবং শ্রোতা অধঃপতন থেকে বেঁচে যাবে। যদি ভক্তরা অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যায়, তাহলে ওদের মমত্ব নষ্ট হয়ে বাবার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে যাবে- যেমন নদীর সঙ্গে সাগরের। যদি তুমি তিনটি অবস্থার (অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা) মধ্যে কোন একটাতেও সাই চিন্তনে লীন থাকো, তাহলে তুমি সাংসারিক চক্র থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। **স্নানের পর প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই গ্রন্থটি এক সপ্তাহে শেষ করতে পারে তার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।[২] যারা এর নিত্য পঠন বা শ্রবণ করবে তারা সব ভয় হতে তক্ষুনি মুক্তি পাবে।** এর অধ্যয়নের ফলেই প্রত্যেকেই নিজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুসারে ফল পাবে। কিন্তু এই দুটির অভাবে কোনই ফলই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। যদি তুমি এইটি শ্রদ্ধার সহকারে পাঠ করো, তাহলে শ্রীসাই প্রসন্ন হয়ে তোমায় অজ্ঞানতা ও দারিদ্রতার পাশ থেকে মুক্ত করে জ্ঞান, ধন ও সমৃদ্ধি প্রদান করবেন। মন একাগ্র করে নিত্য একটা অধ্যায়ও যদি পড়ো, তাহলেও অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হবে। এই গ্রন্থটি নিজের বাড়ীতে গুরু পূর্ণিমা, গোকুল অষ্টমী,

রাম নবমী, বিজয়া দশমী ও দীপাবলীর দিন অবশ্যই পড়া উচিত। মন দিয়ে যদি তুমি শুধু এই গ্রন্থটিই অধ্যয়ন করতে থাকো তাহলে সুখ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করবে ও সদৈব শ্রী সাই চরণে আসক্ত থাকবে। এই ভাবে সহজেই তুমি ভবসাগর পার হয়ে যাবে। এর অধ্যয়ন দ্বারা রোগীরা স্বাস্থ্য, ধনহীনরা ধন, দুঃখী ও পীড়িতজন শান্তি পাবে এবং মনের সমস্ত বিকার দূর হয়ে মানসিক স্থিরতা লাভ হবে।

আমার প্রিয় ভক্ত ও শ্রোতাগণ! আপনাদের প্রণাম করে আমার আপনাদের কাছে একটাই বিশেষ নিবেদন যে, যাঁর কথা আপনারা এত দিন ও মাস ধরে শুনলেন তাঁর পাপহরণকারী ও মনোহর চরণ কখনো বিস্মৃত হতে দেবেন না। যেরূপ উৎসাহী হয়ে, শ্রদ্ধাপূর্বক ও একাগ্রচিত্তে আপনারা এই কথাগুলি পঠন বা শ্রবণ করবেন, শ্রী সাইবাবা সেই রূপই সেবা করার বুদ্ধি আপনাদের প্রদান করবেন। লেখক ও পাঠক এই কাজে পরস্পর সহযোগীতায় সুখী হয়ে উঠুন।

প্রসাদ যাচনা ঃ-

শেষে আমারা এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করার সময় সর্বশক্তিমান পরমাত্মাকে নিম্নলিখিত কৃপা বা প্রসাদ যাচনা করছি -

"হে ঈশ্বর! পাঠক ও ভক্তদের শ্রীসাই চরণে পূর্ণ ও অনন্য ভক্তি দিন। শ্রীসাইয়ের মনোহর স্বরূপই যেন ওঁদের চোখে সর্বদা বাস করে এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে দেবাদিদেব শ্রীসাই ভগবানকে দর্শন করেন।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।

সপ্তাহ পারায়ণ সমাপ্ত

১) মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। গীতা ৯/১৩

২) সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। গীতা ৯/১৪

ওঁ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডনায়ক যোগীরাজধীরাজ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় সমর্থ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজ কী জয়।

আরতি

आरती साई बाबा। सौख्यदातार जीवा। चरणरजतली द्यावा दासा विसावा, भक्तां विसावा। आरती ०।। जाळुनिया अनंग। स्वस्वरुपीं राहे दंग मुमुक्षु जना दावी। जिन डोळा श्रीरंग। आरती१। जया मनीं जैसा भाव। तया तैसा अनुभव। दाविसी दयाघना ऐसी तुझी ही माव। आरतीं ।।२।। तुमचे नाम ध्यातां। हरे संसृति व्यथा। अगाध तब करणी। मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथ। आरती ।।३।। कलियुगीं अवतार। सगुण ब्रह्म साचार। अवतीर्ण झालासी। स्बामी दत्त दिगंबर। दत्त दिगंबर। आरती ।।४।। आठा दिवसा गुरुवारीं। भक्त करीति वारी। प्रभुपद पहावया। भव भय निवारी। भय निवारी। आरती ।।५।। माझा निज द्रव्य ठेवा। तव चरणरज सेवा। भागणें हेचि आतां। तुम्हा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती ।।६।। इच्छित दीन चातक। निर्मल तोय निजसुख। पाजावें माधवा या। सांभाळ आपुली भाक। आरती साईबाबा। सौख्यदातार जीवा ।।७।।

ভাবার্থ

সব প্রাণীদের যিনি সুখ দেন হে শ্রী সাইবাবা, আমরা তোমার আরতি করি। নিজের দাস ও ভক্তদের নিজের চরণের শীতল ছায়ায় স্থান দাও। প্রদীপ্তভাবে তুমি সদা আত্মলীন হয়ে থাকো এবং মুমুক্ষুজনদের ঈশ্বর প্রাপ্তি করিয়ে দাও। যার যেরকম ভাব হয় তুমি তাকে সেরকমই অনুভূতি দাও। হে দয়ালু! তোমার এমনই বৈশিষ্ট্য। তোমার শ্রীচরণের শুধুমাত্র ধ্যান করেই ভক্তরা এই সংসারের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তুমি সদৈব দীন ও অনাথদের রক্ষা করো। তোমার কার্য্যশৈলী অদ্বিতীয় ও অপূর্ব। হে দত্ত! এই কলিযুগে তুমি সগুণ ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছ। তাই যে ভক্তরা নিত্য বৃহস্পতিবারে তোমার কাছে আসে তাদের সাংসারিক ভয় থেকে মুক্ত করে ভগবদ-দর্শনের যোগ্য করে তোল। হে দেবাদিদেব। তোমার চরণকমলই আমার সম্পত্তি। যেভাবে মেঘ স্বাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু দিয়ে চাতক পাখীর তৃষ্ণা মেটায়, সেইভাবেই মাধব- (এইখানে নিজের নাম উচ্চারণ করুন) এরও তৃষ্ণা মিটিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করো।

।। ॐ श्री साई यशः काय शिरडीवासिने नमः ।।

মানুষ ভজ রে গুরু চরণম্, দুস্তর ভব সাগর তরণম্ ।
গুরু মহারাজ জয় জয়, শ্রী সাই মহারাজ জয় জয় ।।

শ্রী সাইবাবার এগারোটি প্রতিশ্রুতি

শিরডীর ভূমিতে যে দেয় পা
বিপদ্-দুঃখ অনায়াসেই দূর হয় তার।(১)

সমাধির সিঁড়ি চড়ে সে
দুঃখের পিড়ী পায়ের তলায় ঠেলে।(২)

দেহ ত্যাগ করে চলে গেলেও
আসব ছুটে ভক্তের ডাক শুনে।(৩)

মনে ধারণ করো এই দৃঢ় বিশ্বাস
সমাধি পূরণ করে সব অভিলাষ।(৪)

সর্বদা আমায় জীবিতই জেনো
অনুভব করো, সত্যকে চেনো।(৫)

আমার শরণে এসে খালি হাতে ফিরে গেছে
এমন যদি কেউ থাকে জানাও আমাকে।(৬)

যেমন ভাব হয় যে জনের
তেমনি রূপ হয় আমার মনের।(৭)

ভার তোমার দিয়ে দাও আমার উপর
মিথ্যা হবে না কখনো বচন মোর।(৮)

এসে সাহায্য নাও ভরপুর
ইচ্ছা পূরণ নয় বেশী দূর।(৯)

কায়মনোবাক্যে যে শুধু আমার
হয়ে থাকি আমি চিরঋণী তার।(১০)

ধন্য ধন্য সেই ভক্ত অনন্য
আমি ছাড়া নেই যার কেউ অন্য।(১১)